পথের সন্ধানে

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

পথের সন্ধানে

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশক

মারকাযুদ দাওয়াহ প্রকাশনী
প্রধান দপ্তর : ৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১৩
দোকান নং : ১৫, কওমি মার্কেট
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৩ ২৯৫ ২৯৫
E-mail : publisher.markaz@yahoo.com

প্রকাশকাল

যিলহজ ১৪৪৫ হিজরী = জুন ২০২৪ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য : ১৮০/- টাকা মাত্র

Pother Shondhane By Mawlana Muhammad Abdul Malek, Published by Markazud Dawah Prokashoni. **fixed Price** : Tk. 180.00 US$ 5.00.

بسم الله الرحمن الرحيم

পেশ লফয

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخاتم أنبيائه ورسله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد!

মাসিক আলকাউসারের প্রকাশনা শুরু হওয়ার কয়েক মাস পর পরামর্শ অনুযায়ী একাধিক কলামের সূচনা হয়। তখন আমাকে 'পথের সন্ধানে' শিরোনামটি দেওয়া হয়। বান্দা নিজের ও মুসলিম ভাই-বোনদের ফায়েদার কথা চিন্তা করে প্রস্তাবটি গ্রহণ করি।

উদ্দেশ্য ছিল, যেসব বিষয় খেয়াল রাখা দরকার কিন্তু আমাদের অনেকের খেয়াল থাকে না, তেমনি যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা দরকার কিন্তু অনেকেই বেঁচে থাকে না, ওসব বিষয়ে দাওয়াতী ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা।

আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে নিয়মিত না হলেও মাঝেমধ্যে এ শিরোনামে কিছু কিছু লেখা সম্মানিত পাঠকের খেদমতে পেশ করা হয়েছে। মাসিক আলকাউসারের আমলী মুন্তাযিম বেরাদরে আযীয মাওলানা ফযলুল বারী এ বিভাগে কখনো কখনো আমার এ ধরনের কিছু বয়ানও প্রকাশ করেছেন।

এখন মারকাযের প্রকাশনা বিভাগের উদ্যোগে তা কিতাব আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সহজতার জন্য লেখাগুলোর বিন্যাস প্রকাশের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী রাখা হয়েছে।

কিতাব আকারে ছাপার মুহূর্তে লেখাগুলো আবার নযরে সানী করার জরুরত অনুভব করেছি। সে কাজটি করেছেন প্রিয় মাহমুদ বিন ইমরান।

আল্লাহ তাআলা সংকলনটি কবুল ও মকবুল করুন। একে উপকারী বানান

এবং সামনে ধারাবাহিকভাবে এই কলামটি জারি রাখার তাওফীক দান করুন, আমীন।

আরযগোযার
বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
৮ রমযান ১৪৪৫ হি.

সূচিপত্র

পেশ লফয ৫
শুনতেও সংযম বলতেও সংযম মুমিনের স্বভাব এমন ৯
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার কয়েকটি অবহেলিত দিক ১৩
জামাতের নামায : সংক্ষিপ্ত করার নামে ক্রটিযুক্ত করছি ১৮
আরব ভূমি থেকে কী নিয়ে আসবেন ২২
প্রার্থনা মাযারওয়ালার কাছে নয়, আল্লাহর কাছে করুন
এবং মাযারওয়ালার জন্য করুন ২৬
নামাযে কাতার সোজা করুন
বিভক্তি ও অনৈক্যের একটি কারণ কাতার সোজা না করা ৩০
দুর্ঘটনার পরে নয় আগেই সমাধান জেনে নিন ৩৫
ইসলামী ঈদ : তাৎপর্য ও শিক্ষা ৩৯
বিদায় রমযান, বিদায় ঈদ, কী পেলাম কী হারালাম ৪৩
হজের কার্যাদি শেষ হয়েছে, হজ যেন শেষ না হয় ৪৭
হযরত হারদুঈ : যে শিক্ষাগুলো ব্যাপক হওয়া দরকার ৫২
সাক্ষাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব ৫৭
এই সুন্নতটি জিন্দা করুন :
মুসাফাহার দুআর ব্যাপারে যত্নবান হোন ৬৪
অনর্থক আলোচনা-মন্তব্য রেখে
ইসলাহ ও দুআর প্রতি মনোযোগী হই ৬৭
ইসলাহ ও মুহাসাবার মৌলিক বিষয় থেকে উদাসীন না হই,
'যিকির ও ফিকির' কিতাবটির রাহনুমায়ি গ্রহণ করি ৭২
দ্বীনের সমঝ কাকে বলে? ৭৯
দ্বীনী কিতাবের প্রকাশকগণের খেদমতে ৮৭
এসব ক্ষেত্রেও ইজাযত প্রয়োজন :
বিলুপ্তপ্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব ৯৩
'বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ...' ১০১

বরকত হাসিল করা, নাকি মানুষকে কষ্ট দেওয়া ১০৮
ইসলামী আকায়েদই ঈমানের ভিত্তি ১১৫
অল্পেতুষ্টির ক্ষেত্র কী? ১২১
কুরআনের হেদায়েত সবার জন্য... ১২৯
প্রসঙ্গ : করোনা ভাইরাস
আসল হল তাওয়াক্কুল এবং ঈমানী শক্তি; ভারসাম্য রক্ষা করে
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণও জরুরি ১৩৯
প্রসঙ্গ : করোনা ভাইরাস
অমূলক ভীতি ও অস্থিরতার নাম সতর্কতা নয়, বরং বাড়াবাড়ি;
সতর্কতা কাম্য বাড়াবাড়ি পরিত্যাজ্য ১৫২
মা ইনদাকুম ইয়ানফাদু...১৬১
ওজর শেষ হয়ে যাওয়ার পর সাধারণ হুকুম অনুযায়ী আমল
করা জরুরি, মসজিদে জামাতের সঙ্গে ফরয নামায
আদায় করার গুরুত্ব ও ফযীলত ১৭১
করোনা থেকে পরিত্রাণের প্রকৃত উপায়...................................... ১৭৮
মিরাস বণ্টন : এক আরবের ঘটনা এবং শিক্ষণীয় কিছু বিষয় ১৮৪
শোকর, সবর ও তাকওয়া
মুহসিন মুমিনের তিনটি বড় গুণ ২০১
ঈমানী শক্তি ও নিয়তের শক্তি কাজে লাগিয়ে
মুজাহাদার পথে অগ্রসর হই.. ২১৭
ঈমান শেখার মেহনত ও ঈমান হেফাজতের মেহনত ২২৫
যিয়ারতে বাইতুল্লাহ : আমরা ওখান থেকে কী নিয়ে ফিরব ২৪০
কীভাবে দ্বীনের পথে অগ্রসর হব.. ২৫৩
মসজিদে আকসা আমাদের... ২৫৮
অপচয়, অথচ আমরা একে অপচয়ই মনে করছি না ২৬৯

শুনতেও সংযম বলতেও সংযম মুমিনের স্বভাব এমন

প্রতি শনিবার মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত আজিমপুর চায়না বিল্ডিং গলি ১৩৬ নম্বর বাড়িতে হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের মজলিস হয়।[১] আমি সেখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতাম। এ মজলিসে হযরত প্রফেসর দা. বা. আমাকে সাধারণত কামালাতে আশরাফিয়া (মালফূযাত, হযরত থানভী রহ., সংকলন : মাওলানা ঈসা ইলাহাবাদী) থেকে পড়ে শোনানোর আদেশ করতেন।

এক মজলিসে হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা পড়া হয়, যেখানে সামাজিক আচরণের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি হল–

'মাদরাসা খান্‌কায়ে ইমদাদিয়া থানাভবন-এর হিসাবপত্রের দায়িত্ব যার ওপর ন্যস্ত ছিল, তিনি একবার হযরতকে জানান, মাদরাসার কোনো বাড়ির ভাড়া বাবদ অমুক খান সাহেবের কাছে আমরা টাকা পাওনা আছি।' বাস্তবে ভাড়া পরিশোধ ছিল। হযরত রহ. হিসাবরক্ষক সাহেবের এই সংবাদের ভিত্তিতে খান সাহেবকে লিখে পাঠান, 'অমুক বলেছেন, আপনার গত অমুক মাসের ভাড়া বাকি আছে।'

খান সাহেব হযরতের কাছে রশিদ ইত্যাদি পাঠিয়ে জানান, সম্ভবত ভাড়া পরিশোধ করা আছে। তবে যদি আমার ভুল হয়ে থাকে সে জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

হযরত রহ. হিসাবরক্ষক সাহেবকে বিষয়টি জানালে দেখা গেল আসলে হিসাবরক্ষক সাহেবই ভুল করে বসে আছেন। হযরত খুব দুঃখিত হয়ে বললেন, অযথা আমাকে লজ্জিত হতে হল। তবে আল্লাহ তাআলার শোকর, আমি হিসাবরক্ষক সাহেবের উদ্ধৃতিতেই কথাটা বলেছিলাম, নিজের পক্ষ

---

[১] হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব রহ. ১৭-০৪-১৪৪৫ হি. মোতাবেক ০২-১১-২০২৩ ঈ. তারিখে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, আমীন। বর্তমানে (০৮-০৯-১৪৪৫হি.) মজলিসটি ২০/১ শেখ সাহেব বাজার, আমতলী, আজিমপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

থেকে বলিনি। এজন্যই নিছক কারো বিবরণের ভিত্তিতে কোনো কিছু বলতে হলে তা তার উদ্ধৃতিতেই বলা উচিত, নিজের পক্ষ থেকে নয়।

হিসাবরক্ষক সাহেবকে ভবিষ্যতের জন্য তিনি সাবধান করে দেন, যথাযথ যাচাই না করে কোনো কিছু বলা উচিত নয়। কেননা এর ফলাফল অনেক সময় অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। দেখুন তো, এই ঘটনায় শুধু শুধু সেই বেচারাও পেরেশান হলেন আর আমিও লজ্জিত হলাম।' –কামালাতে আশরাফিয়া ২৪০

এই ঘটনা থেকে গ্রহণ করার মতো অনেক কিছুই আছে। তবে এখানে শুধু দুটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। প্রথম কথা হল, যথাযথ যাচাই ছাড়া কথা বলা বা কোনো মন্তব্য করা ঠিক নয়। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টির আদেশ এভাবে করা হয়েছে–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۗىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ۝

'যে বিষয়ে তোমার যথাযথ জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। (কেননা) চোখ, কান ও অন্তর এসব সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হবে।' –সূরা বনী ইসরাইল (১৭) : ৩৬

দ্বিতীয় কথা হল, শুধু শোনা কথার ওপর নির্ভর করা উচিত নয় এবং যাচাই করে সত্যাসত্য নির্ণীত হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করাও ঠিক নয়। এ বিষয়টির আদেশ হাদীস শরীফে এভাবে দেওয়া হয়েছে–

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

'ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার পক্ষে এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে সবই বর্ণনা করে।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮২

মুমিনের কান বা জিহ্বা কোনোটাই অপরিপক্ব হয় না। কানের অপরিপক্বতা হল, যেকোনো শোনা কথার ওপরই নির্ভর করা এবং কারো ব্যাপারে কোনো কথা শুনলেই তা বিশ্বাস করে নেওয়া। আর জিহ্বার অপরিপক্বতা হল, শুধু আন্দাজ করে বা শোনা কথার ওপর নির্ভর করেই কোনো কিছু বলে ফেলা অথবা নানা ধরনের উড়ো কথা বা রটনা শুনেই কোনো মন্তব্য করে বসা। মুমিনের জিহ্বা হয় পরিপক্ক। সে কোনো কথা বললে–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ

'যে বিষয়ে তোমার যথাযথ জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।' এবং

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۝

'সে কোনো কথা মুখ হতে বের করলেই কাছে একজন নেগাহবান প্রস্তুত রয়েছে।' (সূরা কাফ ১৮)-এর দিকে লক্ষ রেখেই বলে।

সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে, সমাজে অন্তত দায়িত্বশীলদের মধ্যেও যদি এই দুটি বৈশিষ্ট্য পয়দা হয়ে যায়, তাহলে সমাজের অর্ধেকেরও বেশি ঝগড়া-বিবাদ ও সমস্যা দূর হতে পারে।

ইসলামী শরীয়তে সমাজকে নিরাপদ ও ঝগড়া-বিবাদ-মুক্ত রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামে পরনিন্দা, চোগলখুরি, অশ্লীল কথাবার্তা, গালিগালাজ ইত্যাদি সব কিছুই নিষিদ্ধ। অনুরূপ উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা, দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো, বিকৃত নামে ডাকা ইত্যাদিও হারাম। হিংসা-বিদ্বেষ থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখাও প্রত্যেক মুমিনের ওপর ফরয। অহংকার ও অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করা নিষেধ। বিনয় ও আখেরাতের স্মরণ জরুরি। তা ছাড়া সামাজিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করার এবং ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য দূর করার পক্ষে সহায়ক যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অর্জন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য এমনিতেই জরুরি। এরপরও শরীয়ত আলাদাভাবে সামাজিক সুসম্পর্ক বজায় রাখাকে ফরয এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদকে হারাম করেছে।

আমরা যারা আজকে নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করি, আমাদের সমাজের দিকে তাকালে এটা পার্থক্য করা কঠিন হয় যে, ইসলামী শরীয়তে আখলাক ও চরিত্রগত বিষয়ে কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম কিংবা ইসলামে আদৌ এ জাতীয় কোনো পথ-নির্দেশনা আছে কি না?

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, দুনিয়াবী কাজ-কারবার, পারস্পরিক সম্পর্ক, কথাবার্তা ইত্যাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা নিদারুণ অসতর্কতার শিকার। কেউ তো অনেক কথা বানিয়েও বলে। আবার কেউ বানিয়ে না বললেও একটি কথাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে না। কথার পরিবেশ-পরিস্থিতি, অগ্রপশ্চাৎ ইত্যাদি সঠিকভাবে বুঝে যেভাবে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করা উচিত ছিল, সেভাবে বর্ণনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এজন্য সাধারণ যুক্তির কথা এবং শরীয়তের নির্দেশ হল, কারো ব্যাপারে কোনো কিছু শুনেই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজের অবস্থা হল, কারো বর্ণনা-বিবরণই শুধু নয়, নির্ভেজাল রটনার ওপর নির্ভর করে কোনো ধরনের যাচাই ছাড়াই অভিযোগ ও শাস্তি প্রদানের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়ে যায়। গীবত ও হিংসা-বিদ্বেষ

থেকে আরম্ভ করে দৈহিক-মানসিক ও আর্থিক অত্যাচারের নানা পন্থা অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে কার্যকর করা হয় অথচ সামান্য কষ্ট স্বীকার করে আসল বিষয়টি যাচাই করে নিলে হয়ত ব্যক্তিটির নির্দোষিতাই সুস্পষ্ট হয়ে যেত।

কারো ব্যাপারে কোনো অভিযোগ পৌঁছুলে হয়ত তা ধর্তব্যের মধ্যেই আনা উচিত নয় অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ করে প্রকৃত বিষয়টা যাচাই করে নেওয়া উচিত এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মনের সন্দেহ-সংশয় দূর করে নেওয়া উচিত। এতদূর সম্ভব না হলে অন্তত প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার আগে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা তো অপরিহার্য।

এভাবে অভিযোগ ও শোনাকথা যাচাই করে নেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হলে অনেক ঝগড়া-বিবাদ ও মনোমালিন্য একদম সূচনাপর্বেই শেষ হয়ে যেতে পারে।

হাকীমুল উম্মত রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলার লক্ষ-কোটি শোকর যে, এখানে কেউ কারো ব্যাপারে কোনো কথা লাগাতে পারে না। যদি নিয়ম-কানুনে সামান্য ছাড় দেওয়া হত, তাহলে এখানেও এই কাজ শুরু হয়ে যেত।

একবার বড় ভাইজানের পরিবার থেকে তাদের কর্মচারী হাজী আব্দুর রহীম সাহেবের ব্যাপারে কিছু অভিযোগ আমার কাছে করা হয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাজী সাহেবকে ডেকে পাঠাই এবং ঘরের দরজায় দাঁড় করিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনার ব্যাপারে এই অভিযোগ করা হচ্ছে। তিনি বললেন, ভুল অভিযোগ। আমি ঘরের ভেতরে বললাম, তোমরা অভিযোগ করছ আর হাজী সাহেব তা অস্বীকার করছেন। নিয়ম অনুযায়ী দাবি প্রমাণ করার ভার তোমাদের ওপরই বর্তায়। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, তওবা, তুমি মানুষকে এভাবে মুখের ওপরে অপ্রস্তুত করে দাও! আমি বললাম, এখানে লজ্জা দেওয়া বা অপমান করার কোনো ব্যাপারই নয়। একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগের বিষয়টি আমার কাছে মোটেই ভালো মনে হয় না। যেখানে এই কাজ চলে সেখানে প্রত্যেকেই এই আশঙ্কায় ভোগে যে, না-জানি আমার ব্যাপারে কে কী লাগিয়ে গেল আর আমার ব্যাপারে না-জানি কে কী ধারণা পোষণ করছে!' –কামালাতে আশরাফিয়া ৩৮৮

কত ভালো হত, যদি আমাদের সামষ্টিক জীবনে এই সোনালি নীতির প্রতিফলন ঘটত! তাহলে নিশ্চয়ই একটি নিরাপদ ও শান্তিময় সমাজের সকল সুফল একদম আমাদের নাগালের মধ্যে এসে যেত।#

[আগস্ট '০৫ ঈ.]

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার কয়েকটি অবহেলিত দিক

'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ' আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা অতি প্রয়োজনীয় ও বরকতময় কাজ। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যেকোনো কল্যাণকাজে ব্যয় করাকে 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়। এর কিছু সুরত ফরয বা ওয়াজিব। যেমন যাকাত ও সদকায়ে ফিতর। আর কিছু সুরত এমন যা ফরযে কেফায়া। যেমন মকতব, মাদরাসা, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করা এবং অতি প্রয়োজনীয় জনকল্যাণমূলক কাজকর্মে অর্থ ব্যয় করা। এর কিছু সুরত নফলও রয়েছে। যেমন সাধারণ অবস্থায় কোনো ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করা, দান-খয়রাত করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলার অনেক বড় অনুগ্রহ, তিনি বান্দার আখেরাত সুন্দর হওয়ার জন্য এবং তার পার্থিব উপকারিতার জন্য তাঁরই দেওয়া সম্পদ থেকে খরচ করার আদেশ করেছেন। আর সেই আদেশকে ব্যক্ত করেছেন 'আল্লাহকে করয-দান', 'আল্লাহকে সাহায্য করা' শব্দে। একজন হৃদয়বান মুমিন যদি এই সীমাহীন অনুগ্রহের ওপর চিন্তাভাবনা করে, তাহলে তার হৃদয় অবশ্যই জাগ্রত হবে এবং খোদার রাহে খরচ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

আলহামদু লিল্লাহ, এই অবক্ষয়ের যুগেও মুসলমানদের মধ্যে 'ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ'-এর আমলটি জারি আছে। কিন্তু অনেক সময় এতে দুই ধরনের ভুল হয়ে থাকে। একটি ভুল হল, খরচ করার সময় ইনফাকের যেসব নিয়ম-নীতি ও আদব-কায়েদার প্রতি পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে আদেশ করা হয়েছে সেসবের প্রতি লক্ষ রাখা হয় না। দ্বিতীয় ভুলটি হল, কিছু মানুষ ইনফাকের বিশেষ কিছু সুরতকে অবলম্বন করে ভাবেন, ইনফাক শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা ইনফাকের উত্তম খাত শুধু এই-ই। অথচ অবস্থাভেদে ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর অন্যান্য সুরতও অধিক গুরুত্ব ও মনোযোগের দাবি রাখে।

এখানে ইনফাকের এমন কয়েকটি খাতের দিকে ইঙ্গিত করছি, যেগুলোর প্রতি কম মনোযোগ দেওয়া হয়–

১. কিছু মানুষের অভ্যাস আছে, সব ধরনের সদকা ও নেককাজ যাকাতের

ফান্ড থেকে আদায় করে। অথচ কিছু খাত এমন আছে, যাতে যাকাতের টাকা খরচ করা যায় না। আর যেসব খাতে যাকাতের টাকা খরচ করার অনুমতি আছে সেখানকার সব খরচ যে শুধু যাকাতের টাকা থেকেই করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তাহলে যাকাত ছাড়া আল্লাহর পথে খরচ করার আরো যেসব খাত আছে তাতে কি নিজের নাম লেখানোর প্রয়োজন নেই? যেমন কোনো আত্মীয় বা কোনো মুসলমান ভাই অসুস্থ হয়ে গেলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এটা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার একটি স্বতন্ত্র খাত। এখন যদি সেই অসুস্থ ব্যক্তি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তাহলে তার চিকিৎসার জন্য যাকাতের টাকা খরচ করা জায়েয আছে। কিন্তু একজন সম্পদশালী মুমিনের জন্য বিশেষ কোনো সমস্যা ছাড়া এমনটি করা উচিত নয়। উচিত হল চিকিৎসার জন্য আলাদা টাকা হাদিয়া দেবে এবং যাকাতের টাকা পৃথকভাবে খরচ করবে। এটাই হবে সাখাওয়াত ও বদান্যতার বহিঃপ্রকাশ। একজন মুমিনের অবস্থাই এমন হওয়া উচিত যে, তার অন্তর যেমন উদার হবে, সামর্থ্য অনুসারে হাতটাও উদার হবে এবং অত্যন্ত ইখলাসের সঙ্গে খরচ করবে।

২. কোনো কোনো মানুষ এমন আছে যারা এমনিতে হাজার হাজার টাকা খরচ করে থাকে, কিন্তু রিক্সা ভাড়া দেওয়ার সময় নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে, এমনকি রিক্সাচালকের চাওয়ার পরও দু-এক টাকা বেশি দিতে কার্পণ্য করে। অথচ চাওয়া ছাড়াই দু-চার টাকা বেশি দিয়ে তার মনটা খুশি করে দেওয়া যেত। এটাও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার একটি সুরত।

৩. অনেক মানুষেরই এমন একটা প্রবণতা আছে যে, এমনিতে তারা লাখ টাকা খরচ করতেও কসুর করে না, কিন্তু ঘরের কাজের লোকের বেতন একটু বেশি নির্ধারণ করতে তাদের যেন জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। অথচ এই দরিদ্র লোকটির সাহায্যের জন্য তার বেতন কিছুটা বাড়িয়ে ধরা এমন কোনো কঠিন বিষয় নয় এবং মাঝে মাঝে চাওয়া ছাড়াই তাকে কিছু কিছু হাদিয়া দেওয়া একজন মুমিনের উদারতার দাবি।

৪. আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার একটি সুরত হল করযে হাসানা। যা একদিক থেকে খরচের মধ্যেও পড়ে না, কিন্তু অনেক সময় এতে খরচ করার চেয়েও অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। আজকাল প্রয়োজনে করযে হাসানা দেওয়ার রেওয়াজ দুঃখজনকভাবে কমে গেছে। অনেক লোকই লাভ ছাড়া করয দিতে প্রস্তুত হয় না। আবার কেউ তো নাউযু বিল্লাহ, সুদই চেয়ে বসে অথবা অন্য কোনো কৌশল তালাশ করে!

৫. ঈসালে সওয়াবের জন্য খরচ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অনেক মানুষই এর জন্য শুধু একাজটিই নির্ধারণ করে নিয়েছেন যে, কিছু মানুষকে একত্র করে কিছু পড়া হল তারপর খাবার-দাবার ইত্যাদির আয়োজন। বেশি থেকে বেশি যারা কিছু পড়ল তাদেরকে হাদিয়ার নামে কিছু দিয়ে দেওয়া হল। অথচ কিছু পড়ে-পড়িয়ে ঈসালে সওয়াব করা–এটা ঈসালে সওয়াবের একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি। এর সঙ্গে খাবার-দাবারের আয়োজনের কোনো সম্পর্ক নেই। আর টাকা-পয়সার লেনদেন এখানে নাজায়েয হওয়া ছাড়াও এর দ্বারা ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। ফকীর-মিসকীনকে (কোনো বিশেষ রসম-রেওয়াজের অনুসরণ ছাড়া এবং কোনো ধরনের আপত্তিকর কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া ছাড়া) আহার করানো–এটা ঈসালে সওয়াবের ভিন্ন আরেকটি পদ্ধতি। অথচ মানুষ বর্তমানে এই দুটি পদ্ধতিকে পরস্পরের জন্য শর্ত বানিয়ে নিয়েছে। এটা ভুল এবং সংশোধনযোগ্য।

এখানে আমি যে বিষয়টি আরয করতে চাই তা হল, ঈসালে সওয়াবের আসল পদ্ধতি হচ্ছে সদকায়ে জারিয়া ও সাধারণ দান-খয়রাত। কিন্তু সাধারণত মানুষ এদিকে মনোযোগ দেয় না। বছর শেষে মিলাদ মাহ্‌ফিল করে দেওয়া এবং এই উপলক্ষে কিছু টাকা-পয়সা খরচ করাকেই তারা ঈসালে সওয়াবের জন্য খরচ করা মনে করে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন।

৬. আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার আরেকটি পথ হল, আল্লাহর বান্দাদের শান্তি ও আরামের জন্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা। যেমন, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করা, পুল-সাঁকো নির্মাণ করা, নলকূপ স্থাপন করা, এতিম-বিধবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করা, বিনামূল্যে চিকিৎসা-সেবা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল নির্মাণ করা, দ্বীন ও ইনসানিয়াত শেখা-শেখানোর জন্য ফ্রি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা, দুস্থ-অসহায় মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি খাত আল্লাহর রাস্তায় খরচের অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত। মুসলিমজাতির বিত্তশালীরা এই সেবামূলক কাজগুলো অমুসলিম এনজিওগুলোর ওপর ন্যস্ত করে দিয়েছে, যাতে তারা সেবার নামে দেশবাসীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং সবশেষে জনগণের দ্বীন ও ঈমান বরবাদ করতে সফল হয়। বাস্তবে হচ্ছেও তাই।

অথচ আমাদের দেশে এত বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ আছেন, তারা যদি ইখলাসের সঙ্গে এদিকে মনোযোগ দেন, তাহলে এসব সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অনেকটাই

স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব।

মুসলমানদের জানা থাকা উচিত, তাদের নবীর বৈশিষ্ট্য সর্বদা এ-ই ছিল যা উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রা. তাঁকে লক্ষ করে বলেছিলেন–

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُوْمَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الحَقِّ.

'আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অক্ষমদের বোঝা বহন করেন, কর্মহীন নিঃস্ব ব্যক্তির কর্মসংস্থান করেন, মেহমানদারি করেন এবং বিভিন্ন বিপদাপদে মানুষের সাহায্য করেন।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩

৭. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মসজিদে কিছু দিতে হলে কিছু কুরআন শরীফ কিনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে হতে হতে মসজিদসমূহে কুরআন শরীফের স্তূপ হয়ে যায়। যার যথাযথ সম্মান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় না। কখনো কখনো হয়ত কেউ একটি কপি নিয়ে তেলাওয়াত করে আর বাকিগুলোর ওপর ধুলোর পুরু আস্তর পড়ে থাকে। পরিষ্কার করারও কোনো লোক থাকে না। যদি এখানে একটু জ্ঞানবুদ্ধি খরচ করা হত, তাহলে মসজিদে কুরআন দানকারীরা প্রথমে মুসলিম সমাজের কুরআনের শিক্ষা ব্যাপকতর করার জন্য খরচ করতেন এবং কীভাবে সমাজের সকল সদস্য সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তার চেষ্টা করতেন। প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লায় কুরআনী মকতব স্থাপন করার জন্য এবং পুরোনো মকতবসমূহের খোঁজখবর নিয়ে আর্থিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করতেন। অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই করতেন যে, মসজিদে এসে দেখে যেতেন, এখানে বাড়তি কুরআন শরীফের প্রয়োজন আছে কি না। প্রয়োজন থাকলে ভালোকথা, অন্যথায় সেই টাকা মসজিদ ফান্ডে দিয়ে দিতেন, যাতে অন্য প্রয়োজনীয় খাতে এই অর্থ ব্যয় করা যায়। আর যদি কুরআন শরীফই দিতে হয় তাহলে যেখানে প্রয়োজন আছে এবং তেলাওয়াত করা হয় এমন জায়গায় দিতেন, যাতে দান করার উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

৮. কারো কারো অভ্যাস আছে, কোনো মাদরাসায় দান করার নিয়ত করলে জিজ্ঞেস করেন, এখানে এতিমখানা আছে কি না? অথবা অন্তত লিল্লাহ-বোর্ডিং আছে কি না? থাকলে ভালো অন্যথায় এখানে আর কিছু খরচ করেন না। দুস্থ ও এতিমের প্রতি সহানুভূতি অবশ্যই কাম্য এবং এটা আল্লাহর রাস্তায় দান করার একটি অনেক বড় শাখা, কিন্তু দ্বীনী মাদরাসাগুলোর অন্যান্য খরচের

খাতে ব্যয় করাও তো অনেক বড় সওয়াবের কাজ। বিত্তশালী ব্যক্তিরা যদি শুধু লিল্লাহ-বোর্ডিংয়েই দিতে থাকেন এবং যাকাতের পয়সা থেকেই খরচ করতে থাকেন, তাহলে অন্যান্য বিভাগের প্রয়োজন কীভাবে সমাধা হবে। যেমন ইমারত ফান্ড, সাধারণ খরচের ফান্ড, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার ফান্ড, কিতাব-ক্রয় ফান্ড এবং আরো কত খাত রয়েছে–এসবের দিকে মনোযোগ দেওয়া আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার অতি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

কতক মানুষের এই অভ্যাসও আছে যে, কোথাও কিতাব দান করতে হলে শুধু সিলেবাসের কিতাবসমূহ কিংবা শুধু হাদীসের ছয় কিতাব আবার কেউ শুধু বুখারী শরীফ দিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ফলে দেখা যায়, কোনো কোনো মাদরাসায় সহীহ বুখারীর এত এত কপি জমা হয়ে যায় যে, পড়নেওয়ালাও এত হয় না। অথচ এদিকে লক্ষ করা হয় না, ফিক্হ-ফতোয়া, হাদীস-তাফসীর এবং দ্বীনিয়াতের অন্যান্য বিষয়ের তাহ্কীক-গবেষণার জন্য কত শত কিতাবের প্রয়োজন। যার জন্য প্রয়োজন লক্ষ-কোটি টাকা। এজন্য যেখানে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও দ্বীনিয়াতের অন্যান্য বিষয়ের কিতাবাদির প্রয়োজন সেখানে এই লাইনেই সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করা দরকার। এমন হওয়া উচিত নয়, আমি সেখানে হাদীসের ছয় কিতাবের আরো একটি সেট পাঠিয়ে দিলাম অথচ এসব কিতাব সেখানে যথেষ্টেরও বেশি আছে।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে– এক ব্যক্তি কোনো মাদরাসা-কমিটির সভাপতি বা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যের উৎসাহদানের ফলে তিনি মাদরাসায় প্রয়োজনীয় কিতাবাদি দান করতে প্রস্তুত হন। কথা অনুযায়ী যখন তার সামনে কিতাবের তালিকা পেশ করা হয় তখন বলতে লাগলেন, এসব তো হাদীসের বই তাই না! সব বুখারী শরীফ। আমি কিন্তু ভাই আমাদের রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীস ছাড়া আর কিছু দেব না!

এগুলো হল দ্বীনী-জ্ঞান থেকে দূরে থাকার ফল। যাহোক, কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করলাম। অন্য কোনো সুযোগে বিস্তারিত বলা যাবে। যে বিষয়টির এখন প্রয়োজন তা হল, দ্বীনের সঠিক বুঝ সমাজে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হওয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই তাওফীকদাতা।#

[অক্টোবর-নভেম্বর '০৫ ঈ.]

জামাতের নামায : সংক্ষিপ্ত করার নামে ত্রুটিযুক্ত করছি

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে– 'তোমাদের কেউ যখন ইমাম হয় তখন সে যেন নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে আর যখন একাকী পড়ে তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ করে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৩

এখানে নামাযকে সংক্ষিপ্ত করার অর্থ হল, মাসনূন পরিমাণ থেকে কেরাত খুব বেশি দীর্ঘ না করা এবং রুকু, সেজদা ইত্যাদিতে খুব বেশি সময় না নেওয়া। কেননা দুর্বল, অসুস্থ ও প্রয়োজনে গমনকারীর পক্ষে বিষয়টি কষ্টকর হয়।

এ-বিষয়ক হাদীসসমূহের আলোকে উক্ত হাদীসের এ অর্থই সুস্পষ্ট। কিন্তু দ্বীনী শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে অনেকেই উপরিউক্ত হাদীসের এই অর্থ নেন যে, জামাতের নামায খুব তড়িঘড়ি শেষ করা উচিত। অনেক মসজিদের ইমামের অভ্যাস হল, তাঁরা নামাযের মাসনূন কেরাতের প্রতি লক্ষ রাখেন না। এমনকি কওমা-জলসায় স্থিরতা ও ইতেদালের ওয়াজিব দায়িত্বটিও যথাযথ পালন করেন না। কোনো কোনো মসজিদে দেখা যায়, ফজরের নামায ছয়-সাত মিনিটেই শেষ হয় অথচ সালামের পরে তাসবীহ-তাহ্‌লীল ও উচ্চৈঃস্বরে সম্মিলিত মুনাজাতে প্রায় আধা ঘণ্টা সময় লাগানো হয়।

কোথাও এরূপও দেখা গেছে, রমযানের রাতগুলোতে দীর্ঘক্ষণ যিকির ও তাহাজ্জুদে মগ্ন থাকার পর যখন ফজরের নামাযের সময় হয়েছে তখন অতি সংক্ষিপ্ত সূরার মাধ্যমে নামায সম্পন্ন করা হয়েছে।

কোনো কোনো মসজিদে এরূপও দেখা যায়, তারাবীর নামাযে কুরআন খতমের নিয়ম পালিত হচ্ছে; কিন্তু ইশার ফরয নামাযে 'ইযা জা-আ' ও 'তাব্বাত ইয়াদা' ... পড়া হচ্ছে। একটু চিন্তা করুন, যারা এক পারা, সোয়া পারা পরিমাণ কেরাতের সঙ্গে বিশ রাকাত নামায দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারছে তাদের পক্ষে কি ফরয নামাযে সূরা 'আলা' ও সূরা 'গাশিয়া' পড়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা কোনো কঠিন ব্যাপার?

আসলে মুসল্লিদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে নামায সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে– বিষয়টি বোধ হয় এমন নয়; বরং সঠিক ইলমের অভাব বা নামাযে সুন্নত ও

ওয়াজিবসমূহের ব্যাপারে অবহেলা ও উদাসীনতাই এর মূল কারণ। এটাও হতে পারে যে, বাস্তব অবস্থার যাচাই ছাড়াই মুসল্লিদের অসুবিধার কাল্পনিক ছুতোয় এসব করা হচ্ছে। অথচ কেরাতের এ সংক্ষিপ্তের ব্যাপারে খোদ মুসল্লিদেরই আপত্তি থাকে। নেপথ্য কারণ যাই হোক এই ভুল কর্ম-পন্থার খুব তাড়াতাড়ি সংশোধন হওয়া দরকার।

মনে রাখবেন, জামাতের নামায সংক্ষিপ্ত করার যে আদেশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন তার প্রেক্ষাপট কিন্তু মাসনূন কেরাত ছিল না; মাসনূন কেরাতের চেয়ে খুব বেশি দীর্ঘ কেরাত পড়তে নিষেধ করেই তিনি এই আদেশ করেছেন।

একদিন হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. ইশার নামাযে সূরা বাকারা শুরু করেন। এতে বিরক্ত হয়ে এক সাহাবী জামাত ছেড়ে একাকী নামায পড়ে নেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্থাপিত হলে তিনি খুব রাগান্বিত হন এবং হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে লক্ষ করে বলেন, 'হে মুআয, তুমি কি মানুষকে জামাত ত্যাগের ফেতনায় নিপতিত করছ? তুমি কি সূরা 'আলা', 'ওয়াশ শামসি ওয়াদুহাহা', 'ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগ্‌শা' ইত্যাদি সূরা পড়তে পারো না?' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৫

লক্ষ করুন, আপত্তি তার ব্যাপারে হচ্ছে যিনি ইশার নামাযে সূরা বাকারা পড়েন (যা সোয়া দুই পারা)। এরপর নামাযকে সংক্ষিপ্ত করার কথা বলতে গিয়ে সূরা 'আলা' ইত্যাদি পড়তে আদেশ করছেন; যা 'আওসাতে মুফাস্‌সাল'-এর অন্তর্ভুক্ত। ইশার নামাযে এসব সূরা বা এর সমপরিমাণ পড়াই সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেননি যে, সূরা 'ইখলাস', সূরা 'কাউসার' পড়।

আরেক দিনের ঘটনা। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. মসজিদে কুবায় নামায পড়াতেন। তিনি একদিন ফজরের নামাযে এত দীর্ঘ একটি সূরা শুরু করেন যে এক সাহাবী জামাত ছেড়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নামাযের অতিদীর্ঘতার অভিযোগ করা হলে তিনি খুব রাগান্বিত হন এবং ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষকে অনাগ্রহী করে তোল। যখন তোমরা ইমাম হবে তখন নামায সংক্ষেপ করবে আর যখন একা পড়বে তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে।' –মুসনাদে আবী ইয়ালা–ফাতহুল বারী ২/২৩২

একটু চিন্তা করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই

জামাতের নামায সহজ করার আদেশ করেছেন এবং হাদীস শরীফে এটাও প্রমাণিত যে, তিনি ফরয নামায সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতেন। এবার হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহ থেকে তাঁর সহজতার বাস্তব অবস্থাটি দেখুন। ফরয ওয়াজিব তো দূরের কথা, কোনো সুন্নত, মুস্তাহাব বা আদবও কি তিনি এই উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করতেন? কক্ষনো না। তিনি জামাতের নামাযে মাসনূন কেরাতই পড়তেন। মাসনূন কেরাতকে তো আমরা এজন্যই মাসনূন বলি যে, জামাতের নামাযে এই সূরাগুলো পাঠ করাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ রীতি ছিল। পাশাপাশি রুকু, সেজদা, কওমা ও জলসা তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে আদায় করতেন।

হ্যাঁ, তাহাজ্জুদ ইত্যাদিতে তিনি এসব রুকন অনেক দীর্ঘ করতেন। এমনকি কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু ফরয নামাযে এই রুকনগুলো এত দীর্ঘ করতেন না।

সাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতি এটাই ছিল এবং পরবর্তী যুগের সুন্নতের অনুসারী উলামা-মাশায়েখ ও আয়িম্মায়ে মাসাজিদও এই রীতিই অনুসরণ করে গেছেন। শরীয়তের ব্যাপারে সজাগ ও সাবধান ব্যক্তিদের মধ্যে আজও এই সুন্নত জীবন্ত আছে। এখন প্রয়োজন শুধু প্রতিটি মসজিদেই যেন এই সুন্নত জিন্দা হয় তার ফিকির করা।

মাসনূন কেরাতের পরিমাণ তো সবারই জানা আছে। ফজরের নামাযে 'তিওয়ালে মুফাস্‌সাল'-এর সূরাসমূহ, আসর ও ইশায় 'আওসাতে মুফাস্‌সাল' এবং মাগরিবে 'কিসারে মুফাস্‌সাল' থেকে পড়া সুন্নত। যোহরের নামাযে হাদীস শরীফে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল পড়াও প্রমাণিত আবার আওসাতে মুফাস্‌সালও। তাই উত্তম হল এই নামাযে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল থেকে পড়া। তবে আওসাতে মুফাস্‌সাল থেকে পড়া হলেও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

কুরআন কারীমের সূরা হুজুরাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত অংশকে 'মুফাস্‌সাল' বলে। এর মধ্যে 'সূরা হুজুরাত' থেকে 'সূরা বুরূজ' পর্যন্ত সূরাগুলোকে 'তিওয়ালে মুফাস্‌সাল'; সূরা 'তারিক' থেকে 'লাম-ইয়াকুন' পর্যন্ত 'আওসাতে মুফাস্‌সাল' এবং সূরা 'যিল্‌যাল' থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত সূরাগুলোকে 'কিসারে মুফাস্‌সাল' বলা হয়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো 'মুফাস্‌সাল'-এর সূরাসমূহ ছাড়া কুরআনের অন্যান্য সূরাও নামাযে পড়তেন। তাই উক্ত সূরাসমূহের সমপরিমাণ কুরআনের অন্য স্থান থেকে পড়া হলে ফুকাহায়ে

কেরামের মতে সুন্নত আদায় হবে। মাগরিবের নামাযে সুন্নত কেরাতের জন্য সর্বদা ছোট ছোট সূরা পড়া জরুরি নয়। কেননা এ নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা 'সাফ্ফাত', 'হা-মীম দুখান', 'মুরসালাত' ও 'আলা' পড়েছেন–এটাও হাদীস শরীফে আছে।

এটাও জেনে রাখা ভালো যে, নামাযে মাসনূন কেরাত পড়া না হলেও নামায হয়ে যায়; কিন্তু কেরাতের মাসনূন পরিমাণের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করা অর্থাৎ কোনো শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া মাসনূন পরিমাণ থেকে কম পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া মাকরূহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত জিন্দা করার এবং তাঁর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।#

[ডিসেম্বর '০৫ ঈ.]

আরব ভূমি থেকে কী নিয়ে আসবেন

খাঁটি আরব বা তাদের অধিকাংশকেই আল্লাহ তাআলা নানা ধরনের উন্নত বৈশিষ্ট্য স্বভাবগতভাবেই দান করেছেন। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্য ধর্ম ও প্রকৃতির ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করেছে এবং বিশ্বাস ও কর্মে, রুচি ও আচার-আচরণে ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনাকে অবলম্বন করেছে তারা উন্নতি ও উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য একজন ভদ্র রুচিশীল আরব মুসলমান যিনি নিজেকে অনারব বৈশিষ্ট্যাদির মিশ্রণ থেকে মুক্ত রেখেছেন তার মধ্যে নিম্নোক্ত গুণগুলো উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়–

১. বিশুদ্ধ তাওহীদের বিশ্বাস।

২. সচেতনতা ও দ্বীনী মর্যাদাবোধ।

৩. লৌকিকতা ও আড়ম্বর-প্রিয়তা থেকে দূরে থাকা।

৪. হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং সামান্য বিষয়ে শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জানানো স্বভাবে পরিণত হওয়া।

৫. দানশীলতা, বদান্যতা ও মেহমানদারি।

৬. অতি প্রশংসা ও সীমাতিরিক্ত ভক্তি প্রকাশ থেকে দূরে থাকা।

৭. বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যে ব্যবসার পাশাপাশি কিংবা ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির স্থলে সেবার মানসিকতা প্রকাশ পাওয়া এবং সব ধরনের প্রতারণা ও অসাধুতা থেকে দূরে থাকা।

মানুষ যদি কোথাও যায় তাহলে নিয়ম হল, সেখানকার নেককার মানুষগুলোর উত্তম গুণাবলি অর্জন করার চেষ্টা করা এবং সেখানকার পানি, মাটি, বাতাস থেকে ভালো বৈশিষ্ট্যাদি আহরণ করতে সচেষ্ট হওয়া। এজন্য হজের সফর হোক বা রুজি-রোজগারের উদ্দেশ্যে হোক, কিছু দিন যদি আরব ভূমিতে অবস্থানের সুযোগ হয়, তাহলে আরবের পরিবেশ থেকে ভালো বিষয়গুলো এবং নেককার আরববাসীর উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলোতে তাদের অনুসরণ করা এবং সেসব গুণ নিজের মাতৃভূমির মানুষের মধ্যে প্রসারিত করার চেষ্টা করাই একজন রুচিশীল, সত্যনিষ্ঠ ও উন্নতিকামী মানুষের কাজ হওয়া উচিত।

উপরিউক্ত সাতটি বৈশিষ্ট্য এমন যা প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যেই থাকা উচিত। এছাড়া প্রত্যেক পেশা ও শ্রেণির মানুষের জন্যও তাদের সমশ্রেণির মানুষের

থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করার আছে। যেমন একজন তালেবে ইলমের জন্য একটি সামান্য বিষয় হল, সেখান থেকে কিতাবের জগতের সঙ্গে পরিচিতি লাভের প্রেরণা, কিতাব সংগ্রহের আগ্রহ, কিতাব পড়া এবং তা বোঝার জন্য নিজের সব কিছুকে বিলীন করে দেওয়ার মানসিকতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

তেমনি একজন সাধারণ দ্বীনদার মানুষ সেখান থেকে আলেমগণের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার সবক গ্রহণ করতে পারেন। সেখানকার সাধারণ মানুষ তাদের উলামা-মাশায়েখের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। তারা তাঁদের ফতোয়ার বাইরে কদম রাখে না আর অন্য মাযহাবের মুফতিয়ানে কেরামের ফতোয়ার ভিত্তিতে তাঁদের ওপর কোনো আপত্তিও উত্থাপন করে না।

ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী মানুষ সেখান থেকে এই নিতে পারেন যে, কীভাবে আযানের সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বন্ধ করতে হয় এবং মসজিদের দিকে যেতে হয়। সেখানকার কোনো দোকানদার কখনো এই অভিযোগ করেছে বলে শোনা যায়নি যে, এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে।

আমাদের মা-বোনেরা আরব মহিলাদের কাছ থেকে পর্দার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। সেখানে কোনো তরুণী যুবতী বা বয়ঃপ্রাপ্ত কিশোরী রাস্তায় বের হবে আর বোরকাবৃত থাকবে না এমনটি খুবই কঠিন। মাথা-কাঁধ-গলা খুলে বিশ্বরোড ধরে চলমান নারী কালে-ভদ্রে আপনার দৃষ্টিতে পড়তে পারে আবার নাও পারে। হ্যাঁ, এমন হতে পারে, কোনো অনারব মহিলা এখানে ভ্রমণ করতে এসেছে এবং সে এমন খোলামেলা চলছে।[১]

শিক্ষা-সংস্কৃতি বিভাগের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ সেখানে এই দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন, দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিরত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এজন্য দ্বীন ও ইনসানিয়াত থেকে বিমুখ হতে হবে। বরং দ্বীন ও ইনসানিয়াতের মৌলিক বিষয়গুলো শিখে এবং নিজেদের তাহযীব-তামাদ্দুন ও জাতীয় স্বকীয়তা বজায় রেখেও মানুষের পক্ষে দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করা সম্ভব। এর একটি পদ্ধতি যা সেখানে প্রচলিত আছে, তা হল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্বীনিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সিলেবাস, পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের

---

[১] আফসোস, আরবরা এখন একেক করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সব বৈশিষ্ট্যই হারাতে যাচ্ছে।

পরিবেশ ভ্রান্ত চিন্তা-দর্শন ও অশালীন দৃশ্যাবলি থেকে মুক্ত থাকা। বলাবাহুল্য, এটা অসম্ভব কিছু নয়। হ্যাঁ, যাদের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেকোনো শাখায় পারদর্শিতা অর্জনের অর্থই হল দ্বীন ও ইনসানিয়াত জলাঞ্জলি দেওয়া তাদের কথা ভিন্ন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন হজ-ওমরার উদ্দেশে সেখানে যান তো সেখানকার দ্বীন-ধর্মের কিছু অনুভূতি ও মূল্যবোধ গ্রহণ করার সুযোগ তাদের থাকে। সেখানকার প্রশাসনের অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও দ্বীন-ঈমানের মহব্বত, ইনসানিয়াতের মর্যাদা এবং আম-জনগণের শান্তি-স্বস্তি বিধানের যা কিছু প্রেরণা তাদের মধ্যে আছে তার বিশ ভাগের একভাগও যদি আমাদের নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করতে পারতেন, তাহলেও সেটা সাধারণ নাগরিকের জন্য অনেক বড় সুখের ব্যাপার হত।

মোটকথা, এমন অনেক বিষয় আছে যা সেখান থেকে গ্রহণ করা যায়। অথচ আমরা সেখান থেকে ভালো গুণ, স্বচ্ছ চিন্তা, পরিচ্ছন্ন রুচি ও উন্নত মানসিকতার পরিবর্তে ওই সব বিষয়ই নিয়ে আসি বা ওই সব ব্যাপারেই আমাদের আগের অবস্থানকে আরো মজবুত করে আসি, যা বাইরে থেকে আরবে প্রবেশ করেছে এবং যা ওই সব আরবের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় যারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণে নিজেদের আরবীয় রুচি-প্রকৃতি ও স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়েছে। যাদের ব্যাপারে বলা যায়, 'ভাষা আরবী কিন্তু হৃদয়-মন আজমী'। এখন তো অনেক আরবী পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে গিয়ে নিজেদের ভাষার স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা, গাম্ভীর্য ইত্যাদিও বিসর্জন দিতে বসেছে।

এদিকে কোনো আল্লাহর বান্দা যদি সেখান থেকে কোনো দ্বীনী সবক নিয়ে আসে তো এই নিয়ে আসে যে, সেখানকার মানুষ নামাযে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করে; আমীন জোরে বলে; ইমামের পেছনে কেরাত পড়ে; বিতরের নামায দুই সালামে পড়ে; আসরের নামায এখানকার সময়ের চেয়ে অনেক আগে পড়ে ইত্যাদি। তেমনি হজের আমলসমূহের কিছু কিছু মাসআলায় সেখানে বিতরণকৃত হজ গাইডবুকগুলোতে আমাদের এ অঞ্চলের আলেমগণের শিক্ষা দেওয়া বা তাদের লিখিত বই-পুস্তকের সঙ্গে ভিন্নতা আছে। এসব মাসআলা নিয়েও তারা বিতর্ক শুরু করে; অথচ যেসব মাসআলায় শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে সাহাবা-যুগ থেকেই মতপার্থক্য চলে এসেছে এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীর একেক অঞ্চলে একেক মত অনুযায়ী আমল জারি আছে, সেখানে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদের কোনোই অবকাশ নেই। আর যেহেতু

উভয়টাই শরীয়তসম্মত তাই এটারও প্রয়োজন নেই যে, এক অঞ্চলের নিয়ম অন্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

আমাদের এ অঞ্চলের কোনো কোনো ভ্রান্ত মহলে যেসব শির্ক-বেদআত ও রসম-রেওয়াজ প্রচলিত আছে তার মোকাবেলায় তো আপনি আরব থেকে তাওহীদ ও সুন্নতের শিক্ষা নিয়ে আসতে পারেন, যা এখানকার হক্কানী আলেমগণের মধ্যেও আছে। কিন্তু শরীয়তসম্মত একাধিক মত-সমৃদ্ধ বিষয়াদিতে, যেখানে উভয় মতই সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত, একটি মতকে অপরটির বিপরীতে দাঁড় করতে পারেন না। এটা কোনো দ্বীনী খেদমতও নয় আর সুস্থ বিবেকবুদ্ধিও এর সমর্থন করে না। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের কিছু আম-মানুষ বা আলেম নামের মানুষ দ্বীনী প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাবান বুযুর্গ আলেমগণের সাহচর্য বঞ্চিত থাকার কারণে এ কর্মটিই করে থাকেন। তারা সেখানে দু-চার দিন নামায পড়ে এখানে আসেন এবং দেশের হাজার হাজার মুহাদ্দিস ও ফকীহর নামাযকে হাদীস ও সুন্নতের খেলাফ আখ্যা দিতে থাকেন।

কিছু লোক তো আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে কিছু একদেশদর্শী ও তথাকথিত বিপ্লববাদী আরব তরুণ থেকে ফিকহ্ অস্বীকার, মুজতাহিদ ইমামগণের প্রতি কটু-বাক্য এবং স্বীকৃত ফিক্‌হের আলোকে হাদীস অনুসরণকারীদের কাফের বা বেদআতী আখ্যা দেওয়ার ঘৃণিত বেদআতটি এ অঞ্চলে আমদানি করার কাজে নিয়োজিত আছেন। অথচ সেসব বন্ধুর এতটুকু সচেতন থাকা উচিত ছিল যে, এই বেদআতটির সূচনা ইংরেজ শাসনের অন্ধকার যুগে হয়েছে এবং ভারতবর্ষ থেকেই এই বেদআত আরব ভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছে। তো জিনিসটা যেহেতু আরব ভূমির 'খাঁটি বস্তু' নয়, তাই সেখান থেকে ওটা আমদানি না করাই ভালো।

অনেক হাজী সাহেব বন্ধু-বান্ধবের জন্য হাদিয়া-তোহ্ফা আনতে গিয়েও বাড়াবাড়ি করেন; অথচ সেখান থেকে যমযমের পানি, মদীনার খেজুর, মেসওয়াক, তাসবীহ্ ইত্যাদি জিনিস বা সামর্থ্য অনুযায়ী যমযমের পানি নিয়ে আসাই যথেষ্ট। লৌকিকতা ও আড়ম্বর-প্রিয়তা ভালো গুণ নয় আর লোকদেখানো বা রিয়া তো শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।#

[জানুয়ারি '০৬ ঈ.]

প্রার্থনা মাযারওয়ালার কাছে নয়, আল্লাহর কাছে করুন এবং মাযারওয়ালার জন্য করুন

কিছু দিন আগের কথা। আমি আজিমপুরে প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেবের সাপ্তাহিক ইসলাহী মজলিসে অংশগ্রহণের জন্য যাচ্ছিলাম। হাইকোর্টের কাছে এলে মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেল। নামায পড়ার জন্য বাস থেকে নেমে গেলাম, কিন্তু কাছে কোনো মসজিদ পেলাম না। অগত্যা হাইকোর্ট সংলগ্ন মসজিদে–যাকে আল্লাহ মাফ করুন, মাযার মসজিদ বলে–নামায পড়ার জন্য গেলাম। এর আগে আমি কখনো ওই মসজিদে যাইনি।

যেহেতু কবরটি মূল মসজিদের বাইরে পুব দিকে অবস্থিত, তাই আমি মসজিদের সীমানার ভেতরে নামায পড়ে নিলাম। নামায শেষে বারান্দায় কিছু সময় কবরের দৃশ্য দেখছিলাম। কবরের ওপরে পাকা গম্বুজ, ছাদ, সামিয়ানা এবং কবরের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের পাথরের কারুকাজ। এখানেই শেষ নয়, লালশালু গোলাপের আবরণ, ফুলের স্তূপ, মূল্যবান বাতি ও আলোকসজ্জার গর্হিত বেদআত এবং নাজায়েয নানা আয়োজন তো চোখে পড়লই।

সবচেয়ে বেশি আফসোস হল যে বিষয়ে তা হল, কিছু লোককে মসজিদে না গিয়ে মাযারের আশপাশেই বসা দেখলাম। তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার পরিবর্তে মাযারওয়ালার কাছে প্রার্থনায় মগ্ন। কিছু লোককে দেখলাম, নামায শেষ করে মাযারে প্রবেশ করল। প্রবেশের সময় খুব নিচু হয়ে মাযারের দরজা স্পর্শ করতে করতে ভেতরে আসল। অথচ মসজিদে প্রবেশের সময় এ ধরনের কোনো আচরণ তারা করেনি। এরপর মাযারের দেয়ালের ধুলোবালি চেহারা ও শরীরে মাখতে লাগল এবং না-জানি কত কী প্রার্থনা করতে থাকল অথচ মসজিদের ভেতরে তাদেরকে এমন কিছুই করতে দেখিনি। এটুকু চিন্তাও কি আমার সে ভাইদের মনে উদয় হওয়া উচিত ছিল না যে, যে কাজ আল্লাহর ঘরের সঙ্গে বৈধ নয় তা মাযারের সঙ্গে কীভাবে বৈধ হয়ে গেল!

মসজিদে প্রবেশের সময় এবং প্রবেশের পরে কিছু সুন্নত আমল আছে। সেগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। অনুরূপ কবর যিয়ারতেরও সুন্নত

তরিকা আছে। যাহোক, সেখানে এই দৃশ্য দেখে আমার খুব আফসোস হল এবং কালেমা তাইয়েবা ও কালেমায়ে শাহাদতের প্রথম দাবি– তাওহীদ-বিষয়ক আয়াতসমূহ স্মরণে আসতে লাগল। গাইরুল্লাহর কাছে সাধারণ উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের বিষয়াদি প্রার্থনা করা যে তাওহীদের পরিপন্থী ও পরিষ্কার শিরক সে সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদীসগুলো একের পর এক মনে পড়তে লাগল। সেখান থেকে এই আফসোস করতে করতে বের হয়ে এলাম, আমরা আমাদের জাতিকে এমনকি কালেমা পাঠকারী নামাযী ভাইদেরকে পর্যন্ত কালেমার প্রথম ও প্রধান দাবি তাওহীদের সবক শেখাতে ব্যর্থ হয়েছি।

হায়! আমাদের সেই ভাইয়েরা যদি জানতেন, তারা এখনই নামাযে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এই অঙ্গীকার করে এসেছেন যে– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'তোমারই ইবাদত করি, তোমার কাছেই সাহায্য চাই' এবং দৈনিক কয়েকবার এই অঙ্গীকার পুনরাবৃত্তি করছেন; অথচ এই অঙ্গীকারের কিছুক্ষণ পরেই কীভাবে তারা মাযারওয়ালার কাছে প্রার্থনার জন্য এসে গেলেন।

হায়! তারা যদি কুরআন কারীমের এই আয়াতগুলো বুঝে নিতেন–

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ.

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা ডাক, তারা তোমাদেরই মতো আল্লাহর দাস।' –সূরা আরাফ (৭) : ১৯৪

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ

'আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা ডাক তারা না তোমাদের সাহায্যের সামর্থ্য রাখে আর না নিজেদের কোনো সাহায্য করতে পারে।' –সূরা আরাফ (৭) : ১৯৭

শরীয়তের শিক্ষা ছিল আখেরাত ও কবর-জীবনের ইয়াদ তাজা করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা। কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসী ভাই-বোনদের জন্য শান্তি ও মুক্তির দুআ করা। তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফেরাত কামনা করা এবং বলা–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ.

'হে মুমিন কবরবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের অগ্রবর্তী আমরা তোমাদের অনুগামী। আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে মিলিত

হব।'

সম্ভব হলে কিছু পড়ে তাদের জন্য ঈসালে সওয়াব করা। এসবই হচ্ছে কবর ও কবরবাসীদের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা। কিন্তু আজ অনেক মানুষ শরীয়তের বিপরীত পথে চলতে শুরু করেছে। তারা আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেদের জন্য এবং কবরবাসীদের জন্য প্রার্থনা করার পরিবর্তে কবরবাসীদের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেছে। যেন কবরবাসীরাই তাদের প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তিদাতা, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সুস্থতা-অসুস্থতা, জীবন-মরণ, লাভক্ষতি, রিযিক-সন্তান ইত্যাদি সবই যেন তাদের হাতে। নাউযু বিল্লাহ! অথচ এসব বিষয়ে একচ্ছত্র অধিপতি হলেন আল্লাহ তাআলা। একমাত্র তিনিই দুআ ও আহাজারি, প্রার্থনা ও ফরিয়াদের হকদার। একমাত্র এবং একমাত্র তিনিই সবার প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ থেকে মুক্তিদানকারী এবং সকল বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। লাভ-ক্ষতি, সুস্থতা-অসুস্থতা, জীবন-মরণ এসব কিছু একমাত্র তাঁরই আদেশের অধীন। তিনিই রিযিকদাতা, তিনিই সন্তানদাতা, তিনিই মানুষকে সম্মান দেন। রাজ্য ও ক্ষমতা দানের মালিক একমাত্র তিনিই।

শরীয়তের শিক্ষা হল, উলামা-মাশায়েখের কাছ থেকে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করা। তাঁদের জীবন থেকে শরীয়তের অনুগামী হওয়ার প্রেরণা অর্জন করা এবং তাঁদের যথোপযুক্ত সম্মান করা। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ এমন আছে যারা তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি কিংবা শিখলেও তার বিপরীতে চলেছে। জীবদ্দশায় তাঁদের অনুসরণ থেকে দূরে থেকেছে আর তাঁদের মৃত্যুর পর সম্মানের নামে তাঁদের সঙ্গে এবং তাঁদের কবরগুলোর সঙ্গে নানা ধরনের শিরকি আচরণে লিপ্ত হচ্ছে। তাদের আশা হল, বুযুর্গানে দ্বীন আখেরাতে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন বা দুনিয়াতে তাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন। অথচ সকল হক্কানী বুযুর্গ শিরক-বেদআত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তাঁরা জীবনভর মানুষকে ঈমান ও তাওহীদ, সুন্নত ও শরীয়ত শিখিয়েছেন এবং গোনাহ ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার তাকিদ করেছেন।

মনে রাখবেন, যারা আজ বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারের সঙ্গে এসব গর্হিত আচরণ করে, সেসব বুযুর্গ কেয়ামতের দিন তাদের থেকে এই বলে মুখ ফিরিয়ে নেবেন যে–

سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ
وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿۱۸﴾

‘আপনি পবিত্র। আমাদের কী সাধ্য ছিল আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে কার্য সম্পাদনকারীরূপে গ্রহণ করার! আপনি তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদের ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মরণ-বিস্মৃত হয়েছিল আর তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।’ –সূরা ফুরকান (২৫) : ১৮

এই পৃথিবী বড় আশ্চর্য জায়গা। নানা ধরনের প্রান্তিকতা আর বিপরীতমুখী কাজ-কারবারের এ যেন এক রঙ্গভূমি। একদিকে দেখা যায়, কিছু মানুষ ওলী-আউলিয়ার তাযীমের নামে শিরকের মধ্যে পতিত হয় এবং এই ওলীগণ যে আল্লাহর দাসত্ব করে ওলী হয়েছেন তারা তাঁরই অবাধ্যাচরণ করে এবং তাঁর সঙ্গে বেয়াদবি করে। অপরদিকে কতক মূর্খের এমনই উচ্ছৃঙ্খল কাজ-কারবার যে, মাযারের মধ্যে এসে বোমাবাজি পর্যন্ত করে থাকে। আবার জ্ঞানহীন জ্ঞানীদের একটি মহল আছে যারা হক্কানী পীর-মাশায়েখের প্রতি মূর্খতা ও বুদ্ধিহীনতার ফতোয়া আরোপ করে। অথচ তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাই হক্কানী উলামা-মাশায়েখকে أُوْلُوا الْأَلْبَابِ (জ্ঞানী সম্প্রদায়) উপাধি দিয়েছেন আর ওদের ব্যাপারে যে হালকা কথা বলা হয়েছে তা হল–

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

‘তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।’ –সূরা রূম (৩০) : ৭#

[ফেব্রুয়ারি ’০৬ ঈ.]

নামাযে কাতার সোজা করুন
বিভক্তি ও অনৈক্যের একটি কারণ কাতার সোজা না করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতের নামাযের এই নিয়ম শিখিয়েছেন যে, নামায আদায়কারীরা কাতার করে দাঁড়াবে এবং কাতারগুলো একদম সোজা হবে। কেউ এক ইঞ্চি আগেও দাঁড়াবে না বা এক ইঞ্চি পেছনেও না। আগে প্রথম কাতার পূরণ করা হবে, এরপর দ্বিতীয় কাতার শুরু হবে। বয়স্ক ও জ্ঞানী মানুষ প্রথম কাতারে ইমামের কাছে স্থান নেওয়ার চেষ্টা করবে আর ছোটরা পেছনে।

নামাযের মতো মহান ও সম্মিলিতভাবে আদায়যোগ্য ইবাদতের জন্য এমন সুন্দর নিয়মই উপযুক্ত; কিন্তু সৌন্দর্য-শৃঙ্খলা ছাড়াও এই আদেশের মধ্যে আরো অনেক কারণ নিহিত রয়েছে। এ জন্যই শরীয়তে কাতার সোজা করা মুস্তাহাব পর্যায়ের বিষয় নয়। এর গুরুত্ব অনেক বেশি। হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে অনেক তাকিদ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে শিথিলতার কঠিন নিন্দা জানানো হয়েছে।

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.

'তোমরা নামাযে কাতারগুলো সোজা কর। কেননা কাতার সোজা করা 'ইকামতে সালাত'-এর অংশ।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৩৩

কুরআন মাজীদে বারবার অতি গুরুত্বের সঙ্গে 'ইকামতে সালাত'-এর যে আদেশ করা হয়েছে তা পূর্ণরূপে পালিত হওয়ার জন্য কাতার সোজা করা অপরিহার্য। এটা ছাড়া ইকামতে সালাতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আদায় হয় না।

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়ানোর জন্য দাঁড়াতেন তখন কাতারগুলো সোজা করিয়ে দিতেন। কাতার সোজা হয়ে গেলে তাকবীর দিতেন। অর্থাৎ নামায শুরু করতেন। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৬৬৫

সহীহ মুসলিমে হযরত নুমান ইবনে বশীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো এত সোজা করতেন, যেন তিনি এই কাতার দিয়ে তির সোজা করবেন। এভাবে একসময় তিনি নিশ্চিত হলেন, আমরা কাতার সোজা করার বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিয়েছি। এরপর একদিন তিনি নামায পড়ানোর জন্য তাশরীফ আনেন এবং নির্ধারিত স্থানে দাঁড়ান। তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করবেন এমন সময় তিনি লক্ষ করলেন, এক ব্যক্তির বুক কাতার থেকে কিছুটা সামনের দিকে বের হয়ে আছে। তিনি তখন ইরশাদ করেন, আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মনের গতি বিভিন্নমুখী করে দেবেন।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৩৬

অর্থাৎ তোমরা যদি কাতার সোজা করার ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর শাস্তিরূপে তোমাদের মনের গতিকে বিভিন্নমুখী করে দেবেন। তোমাদের একতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিভক্তি সৃষ্টি হবে। আর যেকোনো জাতির জন্যই এটা অনেক বড় আযাব।

একাধিক হাদীসে কাতার সোজা না করার শাস্তিরূপে পরস্পর বিভক্তি ও অনৈক্যের ধমকিবাণী শোনানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, অপরাধ এবং এই শাস্তির মধ্যে মিলও রয়েছে।

পরিতাপের বিষয় হল, অন্যান্য দ্বীনী বিষয়ের মতো কাতার সোজা করার ব্যাপারেও ব্যাপকভাবে অবহেলা করতে দেখা যায়। অথচ এখন কাতার সোজা করা খুবই সহজ। সব মসজিদেই কাতারের জায়গায় দাগ দেওয়া থাকে। সব মুসল্লি যদি দাগের প্রান্তে পায়ের গোড়ালি রেখে দাঁড়ায়, তাহলে আপনা আপনি কাতার সোজা হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যায় কেউ কাতার-চিহ্নটির পেছনের প্রান্তে পা রেখে দাঁড়ায়। ফলে ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও কাতার পুরোপুরি সোজা হয় না।

মসজিদের আদব এবং মুসল্লিদের সম্মানের দাবি হল মসজিদে মাদুর, কার্পেট, গালিচা ইত্যাদি যা কিছু বিছানো হবে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দরভাবে বিছাতে হবে। পাশাপাশি এদিকেও লক্ষ রাখতে হবে, বিছানোর সময় কার্পেট, চাদর ও কাতারের চিহ্ন যাতে সমান্তরাল হয়। অন্তত কার্পেট ও কার্পেটের ওপর যে চাদর থাকে তা সমানভাবে বিছানো উচিত, যাতে কার্পেটের শেষ প্রান্তে গোড়ালি রেখে দাঁড়ালে কাতার সোজা হয়ে যায়।

মসজিদের সম্মানিত ইমাম বা মুআযি্যন সাহেবান যখন কাতার সোজা করার কথা বলেন, তখন কিছুটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন। কেননা সব মুসল্লি কাতার সোজা করার নিয়ম জানে না। আর প্রায় নামাযেই কোনো না কোনো নতুন মুসল্লি থাকে, তাই অন্তত এতটুকু বলে দেওয়া উচিত, কাতারের চিহ্নের শেষ প্রান্তে বা কার্পেটের শেষ প্রান্তে পায়ের গোড়ালি রেখে কাতার সোজা করুন। শুধু 'কাতার সোজা করুন' বলা অনেক মুসল্লির জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে।

কোথাও যদি কাতার সোজা করার এমন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে ডানে-বামে তাকিয়ে যত্নের সঙ্গে কাতার সোজা করা উচিত। কাতার সোজা করতে গিয়ে যদি তাকবীরে তাহরীমা বলতে কিছুটা দেরি হয় তাতে কোনো সমস্যা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল এটাই ছিল, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত কাতার সোজা হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হতেন, নামায শুরু করতেন না।

হযরত ওমর রা. কয়েকজনকে শুধু এজন্যই নির্ধারিত রেখেছিলেন, তাঁরা সারিবদ্ধ মুসল্লিদের কাতার সোজা করতেন। তারা যখন এসে জানাতেন কাতার সোজা হয়েছে, তখন হযরত ওমর রা. নামায শুরু করতেন। হযরত উসমান রা.-এর নীতিও এটা ছিল। –মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস ২৪৩৭-২৪৩৯

মুসল্লি ভাইদেরও এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত, ইমাম তার নায়েব বা অপর কোনো মুসল্লি ভাই যদি কাতার সোজা করার জন্য বলেন বা কাঁধে হাত রাখেন কিংবা সামনের কাতারের ফাঁকা পূর্ণ করতে বলেন, তাহলে নির্দ্বিধায় তাদের অনুরোধ মেনে নেওয়া উচিত। এটা অনেক সওয়াবের কাজ এবং ভদ্রতা ও শরাফতের পরিচায়ক। এক্ষেত্রে দ্বিধা-সংশয়, উত্তেজনা, মনোমালিন্য কোনোমতেই সমীচীন নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতার সোজা করার ব্যাপারে আমাদেরকে বিশেষভাবে বলে গেছেন– وَلِيْنُوْا بِأَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ 'তোমরা তোমাদের ভাইদের হাতে নরম-কোমল হয়ে যাও।' অর্থাৎ কোনো ভাই যদি তোমাদের শরীরে হাত রেখে বলে, ভাই একটু আগে যান, পেছনে যান বা একটু এদিক এসে ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করুন, তখন তোমরা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে তার অনুরোধ খুশি মনে মেনে নাও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ হাদীসটি দেখুন–

أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِأَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ وَلَا

تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِّلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.
'তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। কাঁধগুলো বরাবর করে দাঁড়াও। কাতারের ফাঁকা পূরণ কর। তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও এবং শয়তানের জন্য কোনো খোলা জায়গা রেখো না। যে কাতার সংযুক্ত করে আল্লাহ তাআলাও তাকে (নিজের সঙ্গে) সংযুক্ত করবেন। আর যে ছিন্ন করে আল্লাহ তাআলাও তাকে ছিন্ন করে দেবেন।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৬৬৬

এই হাদীসে কাতার প্রসঙ্গে আরো একটি আদেশ করা হয়েছে তা হল কাতারের মধ্যে ফাঁকা না রাখা। অন্যান্য সহীহ হাদীসেও এ আমলের শিক্ষা ও তাকিদ এসেছে। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ানোর প্রতি খেয়াল করা হয় না। যেন মিলে মিলে দাঁড়ানো একটি লজ্জার ব্যাপার।

একটু ভাবা উচিত, আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার সামনে দাণ্ডায়মান। আল্লাহ তাআলার বান্দা পরস্পর ভাই-ভাই। তাহলে মিলে মিলে দাঁড়ানোর মধ্যে লজ্জার ব্যাপার নেই, মানহানিরও কারণ নেই। সবাই মিলে মিলে দাঁড়াক আল্লাহ তাআলা এটিই পছন্দ করেন। এক ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে পরিমাণ জায়গা তো কোনো অবস্থাতেই ফাঁকা রাখা যাবে না। এরচেয়ে কম জায়গাও ফাঁকা রাখা যাবে না। স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে রুকু-সেজদায় কষ্ট না হয় মতো করে যতদূর সম্ভব মিলে মিলে দাঁড়ানো উচিত। এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভাইদের দেখা যায়, তারা নিজেদের মধ্যে এতদূর ফাঁকা রাখেন যে অনায়াসেই একজন মাঝখানে দাঁড়াতে পারে বা দুজন মিলে দাঁড়ালে একজনের জায়গা বেরিয়ে আসে। আবার একশ্রেণির মানুষকে দেখা যায়, দুপায়ের মাঝখানে অনেক-দূর ফাঁকা রেখে পাশের মুসল্লির পায়ের সঙ্গে পা লাগানোর বা পায়ের ওপর পা চড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। এটাও বাড়াবাড়ি। তা ছাড়া এর মাধ্যমে মিলে মিলে দাঁড়ানোর সুন্নতটি সবক্ষেত্রে আদায় হয় না। খালি জায়গা পা ফাঁক করে ভরে দেওয়ার কী অর্থ?

সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ সালাফি আলেম ড. বকর আবু যায়েদ তাঁর কিতাব لَا جَدِيْدَ فِيْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ-এ এই পদ্ধতিটির সমালোচনা করেছেন এবং এটি 'সংশোধনযোগ্য' বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি সেটাই যা ওপরে আলোচিত হয়েছে।

কাতার সোজা করার ব্যাপারে এ কথা মনে রাখা দরকার, এ বিষয়টি শুধু একজন মুসল্লির সতর্কতার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে না। ধরুন, কোনো

কাতারের অধিকাংশ মুসল্লি নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ালো, কিন্তু দু-একজনের অবহেলার কারণে কাতারটি বাঁকা হয়ে গেল। কাতারের কোনো দিকে অসঙ্গতি দেখা দিল। তাই এ আমলটি সঠিকভাবে পালনের জন্য প্রত্যেক মুসল্লিকে সতর্ক হতে হবে।

বিভিন্ন মসজিদে নামায পড়ার সময় কাতার সোজা করতে গিয়ে আমাকে বড় বিপাকে পড়তে হয়েছে। আমি ডানদিকের মুসল্লির বরাবর দাঁড়ালে দেখা যায় বামদিকের মুসল্লি আমার সঙ্গ দিচ্ছে না। আবার বামদিকের মুসল্লির পা অনুসরণ করে দাঁড়ালে দেখা যায় ডানদিকের মুসল্লির সঙ্গ পাচ্ছি না। যেদিকেরই অনুসরণ করি শেষ পর্যন্ত কাতার বাঁকাই থেকে যায়। কখনো এমনও হয়, আমি কাতারে খালি জায়গা পূরণের জন্য পাশের মুসল্লির সঙ্গে মিলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখা যায় আমি যতই তার সঙ্গে মিলে দাঁড়াতে চাই সে ততই দূরে সরে যায়। সত্যিই এটা বড় দুঃখজনক ব্যাপার।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রাসূলের সুন্নত সঠিকভাবে বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।#

[মার্চ '০৬ ঈ.]

দুর্ঘটনার পরে নয় আগেই সমাধান জেনে নিন

ইতিহাসে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি খুবই প্রসিদ্ধি পেয়েছে। তিনি একটি মাসআলার পর্যালোচনা করছিলেন। কেউ বলে উঠল, এমন কোনো ঘটনা কি ঘটেছে, যার পর্যালোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? তিনি বললেন– إِنَّا نَسْتَعِدُّ لِلْبَلَاءِ قَبْلَ نُزُوْلِهِ 'আমরা বিপদে পতিত হওয়ার আগেই তা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করি।' –তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪৮

কোনো সংশয়ের গলিতে ঢোকার আগে তা থেকে বেরুনোর পথ আছে কি না তা জেনে নিতে হয়, এটাই নিয়ম।

ওপরের বিষয়টি সেসব ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেগুলো সমাজে মাঝে মধ্যে দেখা যায়। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, এসব ব্যাপারে তত্ত্বতালাশ ও পর্যালোচনা করা 'মুজতাহিদদের' কাজ বা অগাধ ইলমের অধিকারী উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। এখানে এ ব্যাপারে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাই ইবাদত-বন্দেগি, লেনদেন, আচার-আচরণ মোটকথা, মানুষের জীবনের প্রতিটি শাখায় প্রতিমুহূর্তে এমন বহু ঘটনা ঘটে থাকে, যেসব ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা কী তা আগেই জেনে নেওয়া দরকার। পার্থিব বিষয়াদিতে এ নিয়ম খুব মেনে চলি; কিন্তু দ্বীনী বিষয়াদিতে এর প্রতি আমরা সামান্যও দৃষ্টিপাত করি না।

উদাহরণস্বরূপ, ছেলেকে ব্যবসায় দিতে হলে আমরা প্রথমে তাকে কোনো প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর কাছে পাঠিয়ে ব্যবসার চর্চা করিয়ে থাকি। সুযোগ পেলে কাউকে এ বিষয়ে কলেজ-ভার্সিটিতে পড়িয়ে থাকি। কিন্তু ব্যবসায় যাওয়ার আগে বা ব্যবসা চলাকালীনও এই শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না যে, কোন ব্যবসা হালাল, কোন ব্যবসা হারাম, ব্যবসা-সংক্রান্ত শরীয়তের বিধিবিধান ও হেদায়েতসমূহ কী? কোন কোন কাজ করলে গায়েবিভাবে বরকতের আশা করা যায়। আর কী কী কারণে ব্যবসার যাহেরী বা বাতেনী বরকত হয়।

নতুন ধরনের কোনো ব্যবসা শুরু করতে হলে এর প্রস্তাবিত খসড়ার অনুমোদন নেওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মুফতী থেকে জেনে নেওয়া

উচিত, ওই ব্যবসার সকল দিক শরীয়ত সমর্থিত কি না, কোনোদিক শরীয়ত পরিপন্থী হলে তার বিকল্প বৈধ কোনো পদ্ধতি আছে কি না।

লেনদেন-সংক্রান্ত কোনো এগ্রিম্যান্ট বা চুক্তিপত্র তৈরিতেও কোনো আইনজীবী থেকে পরামর্শ গ্রহণের আগে শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে জেনে নেওয়া চাই– চুক্তিপত্রের কোনো শর্ত বা ধারা শরীয়ত পরিপন্থী আছে কি না। থেকে থাকলে যে উদ্দেশ্যেই ওই শর্তটি লাগানো হয়েছে তা হাসিলের বিকল্প কোনো পদ্ধতি আছে কি না।

কোথাও চাকরিতে যোগদান করতে হলে ওই চাকরি-সংক্রান্ত শরীয়তের নির্দেশনা জেনে নেওয়া কর্তব্য। মালিক পক্ষের কী অধিকার, সহকর্মীদের কী অধিকার, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত বা যারা আমার কাছে এসে থাকে তাদের কী অধিকার ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা যে সম্পদ দিয়েছেন তাতে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর বান্দার কী কী হক রয়েছে সেগুলো জেনে নিতে হবে। সম্পদ বাড়ানো, খরচ করা এবং সঞ্চয়-সংক্রান্ত শরীয়তের নির্দেশনাবলি জানতে হবে।

মোটকথা, মানুষ যে শ্রেণিভুক্তই হোক, জীবনের যে পর্বেই থাকুক, যে সময়, অবস্থা, কাজ ও পেশাতেই থাকুক শরীয়তের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও নির্দেশনাবলি জানা তার ওপর ফরযে আইন। এটিই ওই হাদীসের মর্ম, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।' –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর 'সহীহ'-এ একটি শিরোনাম দিয়েছেন– بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ 'কোনো কাজে যোগদানের আগে সে সম্পর্কে বিধানাবলি জেনে নেওয়া উচিত।' এরপর ইমাম বুখারী রহ. এ-সংশ্লিষ্ট কিছু দলিল উল্লেখ করেছেন।

এই স্বভাবজাত যৌক্তিক নীতি ও পদ্ধতিকে অবলম্বন করার মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতের শান্তি রয়েছে এবং মানব সভ্যতার সফলতাও এতেই নিহিত। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত তো হতে হবেই, পার্থিব জীবনও একজন মুমিনের জন্য অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে। এখানে আমি একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

তালাকের মাসআলা

কেউ বিয়ে করার ইচ্ছে করলে তার প্রথম কাজ হচ্ছে বিয়ে-সংক্রান্ত জরুরি মাসআলাসমূহ জেনে নেওয়া, স্ত্রীর সঙ্গে সহ-অবস্থানের আদব ও শিষ্টাচারসমূহ জানা। সঙ্গে সঙ্গে একথা জানাও অপরিহার্য যে, তালাক আল্লাহ তাআলার কাছে অতি নিকৃষ্ট একটি বিষয়। তবে যেহেতু কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এর বিকল্প থাকে না, তাই আল্লাহ তাআলা বান্দার উপকারার্থে এই পথ খোলা রেখেছেন। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ তাআলার কোনো বান্দার ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে একে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তাহলে সে গোনাহগার হবে এবং আল্লাহর দরবারে অধিকার নষ্ট করার এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে আসামি সাব্যস্ত হবে।

তাই তালাকের মাসআলা-মাসায়েল জেনে নেওয়া জরুরি। কী কী অপারগতায় তালাক দেওয়া যায়, যদি তালাক দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় না থাকে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে যখন তালাক দেওয়া জায়েয, তখন কী পদ্ধতি নাজায়েয, কোন পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা উচিত, শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করে স্ত্রীকে গ্রহণ করলে কী কী বিপদে পড়তে হয়–এসব বিষয় জানার এবং বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করার পরই তালাকের নাম নেওয়া উচিত।

ভাবার বিষয়, আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক বিয়ে করার কারণেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হয়েছে। এখন স্ত্রীর সঙ্গে জীবনযাপন করা অথবা অপারগ অবস্থায় পৃথক হওয়ার সময় কেন আমরা আল্লাহর হুকুম ভুলে যাই, তখন আমরা কেন জরুরি মাসায়েল ও বিধিবিধান জেনে সে মোতাবেক আমল করি না।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে কঠিন ও জটিল বিষয় হচ্ছে তিন তালাকের মাসআলা। কেননা, এরপর কারো পক্ষ থেকেই আর বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখার সুযোগ থাকে না। অবশ্য দ্বিতীয়বার দাম্পত্য জীবন গড়ার শুধু এমন একটি পথ অবশিষ্ট থাকে, যা তাদের কারোর এখতিয়ারাধীন নয়। ইদ্দত শেষ হলে মহিলার অন্যত্র বিয়ে হবে, তারা দাম্পত্য সম্পর্ক ভোগ করবে, স্বামীর ইন্তেকাল হবে বা কোনো কারণে তাদের সংসার ভাঙবে; ইন্তেকালের বা তালাকের ইদ্দত পুরো হওয়ার পর যদি উভয়ে জীবিত থাকে এবং পরস্পর বিয়েতে রাজি থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ নতুনভাবে শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে হতে পারে। স্পষ্টত এটা একটা দীর্ঘ ব্যাপার এবং তা নিজের ইচ্ছাধীনও নয়।

এরপরও বহু লোককে দেখা যায়, তারা কথায় কথায় তালাক পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে তিন তালাকে তাদের নিঃশ্বাস শেষ হয় না, আরো কিছু বলতে থাকে এবং নিজের ও জীবনসঙ্গিনীর সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়। এ মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জনৈক ব্যক্তি তিন তালাক দেওয়ার পর তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন– وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا 'যে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর আদেশ মতো চলে আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন।' কিন্তু তুমি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করনি, তাই আল্লাহ তাআলাও তোমার জন্য কোনো পথ রাখেননি। এভাবে তালাক দেওয়ার কারণে তুমি গোনাহগার হয়েছ এবং তোমার স্ত্রী তোমার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২১৯৭; ফাতহুল বারী ৯/২৭৫

খতীব ও ওয়ায়েজদের পাশাপাশি সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে, এসব মাসআলার ব্যাপারে জনসাধারণকে সতর্ক করার। তারা প্রচার মাধ্যমগুলোতে বিয়ে, তালাক ও দাম্পত্য জীবন-সংক্রান্ত বিধিবিধান বুঝানোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে পারেন এবং এ দেশের লোকদেরকে পাকিস্তানী আইনের (যা আইউব খান কর্তৃক অধ্যাদেশরূপে জারিকৃত) বরাতে 'তিন তালাক ধর্তব্যই নয়'-এ অপপ্রচারের পরিবর্তে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনাবলির ব্যাপারে অবগত করাতে পারেন; মুসলমানদের সংবিধান হল কুরআন ও সুন্নাহ, পাকিস্তানের কোনো আইন বা অধ্যাদেশ নয়। #

[মে-জুন '০৬ ঈ.]

ইসলামী ঈদ : তাৎপর্য ও শিক্ষা

ইসলামের একটি বড় সৌন্দর্য হল ইসলামের কোনো শিক্ষা বা সামান্য কোনো বিধানও অর্থহীন নয়। অসার ও অনর্থক কোনো কিছুর সুযোগ ইসলামে নেই। ভুল চিন্তা, কাল্পনিক ধারণা বা কোনো ভ্রান্ত বিষয়ের প্রসারদানও ইসলামের কোনো শিক্ষা ও নির্দেশনার ভিত্তি হতে পারে না। ইসলামের সকল শিক্ষা এবং সকল বিধান তা বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক বা অভ্যন্তরের সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হোক বা সমাজের সঙ্গে অথবা জীবনের যেকোনো শাখার সঙ্গে, খুবই অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে। এ জন্য দেখা যায়, যেসব কাজ অন্যান্য ধর্মে শুধু একটি রীতি হিসেবে পালিত হয়, ইসলাম সে ধরনের কাজগুলোতেও রীতি সর্বস্বতাকে স্বীকার করেনি; বরং তাকে একটি অর্থবহ নেক আমল হিসেবে সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছে; যাতে তা সবদিক থেকে দুনিয়া-আখেরাতে প্রভূত কল্যাণের কারণ হতে পারে, শুধু একটি অর্থহীন রেওয়াজ বা প্রাণহীন প্রদর্শনীরূপে বিদ্যমান না থাকে।

ইসলামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী করে রাখেনি। এক ব্যাপক শিক্ষা ও নির্দেশনার মাধ্যমে মনুষ্য জীবনের সকল বিভাগে ইসলামপন্থীদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিয়েছে। ইবাদত থেকে শুরু করে অভ্যাস ও আচরণ পর্যন্ত মানব জীবনের এমন কোনো বিভাগ নেই যেখানে ইসলামের স্পষ্ট পথ-নির্দেশ নেই। বিশেষত যে বিষয়গুলো শুধু যুক্তি ও বুদ্ধির বিচারে ফয়সালা করা সম্ভব নয় বা শুধু যুক্তির ভিত্তিতে ফয়সালা করতে গেলে অনুরূপ বিপক্ষ যুক্তির এক প্রবহমান ধারার উদ্ভব ঘটে, সেসব ক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালার পাশাপাশি বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করতেও ভুল করেনি। ঈদের ব্যাপারেও উপরিউক্ত দুটি নীতি শতভাগ কার্যকর রয়েছে।

আনন্দ-উৎসব মানুষের একটি বৈধ ও স্বাভাবিক প্রবণতা। এতে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। কিন্তু উৎসবের উপকারিতা তখনই পাওয়া যেতে পারে যদি এর ভিত্তিটি সঠিক হয় এবং উদযাপন-পদ্ধতিটিও হয় অভ্রান্ত। বলাবাহুল্য, এ দুটি বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান শুধু ওহীর মাধ্যমেই হাসিল হতে পারে। এ জন্য যেসব জাতি ওহীর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত বা ওহীর শিক্ষাকে বিকৃত করে সেই বিকৃত পথের অনুসারী হয়েছে এবং সর্বশেষ ও চিরন্তন ওহী

যা যথাযথভাবে সংরক্ষিত, তা থেকে বিমুখ হয়েছে তাদের উৎসবগুলোতে কোনো তাৎপর্যগত প্রাণ বা অর্থবহতা পরিলক্ষিত হয় না। সেগুলো শুধুই একটি প্রচলিত রীতি হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। আর এই রীতিটিও গড়ে উঠেছে হয় কোনো মূর্খতার নিদর্শনকে কেন্দ্র করে বা পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসরণে অথবা ভিন্ন কোনো জাতির দলিল-প্রমাণহীন অনুকরণে।

বলতে বা শুনতে যতই একপেশে মনে হোক তবুও এটাই সত্য যে, শুধু মুসলিম জাতিই এই অনন্য সৌভাগ্যের অধিকারী যে, তাদের ঈদ ও উৎসবের ভিত্তি ও কর্মপদ্ধতি উভয়ই নির্ধারিত হয়েছে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে। ইসলামী শরীয়ত তার অনুসারীদেরকে মনগড়া অলীক ধারণার অনুসরণ করার বা ভিন্ন জাতির অন্ধ অনুকরণ করার অনুমতি দেয়নি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন দেখেন, মদীনার অধিবাসীরা বছরে দুবার খেলাধুলা ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ-উৎসব করে থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এ দুই দিন কীসের দিন? লোকেরা উত্তরে বলল, আমরা জাহেলিয়াতের যুগ থেকেই এ দু-দিন আনন্দ-উৎসব করে আসছি। অর্থাৎ এটা আমাদের প্রাচীন উৎসবের দিন। তখন নবীজী আল্লাহ তাআলার আদেশে মুসলিম উম্মাহর জন্য অন্য দুটি দিন নির্বাচন করেন এবং ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحٰى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

'আল্লাহ তাআলা এ দুটি দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। সে দিন দুটি হল 'ইয়াওমুল আযহা' ও 'ইয়াওমুল ফিতর' (অর্থাৎ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দুই দিন।)' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১১৩৮; মুসনাদে আহমদ ৩/১০৩, হাদীস ২৩৫

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا.

'প্রত্যেক জাতির নিজস্ব উৎসবের দিন রয়েছে আর এই দিন হল আমাদের নিজস্ব উৎসবের দিন।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৯২

উভয় ঈদের উদ্দেশ্যই হল নির্মল আনন্দ উপভোগ করা। কিন্তু এই আনন্দের অন্তর্নিহিত কারণ, সময় ও পন্থা-পদ্ধতি সবই শরীয়ত শিখিয়ে দিয়েছে। আর এখানেই নিহিত রয়েছে মুসলিম উম্মাহর ঈদ এবং অন্যান্য জাতির পর্ব-উৎসবের মধ্যকার পার্থক্যটি।

ঈদুল ফিতরের একটি বড় তাৎপর্য হল মাহে রমযানের সিয়াম, রাতের কিয়াম এবং অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াতের মতো বিশিষ্ট নেয়ামতরাজি অর্জিত হওয়ার আনন্দ উপভোগ করা এবং রাব্বুল আলামীনের হাম্‌দ ও সানা এবং তাঁর তাকবীর ও তাযীম তথা বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা।

এই ঈদে আনন্দ করার পদ্ধতি কী হবে? পদ্ধতি তা-ই হবে যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। যার সারকথা হল, এ দিন ঈদগাহে যাওয়ার আগে সদকায়ে ফিতর আদায় করা; যাতে গরীব-দুঃখী এ দিন উপার্জনের চিন্তা ও ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে সবার সঙ্গে এক কাতারে ঈদের নামাযে শরিক হতে পারে। তেমনি নামাযে যাওয়ার আগে কয়েকটি খেজুর আহার করা এবং বেজোড়সংখ্যক হওয়ার প্রতি লক্ষ রাখা। যদি খেজুর না পাওয়া যায় তবে কোনো মিষ্টি দ্রব্য আহার করা। এতে প্রকাশ পাবে যে, আজ আর রোযা নেই। রোযার মাস শেষ হয়েছে।

নামাযের আগে গোসল করা এবং ধোয়া পরিষ্কার সবচেয়ে ভালো জামাটি পরিধান করা। বেশি পরিমাণে তাকবীর বলা। অর্থাৎ–

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

তবে এ দিন তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে পড়বে না। ইমামের পেছনে দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করা। এই নামায আদায় করা ওয়াজিব। নামাযের পরে খুতবা শোনা। ফিরে আসার সময় সম্ভব হলে অন্য রাস্তা দিয়ে আসা।

এই হল ঈদের দিনের শরীয়ত নির্দেশিত কর্মসূচি। এ ছাড়া এই দিনে শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে ব্যক্তিগতভাবে আনন্দের আরো কোনো কাজ করা কিংবা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ইত্যাদিও নিষিদ্ধ নয়। তবে এটাকে ঈদের দিনের শরীয়ত নির্দেশিত কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাবে না।

এখানে ঈদের সকল বিধান ও ফযীলত বর্ণনা করা বা ঈদের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ফালসাফা বা তাৎপর্য উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়। এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র ও দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রয়োজন রয়েছে। এখানে শুধু এ ব্যাপারে সচেতন করা উদ্দেশ্য যে, আমরা যেন ঈদের শিক্ষা ও তাৎপর্য নিয়ে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করি। ইসলাম তার অনুসারীদের ভিনজাতির অনুকরণ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং মনগড়া অলীক বিষয়াদি অবলম্বন করা থেকে মুক্ত রাখার জন্য ঈদের একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা দান করেছে এবং তাকে যত্নের সঙ্গে অবলম্বন করার নির্দেশ

দিয়েছে। এখন যদি কেউ ইসলামী ঈদকে ভিনজাতির উৎসবের মতো শুধু একটি রীতি সর্বস্ব উৎসব বিবেচনা করে অথবা তাদের উৎসবেও অংশগ্রহণ করে কিংবা খ্রিষ্টানদের দেখাদেখি 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে এক নতুন ঈদ বা উৎসব আবিষ্কার করে, তবে তা রাব্বুল আলামীনের প্রদত্ত ঈদের নাশোকরি ছাড়া আর কিছুই হবে না। এ ধরনের নাশোকরি নিঃসন্দেহে স্পষ্ট কবীরা গোনাহ; বরং অনেক সময় তা কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে।

এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেই বলা হয়–

بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا.

'কতই না মন্দ জালেমদের বদলটি' এবং

اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ.

'তোমরা কি উত্তমটির পরিবর্তে গ্রহণ করছ অধমটি!'

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং রাব্বুল আলামীনের নেয়ামতের সঠিক মূল্যায়নের তাওফীক নসীব করুন, আমীন।#

[অক্টোবর-নভেম্বর '০৬ ঈ.]

বিদায় রমযান, বিদায় ঈদ, কী পেলাম কী হারালাম

রমযান মাস পুরোটাই কল্যাণ ও বরকতের মাস; এই মাস আল্লাহর বান্দাদেরকে মেঘমালার মতো সুশীতল ছায়া দান করছিল; এ মাসের রোযা তাকওয়ার অনুশীলন দান করছিল; মেহরাবগুলোতে হাফেয সাহেবদের সুমধুর তেলাওয়াতের ধ্বনি– যা মূলত মুমিনদের উদ্দেশ্যে রাহমানুর রাহীমের আহ্বান, মস্তিষ্ককে সুশোভিত আর অন্তঃকরণকে আলোকিত করছিল; তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদ, যিকির ও দুআ অন্তরকে আল্লাহর নৈকট্যের অনুভূতিতে সিক্ত এবং চোখ থেকে খোদাভীতির অশ্রুবৃষ্টি ঝরাচ্ছিল।

দেখতে দেখতেই এই ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটল; যেন ইবাদতের সেই বিশেষ রুখ পরিবর্তিত রূপ ধারণ করল এবং ১ শাওয়ালে রোযা নয়, ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক ঈদ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নির্দেশ এল এবং এরই মাধ্যমে বান্দা তার গোলামির পরিচয় তুলে ধরার নির্দেশ পেল।

শাওয়ালের ২ তারিখ থেকে এক বছরের জন্য এই দুই নেয়ামত রমযান ও ঈদ আমাদের থেকে চলে গেল। যদি হায়াত পাই আর আল্লাহ্ তাআলার তাওফীকও ভাগ্যে জুটে তাহলে পুরো এক বছর পর আবার এই দুই নেয়ামত আমরা ফিরে পাব।

এ পর্যায়ে একজন মুমিনের ভেবে দেখা উচিত, রমযান ও ঈদ থেকে সে কী পেল; এর কী কী প্রভাব ও ক্রিয়া অন্তর ও মস্তিষ্কে, বোধ ও বিশ্বাসে, কর্ম ও চরিত্রে অবশিষ্ট রইল। রমযান থেকে সে কী পেল এবং রমযানের বিদায়ে কী কী খায়ের-বরকত সে হারাল।

এটা বাস্তব যে, যে ব্যক্তি রমযানের হক যত বেশি আদায় করেছে, রমযানের আদবসমূহের প্রতি যত বেশি যত্নবান থেকেছে সে তার কর্মজীবনে রমযান ও ঈদের প্রভাব ও ক্রিয়া ততবেশি অনুভব করবে। আর যে ত্রুটি করেছে সে তার ত্রুটির মাত্রানুপাতে প্রভাব ও ক্রিয়াতেও ত্রুটি উপলব্ধি করবে।

রমযানের সবচেয়ে বড় প্রভাব (যদি রোযা রাখা হয়ে থাকে এবং রোযাকে গোনাহমুক্ত রাখা হয়ে থাকে) তাকওয়া; যা বান্দাকে প্রতিমুহূর্তেই রাহনুমায়ি

ভয়াবহ যে, দুর্বল তাকওয়ার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং বার বার অন্তরের এরূপ আগ্রহকে কদর না করার কারণে তা আরো দুর্বল হয়ে যায়; যা একজন মুমিন বান্দার জন্য খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

মোটকথা তাকওয়ার গুণ যার যতটুকুই অর্জিত হয়েছে তা রক্ষণাবেক্ষণ করা, সযত্নে তা লালন করে সেটি আরো শক্তিশালী করাই হবে রমযানের নেয়ামতের যথার্থ হক ও শোকর আদায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর তাওফীক দান করুন, আমীন।

আল্লাহর যেসব বান্দা রমযানের রোযাও রাখেনি এবং ঈদও ভিনজাতির মতো শুধু অনুষ্ঠান-সর্বস্বরূপেই পালন করেছে; রমযানের শেষ দশক– যা পুরো মাসের রূহ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় সময়, একেও যারা ঈদ-মার্কেটের পেছনে ক্ষয় করেছে; তাদের কাছে এখন রমযান ও ঈদের কিছু থেকে থাকলে আছে নতুন নতুন ডিজাইনের পোশাক আর জুতো এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে পাওয়া কিছু গিফ্‌ট আর ঈদ কার্ড!!

তেমনি যারা রমযানে জিনিসপত্রের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে রোযাদারদের থেকে অন্যায়ভাবে অধিক মুনাফা লুটে সম্পদের পাহাড় গড়েছে অথবা বিতাড়িত শয়তান শৃঙ্খলিত হওয়া সত্ত্বেও যারা এই মুবারক মাসে অন্যায়-অপরাধ দুর্নীতি-সন্ত্রাস ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল– এদের সবার জন্য এখনো পথ খোলা রয়েছে; রাব্বুল আলামীন অসীম দয়ালু ও মেহেরবান। তাঁর দয়ার দুয়ার সব সময় বান্দার জন্য খোলা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি একটু হৃদয়ের কান দিয়ে শুনুন–

عَنْ أَبِيْ مُوسٰى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ، حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

'আল্লাহ তাআলা রাতে তাঁর রহমতের হাত প্রসারিত করেন (বান্দার তওবা কবুল করার জন্য উন্মুক্ত থাকেন) যাতে দিনের অপরাধী তওবা করে (কৃতকর্মের ব্যাপারে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে) এবং আল্লাহ তাআলা দিনে তাঁর রহমতের হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের অপরাধী তওবা করে; যত দিন না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়। (কেয়ামতের আগ পর্যন্ত এই সুযোগ অবারিত।)' –সহীহ মুসলিম ২/৩৫৮

তাই কোনো রকম বিলম্ব না করে এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত; খাঁটি

করে; কল্যাণের দিকে আহ্বান করে; কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং অকল্যাণের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে; অকল্যাণ থেকে বিরত থাকার তাগিদ সৃষ্টি করে। তাকওয়ায় পরিপূর্ণ অন্তর নসীহত দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হয় এবং সামান্য সতর্ক করার দ্বারা অমঙ্গলের পথ থেকে ফিরে আসে।

আমরা যদি রমযান ও রোযার পুরো হক আদায় না করে থাকি, তাহলে তাকওয়ার সেই বিশেষ স্তর আমাদের অর্জিত হয়নি। তবুও নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। কেননা প্রতিটি মুমিনের অন্তরে সামান্য পরিমাণে হলেও তাকওয়ার স্ফুলিঙ্গ অবশ্যই থাকে; আর রোযার মাধ্যমে তাতে কিছু না কিছু বৃদ্ধি অবশ্যই ঘটে থাকে। এখন যদি তা সযত্নে লালন করা হয় এবং সে মোতাবেক ধীরে ধীরে আমল করা হয় তাহলে এগুণ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর এবং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকবে। গুণাবলি ও যোগ্যতাসমূহের এটিই সহজাত নিয়ম এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী সৎগুণাবলির ব্যাপারে একথা অধিক সত্য এবং অধিক প্রযোজ্য।

আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে নিজেই ইরশাদ করেছেন, 'আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা রাখে আমি তার সঙ্গে সেরূপ আচরণ করি এবং বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গী হই। যদি সে আমাকে একাকী স্মরণ করে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। যদি সে আমাকে জামাতে সমবেতভাবে স্মরণ করে আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম জামাতে স্মরণ করি। যদি বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে চার হাত অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।' –সহীহ মুসলিম ২/৩৪১

এখন যদি অন্তরে কোনো নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হয় বা নেক কাজের দিকে অন্তর ধাবিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি তাকওয়া ও খোদাভীতির প্রভাব; এর কদর করতে হবে এবং কালবিলম্ব না করে এই আগ্রহ মোতাবেক আমল করতে হবে। তেমনিভাবে কোনো গোনাহের ব্যাপারে, যাতে আমরা দুর্ভাগ্যবশত লিপ্ত রয়েছি, যদি অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হয়, তা পরিহার করার তাগাদা যদি অন্তরে উপলব্ধি হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি অন্তর্নিহিত তাকওয়া ও খোদাভীতির প্রভাব। এর কদর করা এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে গোনাহ পরিত্যাগ করে খাঁটি মনে তওবা করে নেওয়া জরুরি। এ ব্যাপারে বিলম্ব করা এজন্যও

মনে তওবা করে কল্যাণের পথে প্রত্যাবর্তন করা উচিত এবং আগামী রমযানের কল্যাণ ও বরকত লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত।

এ ব্যাপারে শেষ কথাটি হল, আমরা রমযান মাসে যেমন আল্লাহর বান্দা ছিলাম এখনো আল্লাহর বান্দা। তাই তখন যেমন গোনাহ পরিহারের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতাম, নামাযের প্রতি খেয়াল রাখতাম, জামাতের সঙ্গে নামায আদায়ের চেষ্টা করতাম সে ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রাখা উচিত।

গোনাহ যখনই করা হোক তা গোনাহ। তাই রমযান মাস চলে গেলে গোনাহর কাজে লিপ্ত হওয়া যায়–এই মানসিকতা পরিহার করতে হবে। তা ছাড়া নামায তো রোযার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং প্রতিদিনের আমল; ঈমান ও ইসলামের নিদর্শন। যে মুমিন অন্তত এটুকু চিন্তা করবে যে, নামাযের মাধ্যমে মাটি দ্বারা সৃজিত এই দুর্বল মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের দরবারে হাজিরা দিতে পারছে, তার প্রিয় প্রেমাস্পদ রাহমান ও রাহীমের সঙ্গে কথোপকথনে সক্ষম হচ্ছে, তার পক্ষে নামাযের ব্যাপারে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করা সম্ভব হবে না; বরং অতি দুর্লভ অথচ সহজপ্রাপ্তি ভেবে মনেপ্রাণে নামাযের ব্যাপারে যত্নশীল হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন। নামাযের গুরুত্ব এবং একে জানদার বানানোর প্রচেষ্টায় আমাদের নিয়োজিত রাখুন, আমীন।#

[ডিসেম্বর '০৬ ঈ.]

হজের কার্যাদি শেষ হয়েছে, হজ যেন শেষ না হয়

হজযাত্রীগণ হজ আদায়ের সময় আল্লাহর মেহমান ছিলেন। হজ সমাপনের পর যখন নিজ দেশে ফিরেছেন তখন তারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধিরূপে ফিরেছেন। নিজ নিজ আবাসভূমিতে তারা ফিরে এসেছেন হজ ও যিয়ারতের প্রভূত বরকত নিয়ে। হারামাইন শরীফাইন, মিনা ও আরাফায় চৌদ্দশ বছর যাবৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবার যে পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে সেই শিক্ষাকে নতুনভাবে ইয়াদ করে করে তারা ফিরেছেন স্বজাতির জন্য পুরস্কার ও সতর্কতার বার্তা নিয়ে। তারা যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে ইয়াদ করে মূর্তিমান দাওয়াতরূপে নিজ নিজ আবাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

[২]

হাজী সাহেবানকে ইস্তেকবাল করা একটি উত্তম বরং মাসনূন আমল। খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন এই আমলটির ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। মুসনাদে আহমদের একটি হাদীসে (হাদীস ৫৩৭১) বলা হয়েছে–

إِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ، وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، فَإِنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَهُ.

'তুমি যখন হজ সমাপনকারীর সাক্ষাৎ লাভ করবে তখন তাকে সালাম দেবে, তার সঙ্গে মুসাফাহা করবে এবং তার কাছে ইস্তেগফারের দুআ প্রার্থনা করবে তার গৃহে প্রবেশের আগেই। কেননা সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে।'

প্রতি হজের মৌসুমে ইচ্ছা হয়, বিমানবন্দরে গিয়ে হাজী সাহেবানের ইস্তেকবাল করি। এই পবিত্র আত্মা ও সমুজ্জ্বল চেহারাগুলোর দর্শন লাভ করি এবং যারা নিকটতম সময়ে রবের নৈকট্য ও প্রিয়তম নবীর সান্নিধ্য-সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁদের কাছে মাগফেরাতের দুআ কামনা করি, যে চেহারাগুলো এখনো মেহেরবান রবের অনুগ্রহ-আভায় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। উলামা-মাশায়েখ, দোস্ত-আহবাব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কত মানুষ প্রতি বছর

হজ করে ফিরে আসেন, কিন্তু তাদেরকে ইস্তেকবাল করার সৌভাগ্য হয়ে ওঠে না। তাদের ইস্তেকবালের আরযু আরযুই থেকে যায় এবং মৌসুম সমাপ্ত হয়। কিন্তু এ বছর আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে ২রা মহররম ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ২২ জানুয়ারি ২০০৭ সালের সোমবার সন্ধ্যার কিছু আগে বিমানবন্দরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এদিন মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম (আদীব হুযুর) ও হাফেজ ইয়াহইয়া জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে হজের সফর থেকে ফিরে আসছিলেন। সে এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য ছিল।

যদি সেই হৃদয়-সম্পদের প্রাচুর্য থাকত, তাহলে ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (৭৪৮ হি.) রহ-এর নসীহতের ওপর আমল করতাম, যা তিনি তাঁর বিখ্যাত রচনা সিয়ারু আলামিন নুবালায় উল্লেখ করেছেন। আবীদা আসলামী রহ.-এর আলোচনায় যাহাবী রহ. তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন–

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মুবারকের একটি চুল আমার কাছে থাকবে তা ভূপৃষ্ঠের সমুদয় সোনা-রুপার মালিক হওয়া থেকেও আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।'

যাহাবী রহ. বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের মাত্র পঞ্চাশ বছর পর এই ইমাম উপরিউক্ত কথাটি বলেছেন। তাহলে আমরা যারা আজ কত শ বছর পরের সময়ে অবস্থান করছি তাদের হৃদয়-জগতে কীরূপ আলোড়ন উঠবে যদি আমরা তাঁর কোনো একটি চুল মুবারক হাতে পাই এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারি, এটি তাঁরই কিংবা যদি পাই তাঁর ব্যবহৃত জুতার একটি ফিতা অথবা তাঁর কর্তিত নখের কিছু টুকরো অথবা যে পেয়ালায় তিনি পানি পান করেছেন তার একটি ভগ্নাংশ। কোনো ঐশ্বর্যশালী যদি তার বিপুল বিত্ত শুধু এই সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যয় করে, তাহলে কি তুমি তাকে অপচয়কারী বলবে কিংবা বলবে নির্বোধ? অসম্ভব। তাহলে তোমার সম্পদটুকু সেই মসজিদের যিয়ারতের জন্য ব্যয় কর, যার নির্মাণে তিনি শরিক হয়েছিলেন নিজ হাতে। তাঁর শহর মুবারকে তাঁর হুজরার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম করার জন্য, তাঁর উহুদের দর্শন-সৌভাগ্য লাভের জন্য, যে উহুদকে তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর উপবেশনের স্থান, তাঁর সেই 'জান্নাতের বাগানখানির' সাহচর্য লাভের জন্য তোমার সম্পদ ব্যয় কর।

তুমি তো মুমিন হিসেবেই গণ্য হবে না, যদি এই সরতাজ তোমার কাছে তোমার আত্মা ও সত্তা, তোমার সন্তান ও সম্পদ এবং অন্য সকল মানুষ থেকে

প্রিয় না হয়ে থাকেন।

সেই সম্মানিত পাথরে চুম্বন করে ধন্য হোন, যা অবতীর্ণ হয়েছে জান্নাত থেকে এবং আপনার ওষ্ঠদ্বয় সেই স্থানটির স্পর্শ লাভ করুক, যে স্থানটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ওষ্ঠদ্বয়ের স্পর্শ লাভ করেছে। আপনার সম্পদ মুবারক হোক। এপথে ব্যয়িত হওয়ার চেয়ে আর তো কোনো গর্বের পথ নেই।

ছাবিত বুনানী রহ. যখন সাহাবী আনাস ইবনে মালেক রা.-কে দেখতেন তখন তাঁর হস্ত মুবারক চুম্বন করতেন এবং বলতেন, 'এই হাতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের হাত স্পর্শ করেছে।' আমাদের যখন এই সৌভাগ্য হয়নি, তাহলে আমরা হাজরে আসওয়াদের ব্যাপারে ভাবতে পারি যে, এই সম্মানিত পাথর ভূমিতে আল্লাহর নিদর্শন, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বন করেছেন। যদি হজের সৌভাগ্য আমার না হয় তবে যখন হাজীগণ হজ সমাপন শেষে ফিরে আসেন তখন তাঁদের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হোন এবং তাদের মুখে চুম্বন করুন। কেননা এই মুখ তো সেই পাথরে চুম্বন করেছে যে পাথর আমার প্রিয়তমের স্পর্শ-সৌভাগ্যে ধন্য।' –সিয়ারু আলামীন নুবালা ১/৮৬

মাওলানা ইয়াহইয়া জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর বন্ধুর ইজাযত নিয়ে রোখসত হলেন এবং আমার প্রতি আদীব হুযুরের অনুগ্রহ হল। তিনি আমাকে তাঁর সহযাত্রী করলেন এবং বললেন, 'আপনার সঙ্গে একান্ত একটু সময় কাটাই।' তাঁর কথা শুনতে লাগলাম এবং প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমিও নানা কথা জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া, কলম-কাগজ সঙ্গেই ছিল। তাঁর কথাগুলো নোট করতে লাগলাম। তাঁর এই অনুভব-অনুভূতিগুলো পাঠক যেহেতু তাঁর কাছে থেকে শুনতেই পছন্দ করবেন, তাই তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে তাঁর সফরনামাটি আসা পর্যন্ত। এর আশ্বাস তিনি আমাদের দিয়েছেন হজের সফরে যাওয়ার আগেই।

তাই সেসব কথার পরিবর্তে আমি শুধু একটি কথাই পাঠককে শোনাচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, হজের হেফাজতের ব্যাপারে কিছু বলুন। বেশ পীড়াপীড়ির পর তিনি তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে যে কথাটি মুযাকারা করেছেন তার সারসংক্ষেপ আমাকেও শোনালেন। তার মধ্যে একটি কথা এই ছিল যে, হজের কার্যাদি সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু হজ শেষ হয়নি। যা বাকি থাকবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মানুষ সারা জীবন নামায পড়লে নামাযী হয়। জীবনের

প্রতি রমযানে রোযা রাখলে রোযার দায়িত্ব পালিত হয়। কিন্তু মানুষ যখন একবার হজ করে তো গোটা জীবনের জন্য হজের দায়িত্ব আদায় হয়। তাহলে এই এক হজ তার গোটা জীবনব্যাপী পরিব্যাপ্ত। এই হজই তার গোটা জীবনের আমল। হজের নির্ধারিত কার্যাবলি যদিও সেই নির্ধারিত স্থানগুলোতে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু হজের শিক্ষাগুলো অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রেম ও দাসত্বের প্রেরণা, সতর্কতা ও পরহেযগারি, অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা, গোনাহের কাজকর্ম ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি বিষয় তো গোটা জীবনেই পরিব্যাপ্ত। এগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়ার কোশেশ করা হজের সৌভাগ্য লাভকারীগণের অবশ্য কর্তব্য। বলাবাহুল্য, এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারাই হল হজ কবুল হওয়ার সবচেয়ে বড় আলামত এবং একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, জান্নাতের ওয়াদা যে কোনো ধরনের হজের ওপরে নয়, মকবুল হজের ওপরই করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

অতএব যে পায়ে বাইতুল্লাহর পানে চলেছি, যে হাতে বাইতুল্লাহ স্পর্শ করেছি এবং যে ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা হজরে আসওয়াদ চুম্বন করেছি তা যেন আল্লাহ তাআলার মর্জি-বিরুদ্ধ কোনো কাজে ব্যবহৃত না হয়—এই প্রচেষ্টা অবশ্যই জারি রাখতে হবে। প্রিয়তম নবীর পাকভূমির যিয়ারত-সৌভাগ্য লাভ হল এবং তাঁকে সরাসরি সালাম জানানোও নসীব হল তো এবার তাঁর সুন্নত-বিরুদ্ধ কোনো কাজ যেন আমরা না করি। সর্বশেষ কথা হল আমাদের প্রত্যেকের অবশ্যই এই মানসিকতা হওয়া উচিত, হজ সারাজীবন সংরক্ষণ করব, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও হাজী উপাধির প্রয়োজন যেন বোধ না করি।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী রহ. যখন ১২৩৭ হিজরীতে তাঁর বিশাল কাফেলা নিয়ে হজ করেন, তখন আরাফার ময়দানে তাঁর একটি দুআ এই ছিল যে, ইলাহী! এই কাফেলার কেউ যেন হাজী উপাধিতে প্রসিদ্ধ না হয়, যাদের আপনি নিজ অনুগ্রহে হজের সৌভাগ্য দান করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর এই দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। সেই হজের পর বিশ বছরের কিছু অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু সেই কাফেলার কেউ হাজী উপাধিতে প্রসিদ্ধ হননি।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেছেন, 'সম্ভবত সাইয়েদ

সাহেব রহ. অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এই দুআ এজন্য করেছিলেন যে, হজ দ্বীনের একটি রুকন ও ফরয আমল। অন্যান্য ফরয আমল যথা নামায আদায়কারীকে যেমন নামাযী নামে, যাকাত আদায়কারীকে যাকাতী নামে এবং রোযা আদায়কারীকে সায়েম বা রোযাদার উপাধিতে প্রসিদ্ধ হতে হয় না, তখন হজের ফরয আমল আদায়কারীকে হাজী নামে কেন প্রসিদ্ধ হতে হবে?' –সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ ১/৩৬৭#

[মার্চ '০৭ ঈ.]

হযরত হারদুঈ : যে শিক্ষাগুলো ব্যাপক হওয়া দরকার

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আববারুল হক হারদুঈ রহ. (জন্ম ১৩৩৯ হিজরী মৃত্যু ১৪২৬ হিজরী)-এর ব্যক্তিত্ব এই শেষ যুগে উম্মতের জন্য ছিল এক মহান নেয়ামত। তাঁর শিক্ষা ও হেদায়েতের আলো আলহামদু লিল্লাহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর শেষ খলীফা হওয়ার কারণে তাঁর ব্যক্তিত্ব রূপান্তরিত হয়েছিল সকলের মধ্যমণিরূপে। ব্যক্তি জীবনে তিনি নিজেকে তাকওয়া-তাহারাতে (আখলাক ও আদর্শের পবিত্রতায়) উত্তীর্ণ রেখে দাওয়াত, তাবলীগ, তালীম ও তাযকিয়ার ময়দানে অক্লান্ত পরিশ্রমরত অবস্থায় ৮৭ বছর বয়সে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

হযরতের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তিগুলোর অন্যতম হচ্ছে 'আশরাফুল মাদারিস' হারদুঈ এবং 'মজলিসে দাওয়াতুল হক'। বিশ্বের অনেক দেশেই এখন মজলিসে দাওয়াতুল হকের শাখা বিদ্যমান। মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ-এর প্রতি হযরতের কৃপাদৃষ্টি ছিল অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা হযরতের এই সুধারণা কবুল করুন।

বেশ কিছুদিন থেকে ভারত উপমহাদেশের কোনো কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের পক্ষ থেকে এই বাতিল চিন্তা-ধারণা—যা এক পর্যায়ে ঈমান বিধ্বংসীও—প্রচার করা হচ্ছে যে, কুরআন হাকীমের শুধু তেলাওয়াত কোনো সওয়াবের কাজ নয়। আসল বিষয় হচ্ছে কুরআন বোঝা। সুতরাং যে ব্যক্তি না বুঝে কুরআন পড়বে সে কোনো সওয়াব পাবে না। (নাউযু বিল্লাহ!)

এই ধারণা যে সম্পূর্ণ বাতিল তাতো খুবই স্পষ্ট বিষয়। কারণ কুরআন হাকীমের তেলাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করলে সে তেলাওয়াতও ঈমান, আমল এবং ইসলাহ ও তরবিয়তের ক্ষেত্রে অনেক উপকার পৌঁছায়। আর পরকালের সওয়াব তো আছেই। সেখানে তো প্রত্যেক হরফের জন্যই কমপক্ষে দশ নেকি করে পাওয়া যাবে।

হযরত হারদুঈ রহ.-কে আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দিন, তিনি এই বাতিল বিশ্বাসের অসারতা এবং সহীহ মাসআলা 'না বুঝে তেলাওয়াত

করলেও প্রতি হরফে দশ নেকি পাওয়া যাবে'–একথা মানুষের মনে বদ্ধমূল করার জন্য এই নির্দেশনা দিতেন যে, মশকের সময় কিংবা কোনো মাহফিলে তেলাওয়াত করার সময় যেন শ্রোতাদেরকে সতর্ক করার জন্য নিম্নোক্ত কথাগুলো তেলাওয়াতের আগে বলে নেওয়া হয়। তেলাওয়াতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা :

১. দিলের মরিচা দূর হয়।

২. আল্লাহ তাআলার মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

৩. না বুঝে পড়লেও প্রতি হরফে দশ নেকি পাওয়া যায়। যদি কেউ বলে, না বুঝে পড়লে কী লাভ? তবে সে হয় বদ-দ্বীন, না হয় জাহেল।

তেলাওয়াতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আদব

১. তেলাওয়াতকারী অন্তরে এই খেয়াল করবে, আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, শোনাও দেখি তুমি কেমন পড়।

২. শ্রোতা অন্তরে এই খেয়াল করবে যে, আহকামুল হাকিমীন ও সবচেয়ে বড় মেহেরবানের কালাম পড়া হচ্ছে। সুতরাং অত্যন্ত আযমত ও মহব্বতের সঙ্গে শুনতে হবে।

এর দ্বারা হযরতের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, সহীহ মাসআলাটি যেন মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এটা থেকে একথা বুঝতে আরম্ভ করেছে, একথাগুলোর কারণে মানুষের অন্তর থেকে কুরআন বোঝার গুরুত্ব হ্রাস পায়। তাদের এই ধারণা ঠিক নয়। কেননা কুরআন বোঝার চেষ্টা করা এবং কুরআনের তালীম ও হেদায়েত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা একটি স্বতন্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা স্ব স্ব অবস্থান অনুযায়ী প্রত্যেক মুমিনের জন্যই কাম্য।

খোদ হযরত হারদুঈ রহ. 'এক মিনিটের মাদরাসা' নামে দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত উপকারী ধারা শুরু করেছেন, যাতে নামাযের যিকির ও দুআগুলোর অনুবাদের পাশাপাশি সেসব সংক্ষিপ্ত সূরার সহজবোধ্য অনুবাদও সন্নিবেশিত করেছেন, যেগুলো সাধারণ মানুষ অধিকাংশ সময় নামাযে তেলাওয়াত করে থাকে।

আজ কুরআন বোঝার বিষয়টি ব্যাপক করার জন্য বিভিন্ন পন্থায় মেহনত চলছে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে সুচারু ও সুষ্ঠু নিয়মনীতির আওতায় সব হচ্ছে না, যার ফলে কোথাও কোথাও এই ফলাফল সামনে আসছে যে, অনেক

ইংরেজি শিক্ষিত লোক কুরআনের শুধু অনুবাদ কিংবা কোনো তাফসীরের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পুঁজি করেই নিজেকে মুজতাহিদ ভাবতে শুরু করেছে এবং তারা যেন দ্বীনের ইজমাসম্পন্ন বিধান এবং উম্মতে মুসলিমার স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো–যেগুলো মূলত কুরআন হাদীসেরই ভাষ্য–অস্বীকার করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

একথা স্পষ্ট যে, কুরআন বোঝার নামে এমন লাগামহীনতা এবং মানসিক বিভ্রাটের কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। তাই সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বশীলের ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবিলম্বে ভাবা প্রয়োজন, এমন লাগামহীন ও বিভ্রান্ত গবেষণার ওপর কীভাবে বিধি-নিষেধ আরোপ করা যায় এবং কীভাবে কুরআন বোঝার ফিকির ও চেষ্টাগুলো একটা সমন্বিত নিয়ম-নীতির আওতায় আনা যায়। তাহলে তাদাব্বুর ও তাযাক্কুরে কুরআন অর্থাৎ কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা, গবেষণা এবং কুরআন থেকে নসীহত গ্রহণের কাজও হবে এবং কুরআন বোঝার নামে কুরআনের তাফসীরে অবৈধ দখলদারিত্ব–যা সকল তাহরীফের (বিকৃতির) মূল–তার পথও বন্ধ হবে।

এ পর্যায়ে আমি পাঠকের কাছে যা বলতে চাচ্ছি তা হল, হযরত হারদুঈ রহ.-এর একটি আলোচনা, যা ১৪২০ হিজরী রমযান মাসে তিনি একটি বিশেষ মজলিসে করেছিলেন, ওই মজলিসে মাওলানা মুহাম্মাদ আরশাদ ফারুকী উপস্থিত ছিলেন, যিনি ওই মজলিসের একটি প্রতিবেদনও তৈরি করেছিলেন, যা মাসিক 'আয়েনায়ে মাজাহিরুল উলূম মুহিউস সুন্নাহ' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে; কিছুদিন আগে তার একটি কপি মাওলানা আব্দুল মাজীদ (উস্তায বাবুস সালাম মাদরাসা, ঢাকা) আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এখানে আমি হযরত হারদুঈর ওই আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ দুটি কথা পেশ করা সমীচীন মনে করছি।

১. মজলিসে কথা চলছিল, মাঝে একজন এসে বলল– হযরত, তাফসীরের সময় হয়ে গেছে। হযরত বললেন, রাখ ভাই, একটু দেরি হোক না; এখানেও তো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই চলছে এবং গুরুত্বপূর্ণ লোকদের সামনে।

তারপর বললেন, হযরত থানভী রহ. অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ফায়েদা পৌঁছানোর জন্য 'তাফসীরে বয়ানুল কুরআন' লিখেছেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. যখন সেটা দেখলেন, তখন এক মজলিসেই হাতের খণ্ডটি সম্পূর্ণ পড়ে ফেললেন এবং বললেন, এখন আমি নিশ্চিত হলাম, দ্বীনী ইলম উর্দু ভাষায়ও এসে গেছে।

আরো বললেন, হযরত থানভী রহ. বয়ানুল কুরআন লিখেছেন সাধারণ মানুষের জন্য। কিন্তু সাধারণ পাঠকের জন্য তা বোঝা কষ্টসাধ্য। মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. মাআরিফুল কুরআনের মাধ্যমে বয়ানুল কুরআনকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। এ জাতীয় তাফসীরগুলো সাধারণ মানুষের জন্য লেখা হয়েছে। যাতে তারা তা পড়ে-বুঝে পথ-নির্দেশনা পায় এবং সে অনুযায়ী আমল করে কামিয়াব হতে পারে।

কিন্তু বিষয়টি এতই অবহেলার শিকার যে, মানুষ এখন শুধু তেলাওয়াত করেই তৃপ্ত থাকছে অথচ তেলাওয়াত যেমন একটি স্বতন্ত্র ইবাদত, তেমনি কুরআন বোঝাও স্বতন্ত্র একটি ইবাদত। এই প্রয়োজন অনুভব করেই আমরা সর্বপ্রথম আশরাফুল মাদারিসে তাফসীরে বয়ানুল কুরআনের দরস আরম্ভ করেছি। ধরনটা খুবই সহজ এবং সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। একেবারে সাদাসিধেভাবে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে আয়াতের মূল বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আলহামদু লিল্লাহ, এ দরসে অংশগ্রহণকারী তালেবে ইলমদের ওপর এর খুব ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

যেদিন وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا এ আয়াতের তাফসীর করা হল, সেদিন একজন তালেবে ইলম পেরেশান হয়ে এসে বলতে লাগল– হযরত, আমি তো চুরির অপরাধে আক্রান্ত হয়ে গেছি, এখন আমি কী করি? জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কোথায় এবং কীভাবে চুরি করেছেন? সে বলল, আমাকে দুধ ভাগ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি কখনো ছাত্রদেরকে কম দিতাম আবার কখনো পানি মিশিয়ে দিতাম। ভাগ করার পর যা থেকে যেত তা আমি পান করে নিতাম। এখন আমি কী করব? আমরা তাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, কী পরিমাণ দুধ হবে তুমি চুরি করেছ? পরিমাণ ঠিক হওয়ার পর আনুমানিক দাম ঠিক করা হল। কিন্তু এই গরীব ছাত্র তার মূল্য কীভাবে আদায় করবে। পরে সে নিজেই ঠিক করল, আমি এত মাস পর্যন্ত বোর্ডিং থেকে যে দুধ পাব তা নেব না। সঙ্গে সঙ্গে সে তওবাও করল।

হযরত আরো বললেন, কুরআন কারীমের মধ্যে যে শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে তা পৃথিবীর অন্য কোনো কিতাবেই নেই এবং সম্ভবও নয়। তাই বন্ধুগণ, কুরআনের দরস ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করুন।

২. কবুলিয়াতের প্রথম এবং শেষ শর্ত হচ্ছে ইখলাস। তালেবে ইলমদের উচিত, তারা যখন ভর্তি ফরম পূরণ করে তখন ফরমের একটি ফটোকপি নিজেদের কাছে রেখে দেওয়া। কারণ ফরমে যেসব শর্ত ও নিয়মনীতি থাকে,

সেগুলোর ওপর দস্তখত করার পর তারা সেগুলো পূরণ করার ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে যায়। যার ফলে সেগুলোর কোনোটা লঙ্ঘন করলে তা ওয়াদাভঙের অন্তর্ভুক্ত হবে। অথচ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا 'নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।' –বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৪

তালেবে ইলমরা যদি এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখে তো তারা সফলকাম হবে এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। পরিচালক যিনি থাকবেন, তার উচিত হবে নিজেকে মাদরাসা এবং তালেবে ইলমদের খাদেম মনে করা। কখনো আত্মগরিমার শিকার না হওয়া। তারপর বলেন, এটা বড় আশ্চর্যের বিষয়, সব মাদরাসার লোকেরাই বিজ্ঞাপন-ক্যালেন্ডারে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে একথা প্রচার করে, আমাদের মাদরাসায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমানদের সংখ্যা এত! বলুন তো, মাদরাসাগুলোতে তালেবে ইলমদের সঙ্গে একজন সাধারণ মেহমানের মতো আচরণও কি করা হয়? আপনি যে রকম লেখেন তাদের সঙ্গে সে রকম আচরণ করুন। ভালো তালীম, ভালো খাবার, ভালো পোশাক, ভালো বসার জায়গা, ভালো নিবাসের ব্যবস্থা করুন। ভালো তরবিয়তের ব্যবস্থা করুন। তাদেরকে মেহমানে রাসূলের মতো প্রাণের চেয়ে প্রিয় জানুন।#

[আগস্ট '০৭ঈ.]

সাক্ষাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব

কয়েকদিন আগে একটি উর্দু পুস্তিকা নজরে পড়ল। 'মুলাকাত আওর টেলিফোন কে আদাব' (সাক্ষাৎ ও টেলিফোনের আদব-কায়েদা)। নাম ও বিষয়বস্তু দুটিই ছিল আমার জন্য আকর্ষণীয়। এটা হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী রহ. (আহসানুল ফাতাওয়া যাঁর ফতোয়া সংকলন)-এর একটি বয়ান, যা পুস্তিকাকারে 'কিতাব ঘর' নাযেমাবাদ করাচি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে এভাবে–

১. সাক্ষাতের জন্য আগে থেকে সময় নিন।

২. সাক্ষাতের কাজ ফোনে সেরে নিন।

৩. ফোনের কাজ চিঠির মাধ্যমে সারুন।

৪. ফোনে স্পষ্টভাবে নিজের পরিচয় দিন।

৫. যথাসময়ে ফোন করুন।

৬. শুধু প্রয়োজনেই ফোন করুন।

৭. ফোনে হ্যালো না বলে সালাম করুন।

৮. সালামের মাধ্যমে কথা শেষ করুন।

খুতবায়ে মা'সূরার পর মুফতী সাহেব বলেন, আজকাল আমাদের অনেকেরই আদাবুল মুআশারা সম্পর্কে জ্ঞান নেই। আদাবুল মুআশারা বলতে বোঝায় জীবন-যাপনের পদ্ধতি। অর্থাৎ সমাজবদ্ধ জীবনে পরস্পর মেলামেশা, আচার-আচরণ এবং সকল শ্রেণির মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার নিয়ম-নীতি।

প্রথমে দুটি মৌলিক নীতি বুঝে নেওয়া দরকার

১. একজন মানুষের ওঠা-বসা, চলাফেরা এবং অন্যের সঙ্গে তার আচার-আচরণ এমন হওয়া চাই, যেন তার নিজেরও কষ্ট না হয় এবং অন্যেরও কষ্ট না হয়।

২. নিজের এবং অন্যের কারো সময় যেন নষ্ট না হয়।

কথাগুলো সংক্ষেপে মূলনীতি আকারে বলা হলেও এর প্রয়োগের ক্ষেত্র অনেক

বিস্তৃত। 'আদাবুল মুআশারা' নামে হযরত থানভী রহ.-এর একটি পুস্তিকা আছে। তাতে অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এটি পাঠকের প্রজ্ঞা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। তারপরও জীবনের সকল অবস্থা ও পরিস্থিতি যেহেতু নির্দিষ্ট করে কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তাই সাধারণ বিচার-বুদ্ধি কাজে লাগানো অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা যাকে প্রজ্ঞা দান করেন তিনি বুঝতে পারেন কোন কাজটি কখন ও কীভাবে করতে হবে।

এরপর তিনি বলেন, আমি এখানে দুটি নীতি উল্লেখ করেছি, কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, নিজের আচার-আচরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়া এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা অনুসরণের চেষ্টা করা ছাড়া এটুকু উপলব্ধিও করা কঠিন যে, আমি এ নীতির অনুসরণ করছি কি না।

তারপর তিনি সাক্ষাৎ ও টেলিফোনের গুরুত্বপূর্ণ আদবগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন। যার শিরোনামগুলো উল্লিখিত হয়েছে।

এ বয়ানে তিনি এ বিষয়টি অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন যে, কারো কোনো কাজ যদি অন্য লোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে টেলিফোনে কাজ সারা গেলে সাক্ষাতের চিন্তা না করা উচিত। তেমনি চিঠিতে সমাধা করা সম্ভব হলে ফোনের চিন্তা করা ঠিক নয়। চিঠির মাধ্যমেই তা সমাধা করা উচিত।

এরপর ফোনের ক্ষতিকর বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছাড়া ফোন করা উচিত নয়। যে প্রয়োজন তাৎক্ষণিক নয় তা যেন চিঠির মাধ্যমে সারা হয়। ফোন ও চিঠির মধ্যে ছয়টি পার্থক্য উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, ফোনের পরিবর্তে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানই উত্তম ও নিরাপদ। কিন্তু আজকাল এ নসীহতের ওপর আমল করার লোক হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ মোবাইল ফোন মানুষের ধৈর্য ও চিন্তা-ভাবনার মানসিকতা বিদায় করে দিয়েছে। নিজের ও অন্যের সময়ের মূল্য সম্পর্কেও অনুভূতিহীন করে দিয়েছে।

এখানে মুফতী সাহেব খুবই শিক্ষণীয় ও অবিশ্বাস্য একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মাওলানা শাব্বীর আলী রহ. নাযেমাবাদ-৪-এ বসবাস করতেন এবং তার বাসায় ফোনও ছিল, কিন্তু আমার কাছে ফোন করার প্রয়োজন হলে তিনি ফোন না করে চিঠি লিখতেন। আমিও তার চিঠির উত্তর চিঠির মাধ্যমেই দিতাম। অথচ দুইজনের ঠিকানা কত কাছাকাছি। আমারও নাযেমাবাদ-৪, তারও নাযেমাবাদ-৪। মাওলানা শাব্বীর আলী রহ. বলতেন, আমি ফোন করলাম, আপনি তখন কোনো কাজে ব্যস্ত, আপনাকে

তাহলে কাজ ছেড়ে ফোন ধরতে হবে অথবা আমি ফোনে বাসায় সংবাদ দিয়ে রাখলাম। পরে সংবাদ পেয়ে আপনি ফোন করবেন, কিন্তু তখন আমি বাসায় নেই বা কোনো কাজে ব্যস্ত। সুতরাং আল্লাহ যখন চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রেখেছেন তো সুবিধামতো এটাই অবলম্বন করা ভালো। অবসর সময়ে ধীরস্থিরভাবে চিঠি লিখব এবং আপনিও সুবিধামতো এর জবাব দেবেন। কাজ একটু দেরিতে হলেও ধীরস্থির এবং শান্তভাবে হবে।

মুফতী সাহেব এ বয়ানে যে আদবগুলোর কথা আলোচনা করেছেন এ মুহূর্তে আমি সেগুলোর মধ্য দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।

১. সাক্ষাতের জন্য আগে থেকে সময় নেওয়া।

২. উপযুক্ত সময়ে ফোন করা।

সাক্ষাতের জন্য, বিশেষত যখন নির্দিষ্ট কোনো কাজ বা উদ্দেশ্য থাকে, তখন আগে সময় নেওয়া দুপক্ষের জন্যই ভালো। বিশেষ করে ব্যস্ত লোকদের জন্য এতে অনেক সুবিধা রয়েছে এবং ব্যস্ত লোকদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে লক্ষ রাখাও অনেক বেশি জরুরি। আর যদি এমন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যার সময় নিজস্ব এখতিয়ারে নয়; বরং এ সময়ে সে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো সম্মিলিত কাজ কিংবা কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্বে আবদ্ধ, তাহলে তো সে সময় যথাস্থানে ব্যয় করা তার নিজের ওপরও ওয়াজিব এবং অন্যদের জন্য তাকে এর সুযোগ করে দেওয়া জরুরি। অন্যথায় তাকে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অবশ্যই দায়িত্বে অবহেলার গোনাহয় পড়ে যেতে হয়।

হযরত হাকীমুল উম্মত রহ.-এর ওখানে এ নীতির কঠিন পাবন্দি ছিল। কেউ সাক্ষাৎ করতে চাইলে আগে বিস্তারিত লিখে সব ঠিক করে নিতে হত। কোনো সন্দেহ নেই, এভাবে নিয়ম-কানুনের পাবন্দির মাধ্যমেই পরস্পরের হকের প্রতি লক্ষ রাখা যায় এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা যায়।

সাক্ষাতের জন্য পূর্ব অনুমতির একটা বড় ফায়েদা এই যে, এতে দ্বিতীয় পক্ষ মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ও মনোযোগ সহকারে কাজটি সম্পন্ন হয়। পূর্ব অনুমতি না থাকলে যা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না।

আরেকটি বড় ফায়েদা এই যে, আগে থেকেই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জানা যায়। ফলে সাক্ষাতে এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে কি না তাও বোঝা যায়। অনেক সময় দেখা যায়, নিছক অনুমান করে বা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কারো সম্পর্কে ধারণা করি যে, তার দ্বারা আমার অমুক কাজটি হতে পারে বা অমুক কাজে

সহযোগিতা হতে পারে। এই অনুমানের ভিত্তিতেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলে যাই অথচ এমনও হতে পারে, এ কাজ আদৌ তার দ্বারা সম্পন্ন হবে না। পূর্ব যোগাযোগ হলেই তা জানা যেত এবং সাক্ষাতের কষ্ট পোহাতে হত না এবং উভয়ের সময় বেঁচে যেত।

এ বিষয়ে উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের নীতি তাঁরই কলমে পাঠকের সামনে পেশ করা ফায়েদাজনক মনে করছি। তিনি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে লিখে রেখেছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অধমের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি কষ্ট করে যে সাক্ষাতের সুযোগ দান করেছেন এজন্য আপনার শোকর আদায় করি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে উভয় জাহানের কল্যাণ দান করুন, আমীন। অবশ্য সাক্ষাতের আগে আমার কিছু আবেদন রয়েছে। যাতে আপনারও সময় নষ্ট না হয় এবং আমারও সময় নষ্ট না হয়।

১. তাবিয-তুমার, স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যা) ইত্যাদি আমার জানা নেই। সুতরাং এসব বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অধম এ ব্যাপারে একেবারেই অপারগ।

২. নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমি অভিজ্ঞতার পর ছেড়ে দিয়েছি। তাই দয়া করে এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করবেন না :

ক. চাঁদা সংগ্রহের জন্য কোনো মাদরাসা বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন।

খ. কোনো কিতাবের ওপর অভিমত লেখা।

গ. সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়া।

ঘ. উদ্বোধন, বিয়ের অনুষ্ঠান, সমাপনী অনুষ্ঠান, সাধারণ মাহফিল বা বার্ষিক মাহফিল ইত্যাদিতে উপস্থিত হওয়া। অবশ্য বিয়ে যদি দারুল উলূমে বা শুক্রবারে বাইতুল মোকাররমে হয়, তাহলে আমি খেদমতের জন্য প্রস্তুত।

৩. নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমার স্বভাব ও নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অক্ষমও বটে। অনেক সময় তা অসহনীয় বলে মনে হয়। অনুগ্রহ করে এ দায়িত্ব আমার ওপর না চাপালে কৃতজ্ঞ হব :

ক. প্রশাসনের কারো কাছে সুপারিশ করা।

খ. কারো কাছে চাঁদার জন্য সুপারিশ করা।

৪. ফতোয়া সংগ্রহ বা মাসআলা জানার জন্য আমাদের এখানে স্বতন্ত্র ফতোয়া

বিভাগ আছে, যা আমাদেরই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তাই দয়া করে এ বিষয়ে ফতোয়া বিভাগের শরণাপন্ন হোন। কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে সম্মানিত দায়িত্বশীলরাই অধমের সঙ্গে পরামর্শ করেন। –বান্দা তাকী উসমানী

সুতরাং কারো সঙ্গে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতে হলে এটাও জেনে নেওয়া উচিত, এ কাজ তার নীতি ও মানসিকতার পরিপন্থী কি না। কেউ কেউ এতে অসন্তুষ্ট হয় অথচ এতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কিছুই নেই। ব্যস্ত মানুষকে তো দ্বীনী ও সামাজিক প্রয়োজনেই এমন নিয়ম-নীতির পাবন্দি করতে হয়। আর শরীয়ত জায়েয বিষয়ে মানুষকে এখতিয়ার দিয়েছে, সে অবস্থা ও সময়ের প্রেক্ষিতে নিজের কাজকর্মের রুটিন তৈরি করে নেবে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তা পালন করবে।

'নুকূশে রফতেগা'-এ মাওলানা তাকী উসমানী হযরত মুফতী ওলী হাসান রহ. (১৪১৫ হি.) সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন–

'হযরত মুফতী সাহেবের অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতার কারণে সব সময় আমার এই তামান্না হত, তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ যদি রচনার কাজে ব্যয় হত, এতে তাঁর ইলম ও পাণ্ডিত্য দ্বারা আরো অনেক মানুষ দীর্ঘদিন উপকৃত হতে পারত। আমি অনেকবার হযরতের কাছে ফাতহুল মুলহিম-এর 'তাকমিলা' লেখার অনুরোধ করেছি এবং হযরত ইউসুফ বানূরী রহ.-এর ইন্তেকালের পর 'মাআরিফুস সুনান'-এর 'তাকমিলা' লেখার অনুরোধ করেছি। এ দুটি কাজের জন্য তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মুফতী সাহেবের স্বভাবগত সরলতা এবং ভদ্রতা ও নম্রতা অনেকটা এমন ছিল যে, তাঁর অধিকাংশ সময়ই সাময়িক প্রয়োজন পূরণে এবং আবেদনকারীদের মন রক্ষায় ব্যয় হয়ে যেত।

আফসোসের বিষয় এই যে, আমাদের সমাজে এই পরিবেশ নেই, প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে তার স্বভাব ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ ব্যবহার হবে। রসম ও গতানুগতিকতার পেছনে অনেক সময় নষ্ট করা হয়। হযরত মুফতী সাহেব একজন ইলমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কখনো সাংগঠনিক লোক ছিলেন না। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে কিংবা যোগ্যতার অবমূল্যায়ন বলুন, তাঁর মূল্যবান সময়ের অনেক বড় অংশ এসব কাজেও খরচ হয়েছে। বিয়ে, উদ্বোধন, সভাপতিত্ব ইত্যাদির মতো রেওয়াজি কাজেও তাঁর সময় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়ন, গভীর পাণ্ডিত্য ও ইলমের ফসলকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করার দিকে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। এজন্য যেসব কাজে শুধু

তাঁর প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত সেসব কাজ অপূর্ণই থেকে গেছে।' –নুকূশে রাফতেগাঁ ৩৮০-৩৮১

আলোচিত বয়ানের দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তা হল ফোন (বিশেষত যখন মোবাইলে হয়) উপযুক্ত সময়ে করা। কেউ যদি তার ব্যস্ততার কারণে ফোনের জন্য সময় নির্ধারিত করে, তাহলে তার প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি। এজন্য নিয়ম হল, কারো ফোন নম্বর নেওয়ার সময়ই ফোন করার সময় জেনে নেওয়া। নামাযের জামাতের সময়, আরামের সময়, পানাহারের সময়, যিকির-আযকার, ওযিফা ইত্যাদি আদায়ের সময় কাউকে ফোন করা ঠিক নয়। একান্ত প্রয়োজন বা ওজরের কথা ভিন্ন। মসজিদে জামাত চলাকালীন যারা ফোন করে তাদের ব্যাপারে কী সুধারণা সৃষ্টি হয়? আর এটা কি শুধু এজন্যই নয় যে, ফোন করার আগে ভাবা হয় না, এটা ফোনের উপযোগী সময় কি না।

আমাদের মধ্যে শত শত লোক এমন আছেন, যারা শুধু নিজের প্রয়োজন ও সুবিধার কথাই ভাবেন, অন্যের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করেন না। অনেকে ফোন করার জন্য ওই সময়ের অপেক্ষা করে, যখন টাকা সবচেয়ে কম খরচ হবে। এটা চিন্তা করে না যে, যাকে ফোন করা হচ্ছে তার জন্যও এ সময়টা উপযোগী কি না। আমার জানা আছে যে, এটা তার ওযিফা আদায়ের সময় বা আরামের সময়। তবুও শুধু পয়সা বাঁচানোর জন্য ওই সময় ফোন করা কীভাবে সমীচীন হতে পারে?

কারো কারো মুখে শোনা যায়, মোবাইল খোলা থাকার অর্থই হল এখন ফোন করতে অসুবিধা নেই, কিন্তু এই ব্যাখ্যা এজন্য ঠিক নয় যে, মানুষ কখনো কখনো মোবাইল বন্ধ করতে ভুলে যায়। কখনো বিশেষ কোনো প্রয়োজনে মোবাইল খোলা রাখে। আবার কখনো ভদ্রতার কারণে কিংবা কোনো প্রয়োজনীয় ফোন আসতে পারে এজন্য খোলা রাখে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্র আচরণই করা চাই। তাদের ভদ্রতার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয়।

সবশেষে এ কথাও বলে দেওয়া উচিত মনে করছি যে, অবস্থার প্রেক্ষিতে কেউ যদি সময়ের রুটিন বানিয়ে নেয়, তবে তা তাকাব্বুরির অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা হক আদায়ে যত্নশীলতা এবং সময়ের গুরুত্বের পরিচায়ক। তেমনি কারো সঙ্গে মেলামেশার সময় তার নীতি ও নেজামের প্রতি লক্ষ রাখার মধ্যেও অপমানের কিছু নেই; বরং তা ভদ্রতা ও শরাফতের প্রমাণ বহন করে।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, অন্যের সঙ্গে মেলামেশার সময় তার নেজাম ও

নীতি কঠিনভাবে পালন করা চাই। আর নিজের সঙ্গে কেউ অনিয়ম করলে যথাসম্ভব ধৈর্যধারণ করা চাই। আদব ও ভদ্রতার সঙ্গে নিজের নেজামের কথা বলে দিতেও কোনো অসুবিধা নেই; বরং এটিই উত্তম। কেউ কেউ নেজামের কথা বলতে লজ্জাবোধ করে। স্বভাবজাত লজ্জার ওপর যুক্তি ও ইনসাফের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেওয়া চাই। এমনিভাবে নেজামের কথা বলে দিলে কেউ কেউ এটাকে তার জন্য মর্যাদাহানিকর বলে মনে করে অথচ এতে অমর্যাদার কিছুই নেই; এটা উভয় পক্ষের হকের প্রতি লক্ষ রাখারই শামিল।#

[জানুয়ারি '০৯ ঈ.]

এই সুন্নতটি জিন্দা করুন : মুসাফাহার দুআর ব্যাপারে যত্নবান হোন

গত হজের মৌসুমে ১৪২৯ হি. যিলহজ মাসের কোনো একদিন মসজিদে হারামে বাইতে উম্মে হানীর কাছে হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া জাহাঙ্গীর সাহেব বলেন, 'আলকাউসারের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনোভাবে এই গলত রসম সম্পর্কে আমাদের ভাইদেরকে একটু সচেতন করবেন। এখন ব্যাপকভাবে দেখা যায়, মুসাফাহার সময় দুআ পড়া হয় না। শুধু কুশল বিনিময় করা হয়। 'কেমন আছেন'ই যেন আমাদের মুসাফাহার দুআ! অথচ অন্যান্য সৌজন্য-মূলক কথাবার্তা তো দুআর পরেও হতে পারে।'

আমি পাঠকের কাছে তার পয়গাম পৌঁছে দিচ্ছি আমানত আদায়ের জন্য।

হাদীস শরীফে এসেছে–

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا.

'যখন দুইজন মুসলিমের সাক্ষাৎ হয় এবং তারা পরস্পরে মুসাফাহা করে, আল্লাহ তাআলার হামদ ও শোকর করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফেরাত কামনা করে তো আল্লাহ তাআলা উভয়কে মাগফেরাত দান করেন।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৬৯

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا، وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا.

'যখনই দুজন মুসলিমের সাক্ষাৎ হয় এবং তারা পরস্পর হাত মেলায় তো আল্লাহ তাআলার ওপর তাদের এই হক জন্মে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের দুআ কবুল করবেন এবং তাদের হাতগুলো পৃথক হওয়ার আগেই তাদের ক্ষমা করে দেবেন।' –মুসনাদে আহমদ ৩/১৪২, হাদীস ১২৪৫১

উপরিউক্ত হাদীসগুলোর কারণে আমাদের বুযুর্গগণ মুসাফাহার সময়

পরস্পরের জন্য মাগফেরাতের দুআ করেন, যা উভয় মুসাফাহাকারীই বলে থাকেন। এই দুআর জন্য প্রসিদ্ধ আরবী বাক্যটি খুবই উপযুক্ত–

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন।

এতে 'আলহামদু লিল্লাহ' যোগ করে এভাবেও বলা যায়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ.

অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন।

এটা কত ভালো বিষয় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ প্রথমে শান্তি ও সালামতী এরপর ক্ষমা ও মাগফেরাতের দুআর দ্বারা হবে। ঈমানের পরে সুস্থতা ও নিরাপত্তা এবং মাগফেরাত ও পবিত্রতার চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত আর আছে কি?

মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, এর প্রকৃত প্রেরণা তো আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা এবং সালাম ও মাগফেরাত কামনাই হওয়া উচিত।

সাঈদ আলমাকবুরী রহ. থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন–

إِنِّيْ كُنْتُ لَأَخْرُجُ إِلَى السُّوْقِ وَمَا لِيْ حَاجَةٌ إِلَّا أَنْ أُسَلِّمَ، وَيُسَلَّمَ عَلَيَّ.

'আমি (অনেক সময়) বাজারে যাই। তবে এজন্য নয় যে, সেখানে আমার কোনো প্রয়োজন রয়েছে; বরং এজন্য যাই যে (সেখানে অনেক মানুষের সমাবেশ, তাই অনেক মানুষকে সালাম করার সুযোগ হবে) আমি তাদেরকে সালাম দেব এবং উত্তরে তাদের সালাম লাভ করব।'

বুশাইর ইবনে ইয়াসার বলেন–

مَا كَانَ أَحَدٌ يَبْدَأُ أَوْ يَبْدُرُ ابْنَ عُمَرَ بِالسَّلَامِ.

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-কে কেউ আগে সালাম দিতে পারত না।' –আততবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ ৪/১৫৫, ১৫২

ওমর রা. এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন–

كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا فُلَانُ؟

অর্থাৎ কেমন আছ? তিনি বলেন–

أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ.

'আমি আপনার কাছে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি।' –হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুয়াইম ৭/৩০

ইমাম ইবনুল মুবারক রহ. থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন–

إِنْ كُنَّا لَعَلَّنَا أَنْ نَلْتَقِيَ فِي الْيَوْمِ مِرَارًا يَسْأَلُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، وَأَنْ نَقْرُبَ ذٰلِكَ إِلَّا لِنَحْمَدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

'আমরা কখনো একে অপরের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করি এবং কুশল বিনিময় করি, শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, এভাবে পরস্পরে আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা করব।' –আয্যুহ্দ ওয়ার-রাকাইক ৬৮-৬৯

সালাফে সালেহীনের মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে উঠেছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুকরণে।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন– কেমন আছ? তিনি বলেন–

أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার কাছে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি।'

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমার কাছে আমি এটাই চেয়েছি। (অর্থাৎ আমার প্রশ্নের উত্তরে তুমি আল্লাহর হামদ ও সানা করবে এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল)। –তবারানী–মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৪০, ৮/৪৬

সারকথা এই যে, মুসলমানদের কোনো সাক্ষাৎ সালাম, দুআয়ে মাগফেরাত ও হামদ ও সানাবিহীন না হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন, আমীন। #

[ফেব্রুয়ারি '০৯ ঈ.]

অনর্থক আলোচনা-মন্তব্য রেখে ইসলাহ ও দুআর প্রতি মনোযোগী হই

আমাদের দেশের পরিস্থিতি তো হরহামেশাই খারাপ থাকে। যে দেশে আল্লাহর বিধান কার্যকর নয়, যে দেশে আল্লাহর বিধান তো মানা হয়-ই না, উল্টো আল্লাহর বিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয় এবং একেই উন্নতি-উৎকর্ষের সোপান মনে করা হয়, সে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কখনোই 'ভালো' থাকা সম্ভব না। কিন্তু তা অনুভব করা হয় বলে মনে হয় না। সাধারণত যা মনে করা হয় এবং কার্যত যা দেখা যায় তা হল, জনগণের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু যখন ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়ে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে এবং দিন দিন তা বাড়তেই থাকে, তখন বলতে দেখা যায়, 'দেশের পরিস্থিতি ক্রম অবনতিশীল'!! কিন্তু তখনো পরিস্থিতি বদলের বস্তুনিষ্ঠ কোনো তৎপরতা থাকে না। শুধু পরিস্থিতি সম্পর্কে অযথা মন্তব্য আর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে যাওয়া হয়। আর মন্তব্য করার ক্ষেত্রেও কোনো বিচার-বিবেচনা থাকে না। আমানতদারি বা ইনসাফের তোয়াক্কা করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর ভিত্তি হয় স্থূল ভাবনা, খেয়ানত আর না-হক পক্ষপাত। সরকার বদলের সময়ে পত্র-পত্রিকাগুলো যদি তুলনা করে পড়া হয়, দেখা হয় যে বিগত টার্মে এই সময়ে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে এই পত্রিকা কী মন্তব্য করেছিল, আর এখন ঠিক সে রকম পরিস্থিতিতেই সেই পত্রিকা কী মন্তব্য করছে, তাহলে অবাক হয়ে যেতে হয়, একই পত্রিকার দুই মূল্যায়নে এত ফারাক হয় কী করে?

মন্তব্য প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রবণতা আমাদের মাঝে বেশ ব্যাপক। ঘরোয়া বৈঠক, সভা-সম্মেলন, সংবাদ মাধ্যম ইত্যাদি সব জায়গায়-ই লাগামহীনভাবে এর চর্চা হয়। এই মন্তব্য-প্রতিক্রিয়াগুলোতে বাস্তবতা থাকে কতটুকু? আর নিছক 'মন্তব্যের জন্য মন্তব্যের' দরকারই-বা কী? সর্বোপরি এগুলো কি শুধুই মন্তব্য নাকি তার বেশিরভাগ জুড়েই থাকে অন্যায় ধারণা, গীবত, পরনিন্দা আর রুচিবিরুদ্ধ গালাগালি? এগুলো নিয়ে না হয় এখন আলোচনা না-ই করলাম। এগুলোর আলোচনায় না গিয়ে এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে বলতে চাচ্ছি সেটা হল, এ ধরনের সঙ্কটমুহূর্তে আমরা একটি বড়

বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে যাই। একটি ধ্রুব সত্যকে বেমালুম ভুলে যাই। সেটা হল, **'এই প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ খোদ আমাদেরই বদআমল।'**

আমরা প্রত্যেকে যদি ভাবতাম, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে হয়ত আমার বদআমলেরও প্রভাব আছে। আমরা গোটা জাতি যদি এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিতাম যে, এই বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার মৌলিক কারণ খোদ এই জাতিরই বদআমল। তাহলে অন্তত অনর্থক আলোচনা-মন্তব্যে সময় নষ্ট না করে সবাই নিজের ইসলাহের ফিকির করতাম। তওবা-ইস্তেগফারের ইহতেমাম করতাম। দুআ-মুনাজাতে রত থাকতাম। সমাজের প্রত্যেকটা লোক তখন ভাবত, আমি তো এই সমাজেরই একজন। হতে পারে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে আমার বদআমলেরও প্রভাব আছে। আমি নিজেকে সংশোধন করব। অন্তত পক্ষে নিজের ওপর তো আমার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আছে। আমি নিজেকে বদলে ফেলব। আমি গোনাহ থেকে বাঁচার দৃঢ় সংকল্প করব। আমি যথাসম্ভব আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকব। এর জন্য আমি আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফীক প্রার্থনা করব।

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۝۴۱

'মানুষ নিজ হাতে যা কামায়, তার ফলে স্থলে ও জলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন; হয়ত (এর ফলে) তারা ফিরে আসবে।' –সূরা রূম (৩০) : ৪১

মানুষের মন্দ কর্মের কারণে কী ধরনের ফাসাদ দেখা দেয়, এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কত ধরনের শাস্তি দেওয়া হয় তাও বলা হয়েছে কুরআন কারীমে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰۤى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ۝۶۵

'বল, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সক্ষম যে, তোমাদের প্রতি শাস্তি পাঠাবেন তোমাদের ওপর দিক থেকে অথবা পদতল থেকে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একদলকে অন্যদলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। দেখ,

আমি কীভাবে বিভিন্ন পন্থায় আপন নিদর্শনাবলি বিবৃত করছি, যাতে তারা বুঝতে সক্ষম হয়।' –সূরা আনআম (৬) : ৬৫

এখন গোটা উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড় আযাব তো এই-ই যে, নানা ক্ষেত্রে শুধু পক্ষসমর্থনের কারণে আজ তারা বিভেদ-বিচ্ছেদের শিকার। কোথাও তাদের ওপর শত্রুদের চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোথাও তারা নিজেদের হাতেই মার খাচ্ছে। সূরা আনআমের একটি আয়াতে এও ইরশাদ হয়েছে–

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۝

'এভাবেই আমি জালেমদের কতককে কতকের ওপর তাদের কৃতকর্মের কারণে আধিপত্য দান করে থাকি।' –সূরা আনআম (৬) : ১২৯

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর উস্তায, প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইমাম সুলাইমান আ'মাশ রহ.-কে মানসুর ইবনে আবিল আসওয়াদ জিজ্ঞেস করেছিল, উক্ত আয়াত সম্পর্কে তিনি তাঁর বড়দের কাছ থেকে কিছু শুনেছেন কি না। তিনি বললেন–

سَمِعْتُهُمْ يَقُوْلُوْنَ: إِذَا فَسَدَ النَّاسُ أُمِّرَ عَلَيْهِمْ شِرَارُهُمْ.

'আমি তাঁদের বলতে শুনেছি, যখন মানুষ খারাপ হয়ে যাবে তখন তাদের মন্দ লোকদের হাতে শাসনভার অর্পণ করা হবে।' –হিল্য়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইম ইস্পাহানী ৫/৫০-৫১, দারুল ফিকির, বৈরুত (ইমাম আ'মাশের জীবনী); আদ-দুররুল মানসুর ৬/২০৩, আবুশ শায়েখ ইস্পাহানী-এর বরাতে (তাহকীক : আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুহসিন আত-তুরকী)

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির কল্যাণ চান তখন নেককার ও সমঝদার লোকদের হাতে শাসনভার প্রদান করেন, দানশীল লোকদেরকে ধন-সম্পদ দান করেন। আর যখন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতে চান, তখন বদকার ও বদমেজাজি লোকদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করেন, কৃপণ লোকদের ধন-সম্পদ দান করেন।

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمُ الْحُلَمَاءَ، وَجَعَلَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ أَيْدِي السُّمَحَاءِ. وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ بَلَاءً اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمُ السُّفَهَاءَ، وَجَعَلَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ أَيْدِي الْبُخَلَاءِ.

–কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, বর্ণনা ১৬

কোনো জাতির জন্য কল্যাণের ফয়সালা তো আল্লাহ তাআলা তখনই করেন যখন তারা দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। দ্বীনের মৌলিক ও নিদর্শন-শ্রেণির বিধানাবলির সম্মান করে। আল্লাহর বিধান-বিরুদ্ধ কোনো ফয়সালা না করে। আর পরিস্থিতি বদলের ইলাহী সুন্নত তো কুরআন কারীমে সূরা রা'দে (১৩ : ১১) আল্লাহ তাআলা বলেছেন। যার সারকথা হল, কোনো কারণ ছাড়া এমনি এমনি আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা বিগড়ে দেন না। যখন তারা আল্লাহর নাফরমানি করা শুরু করে এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তখন শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থা পাল্টে দেন।

যদি আমরা অনুকূল পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে চাই তো তার পথ ও পন্থা একটিই। আর তা হল, নাফরমানি ত্যাগ করে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করা। হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্য বাদ দিয়ে আল্লাহর দাসত্ব ও তাঁর ইবাদতের পথ অবলম্বন করা।

এখন আমাদের সবার কর্তব্য, অনর্থক আলোচনা-মন্তব্য, নিন্দা-অভিশাপ, গীবত-দোষচর্চা, গালিগালাজ ইত্যাদি বাদ দিয়ে নিজের আমল সংশোধনে মনোযোগী হওয়া। সব ধরনের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। বিশেষ করে সুদ, ঘুষ, জুয়া, আমানতের খেয়ানত, লেনদেনে ধোঁকাবাজি, ওজনে কম দেওয়া, যাকাত প্রদান না করা, অন্যের হক মেরে খাওয়া, আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখা, আল্লাহর বান্দাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর ওপর হামলা করা, আল্লাহর বিধান-বিরোধী ফয়সালা করা কিংবা আল্লাহর বিধান-বিরুদ্ধ আইন প্রণয়ন করা, ওয়াদা খেলাফ করা, চুক্তি ভঙ্গ করা, মিথ্যা বলা, ধোঁকাবাজি ও ষড়যন্ত্র করা, সব ধরনের অশ্লীলতা ইত্যাদি অনৈতিক কাজ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা। এগুলো এমন ধ্বংসাত্মক ব্যাধি যা সমাজের স্থিতি নষ্ট করে দেয়। এককভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবার কর্তব্য, এ ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করা।

আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি মানুষ খুন হওয়ার পর প্রত্যেক দল অন্য দলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেকে 'দোষমুক্ত' ভেবে নিলেই আমরা অন্যায় খুনের 'অভিশাপ' থেকে নিস্তার পেয়ে যাব না। আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখছেন, শুনছেন। তিনি গায়েব জানেন। দিলের খবরও জানেন। আল্লাহ তাআলার কাছে গোটা পৃথিবীর চেয়েও একজন মানুষের জানের মূল্য বেশি। শুধু একটি অন্যায় খুনের অপরাধে তিনি গোটা পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে

পারেন। তাঁর আদালতে একটি অন্যায় খুনের অপরাধ এর চেয়েও জঘন্য। জুলুম করে মানুষের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে কেউ যদি ভাবতে থাকে, সে আল্লাহর কাছ থেকেও রেহাই পেয়ে গেছে, তাহলে সে ভুল ধারণার সাগরে ডুবে আছে। জালেম কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র জাতির কর্তব্য, খালেস দিলে আল্লাহর কাছে তওবা করা। যদি তা না হল, তো অন্তত যার দিলে ঈমান আছে এবং আখেরাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ভয় আছে, তার উচিত এককভাবে হলেও আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা-ইস্তেগফার করা, নিজের নফস ও আমল সংশোধনের চেষ্টা করা। বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়া, কুরআন শেখা, কুরআন পড়া শুদ্ধ করা, কুরআন তেলাওয়াতের ইহতেমাম করা। অর্থের দিকে লক্ষ করে মনোযোগের সঙ্গে নিম্নোক্ত দুআগুলো বেশি বেশি পড়া–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

মানুষের মধ্যে দ্বীন শেখার আগ্রহ, কুরআন শেখার আগ্রহ, উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়ার আগ্রহ তৈরির জন্যও মেহনত করা উচিত।

হে আল্লাহ! হে রাহমান! হে গাফফার! হে কারীম! তুমি আমাদের রহম কর। তোমার রহমতই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। তুমিই দয়া কর। তোমার দয়াই আমাদের শেষ ঠিকানা।#

[জানুয়ারি ২০১৪ ঈ.]

ইসলাহ ও মুহাসাবার মৌলিক বিষয় থেকে উদাসীন না হই 'যিকির ও ফিকির' কিতাবটির রাহনুমায়ি গ্রহণ করি

ফরযে আইন আমলসমূহের অন্যতম হল মুহাসাবা বা বলা যায়, নিজের ইসলাহের ফিকির করা। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٍۖ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ۝١٨

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।' –সূরা হাশর (৫৯) : ১৮

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۝٣٧ وَءَاثَرَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ۝٣٨ فَإِنَّ ٱلۡجَحِيمَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ۝٣٩ وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ۝٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ۝٤١

'অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে আপন প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাস।' –সূরা নাযিয়াত (৭৯) : ৩৭-৪১

মুহাসাবা এটার নাম। ইসলাহের ফিকির এটার নাম। এই কাজটা ফরযে আইন। কিন্তু এই কাজের এবং এই ইসলাহের তারতীব কী হবে তা আলোচনার দাবি রাখে।

মুহাসাবা যখন আমি করব, দেখব– আমার মাঝে অনেক ত্রুটি। বর্জনীয় অনেক কিছুতে আমি লিপ্ত এবং করণীয় অনেক কিছু আমার মধ্যে নেই। এখন ইসলাহ তো আমার করতে হবে। যে করণীয়গুলো আমার মধ্যে নেই সেগুলো আনতে হবে। বর্জনীয় যেগুলো আমার মধ্যে আছে সেগুলো ছাড়তে হবে। কিন্তু সবকিছু সাধারণত একসঙ্গে করা যায় না। সকল করণীয় একসঙ্গে অর্জন করা যায় না। আবার সকল বর্জনীয়ও একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এটা একটা বাস্তবতা। আল্লাহ তাআলাও এই বাস্তবতা এবং বান্দার এই কমজোরির কথা জানেন। সেজন্য আল্লাহর দেওয়া শরীয়তে এক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করা

হয়েছে। তাই যদি ফিকির থাকে, ইসলাহের চেষ্টা-মেহনত অব্যাহত থাকে তাহলে সেটাকে খুবই মূল্যায়নের নজরে দেখা হয়। কিন্তু যদি কেউ গাফেল হয়ে বসে থাকে– কোনো ফিকির নেই, কোনো চেষ্টা নেই, তাহলে সেটা একজন মুমিনের জন্য বড় ভয়াবহ।

তো যাহোক, এর তারতীবটা এমন– যার কাছে যেটা সহজ সেটা সে আগে গ্রহণ করবে। ছোট ও সহজ দিয়ে ইসলাহ শুরু করা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়। তবে ইসলাহের ফিকিরটা সেখানে গিয়ে থেমে যাওয়া আপত্তিকর। সুন্নতি জামা, টুপি, এমনকি পাগড়িও সে গ্রহণ করল। যাহেরি দিকটাকে সে আগে সুন্দর করে নিল এটা ভালো। এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এটুকুতেই ইসলাহকে সীমাবদ্ধ রাখা নিন্দনীয়। কারো কথায় ও কাজে এমন ভাব প্রকাশ পাওয়া যে, লেবাস-পোশাক ঠিক করে ফেলার মধ্যেই তার সকল দায়িত্ব শেষ অথবা এতেই তার ইসলাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে, সেটা খুবই খতরনাক ও ভয়ানক। স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, আশপাশের মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, এগুলোর জন্য তার কোনো ফিকির নেই। লেনদেনের স্বচ্ছতা নিয়ে চিন্তা নেই, সেটা হল আপত্তিকর।

যখনই দ্বীনের তলব তার মধ্যে পয়দা হয়েছে, নামায ধরেছে, এখন আর তার নামায কাযা হয় না। খুব ভালো। বড় একটা ফরয তার আমলে এসে গেছে। এরপর আরো তারাক্কি করেছে। ফলে দাড়িও এসে গেছে, পাগড়িও এসে গেছে। অবশ্যই ভালো। কিন্তু এরপর যদি সে থেমে যায়, তাহলে সেই থেমে যাওয়াটা আপত্তিকর। কারণ শরীয়তের আহকামের অনেক স্তর। এক তো হল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ইত্যাদি। এরপর এই প্রত্যেক স্তরের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তর। গোনাহ ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলির ক্ষেত্রেও এ রকম স্তরভেদ রয়েছে। শরীয়তের আহকাম ও বিধিনিষেধের এই তারতীব ও স্তরভেদ একজন মুমিনের জানা থাকা জরুরি। ফরযের মধ্যে কোনটা বড় ফরয, কবীরা গোনাহের মধ্যে কোনটা বড় কবীরা, এসব তার কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে। নতুবা দেখা যাবে, যাহেরি কিছু আমল গ্রহণ করে, কিছু ইবাদত-বন্দেগি করে, কিছু গোনাহ ছেড়ে দিয়ে সে ভাবছে– তার ইসলাহ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন সে যতই মুহাসাবা করে– দেখে, সে ঠিক আছে। তার মানে হল, ইসলামী তালীমাতের সঠিক ধারণা তার নেই। ইসলামী শিক্ষাগুলোর পরিপূর্ণ ধারণা, স্পষ্ট ধারণা, নির্ভুল ধারণা তার নেই। যদি থাকত তাহলে এই তারতীব, আহকামের এই পর্যায়ক্রম সে শিখত এবং সেই হিসেবে ইসলাহের ফিকির

করত। মাপে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, দুর্নীতি করা–এজাতীয় ভয়াবহ কবীরা গোনাহ, যেগুলো ঈমানের দাবি পরিপন্থী–সেগুলো থেকে সে বেঁচে থাকত।

এজন্য মুহাসাবার সময় নিজেকে এভাবে প্রস্তুত করতে হবে যে, আমি আমার নফল আমলের তুলনায় ফরযের দিকে তাকাব বেশি। নফল যেসব আমল আমার মধ্যে এসেছে সেগুলোর জন্য আলহামদু লিল্লাহ; আল্লাহর শোকর আদায় করব। তবে সেজন্যে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যাবে না। আমার মুহাসাবার মধ্যে প্রথমেই লক্ষ করতে হবে যে, আমার ফরয-ওয়াজিব কোনো আমল একেবারে ছুটে যাচ্ছে কি না। ফরয-ওয়াজিবের ব্যাপারে উদাসীন অথচ নফলের ক্ষেত্রে উৎসাহী এমন যেন না হয়। হারাম হয়ে যাচ্ছে, কবীরা গোনাহ হয়ে যাচ্ছে কোনো পরোয়া নেই অথচ কোনো একটি নফল নিয়ে খুব পেরেশান। এটা কেমন কথা?

একজন এক অদ্ভুত ঘটনা শুনিয়েছিল। এক লোক নাকি শরাব পান করে, কিন্তু এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকে যেন মোচে সেই শরাব না লাগে। সব সময়ই এ বিষয়ে তার চূড়ান্ত সতর্কতা। একদিন তার খাদেম সাহস করে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, পানীয় বস্তু মোচে লাগিয়ে পান করা আদব পরিপন্থী। অর্থাৎ যা পান করছে তার বৈধতা-অবৈধতা আলোচনার বিষয় নয়! পান করার ক্ষেত্রে আদব রক্ষা হচ্ছে কি না সেটা আলোচনার বিষয়।

তো নফলের ব্যাপারে উৎসাহী হওয়া দোষ না, কিন্তু একদিকে ফরয-ওয়াজিবের ব্যাপারে উদাসীনতা আর অন্যদিকে নফলের ব্যাপারে আগ্রহ-উৎসাহ, এটা শয়তানের ধোঁকা। এমনিভাবে একদিকে কবীরা গোনাহ হয়ে যাচ্ছে, ইসলাহের কোনো ফিকির নেই, অন্যদিকে উত্তম-অনুত্তম নিয়ে চূড়ান্ত পেরেশানি! এটা খেয়াল করার বিষয়।

মোটকথা, ইসলাহ ও মুহাসাবার ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করা জরুরি। যদিও বাস্তব ইসলাহের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায়ই তারতীবের অপেক্ষায় বসে থাকা জরুরি নয়; বরং যখন যেটা আমলে আনার সুযোগ হয় সেটা নিয়ে আসা এবং যখন যেটা ছেড়ে দেওয়ার বিষয় ছেড়ে দেওয়া, যেটা সহজ হয় সেটা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। ইসলাহের বাস্তব যে তারতীব তাতে প্রাথমিক অবস্থায় একথা বলা হয় না যে, সকল ফরয যতক্ষণ পর্যন্ত আমলে না আসে ততক্ষণ কোনো নফলের তামরীন করা যাবে না বা সকল কবীরা গোনাহ ছেড়ে দেওয়ার আগে সগীরা গোনাহ ছাড়ার পেছনে পড়া যাবে না; বরং আমি নেকির রাস্তায় অগ্রসর

হতে থাকব এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার মশক করে যেতে থাকব। যখন যেই করণীয় সহজ ও সম্ভব হবে সেটা করতে থাকব এবং যখন যে গোনাহ ছেড়ে দেওয়া সহজ ও সম্ভব হবে সেটা ছেড়ে দেওয়ার প্রতি যত্নশীল হব। এটা হল আমলের তারতীব। কিন্তু ফিকির ও মুহাসাবার তারতীব এটা না। ফিকির হবে এমন যে, আমার তো এখনো অনেক ফরয বিধান আমলে আসেনি। যেমন, পর্দা একটি ফরয বিধান। আমি আমার বাড়িতে সেই বিধান যথাযথ পালন করতে পারি না। এমনিভাবে অনেক কবীরা গোনাহ এখনো আমি ছাড়তে পারিনি! এভাবে ফিকিরকে সজাগ রাখতে হবে এবং ধীরে ধীরে হলেও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ মুহাসাবাও জারি রাখতে হবে। আর সেটাই মুমিনের কর্তব্য। যাহেরের ইসলাহ করে বাতেন থেকে বেখবর হওয়া, নফলের ইসলাহ করে ফরয থেকে বেখবর হওয়া, এমনিভাবে অনুত্তম ও মাকরূহের ইসলাহ করে হারাম ও কবীরা গোনাহ থেকে বেখবর হওয়া মুমিনের শান নয়।

ইবাদতের ইসলাহ করলাম, কিন্তু আকীদা থেকে বেখবর অথবা আকীদার ইসলাহ করলাম, কিন্তু ইবাদতের কোনো খবর নেই; ইবাদতের খবর আছে কিন্তু বেদআতওয়ালা ইবাদত; অন্যের ইসলাহের ফিকির করি, কিন্তু নিজের ইসলাহের ফিকির নেই; উম্মতের ইসলাহের ফিকির আছে, কিন্তু আওলাদের ইসলাহের ফিকির নেই, এমন হলে হবে না।

বিশেষ করে যে চারটা সিফাতের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন−

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

'চারটি গুণ এতই মূল্যবান, তা যদি তোমার মধ্যে থাকে তাহলে দুনিয়ার আর কী তোমার নেই সে চিন্তারই দরকার নেই− ১. আমানত রক্ষা করা ২. সত্য কথা বলা ৩. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া ৪. রিযিক হালাল হওয়া।' −মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ৬৩৬৫

সব ধরনের মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আমানতের পথ অবলম্বন করতে হবে এবং সব ধরনের খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বদ আখলাকী থেকে বেঁচে থাকা এবং নেক আখলাকীর পথ অবলম্বন করা। লেনদেনের স্বচ্ছতা, আয়-উপার্জনে হালালের প্রতি খেয়াল রাখা এবং সব ধরনের হারাম

থেকে বেঁচে থাকা। নিজের ইসলাহের মুহাসাবার ক্ষেত্রে এই চারটা বড় ময়দান।

মুআশারার ইসলাহের ফিকির না করা, লেনদেনে স্বচ্ছতার ফিকির না করা, হারাম-পেশা, হারাম-চাকরি ছাড়ার ফিকির না করা, এমনকি সুদ, ঘুষ ও আত্মসাতের মতো ভয়াবহ কবীরা গোনাহসমূহ থেকে বাঁচার ফিকির না করা, বদ আখলাকী থেকে বাঁচার ফিকির না করা, কবীরা গোনাহ থেকে বাঁচার ফিকির না করা, ফরয-ওয়াজিবের ক্ষেত্রে যত্নবান না হওয়া, আকীদা বিশুদ্ধ করার ব্যাপারে যত্নবান না হওয়া, বেদআত-শিরক থেকে বাঁচার ফিকির না থাকা—এই সব হল গাফলত।

তাহাজ্জুদের ব্যাপারে খুব যত্নশীল, ভালো; কিন্তু সেখানেই থেমে থাকা এবং এসব বড় বড় বিষয়ের ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রকাশ পাওয়া খুব খারাপ। আর এই উদাসীনতাই প্রমাণ করে, তার মধ্যে ইসলামী তালীমাতের সঠিক ধারণা নেই।

কারো নফল ওমরা করার খুব আগ্রহ, কিন্তু ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে উদাসীন; সদকা-খয়রাতের খুব আগ্রহ, কিন্তু বোনের মিরাস দেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন—এটা কেমন ঈমানদারি?

হক্কানী কোনো পীরের কাছে গিয়ে ইসলাহের ফিকির পয়দা হয়েছে কিংবা চিল্লা লাগানোর মাধ্যমে ফিকির এসেছে অথবা হজ করার পর সচেতনতা তৈরি হয়েছে, এই ফিকির এই সচেতনতাকে ধরে রাখতে হবে। প্রথম ধাপে যেটুকু ইসলাহ হয়েছে তার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। বরং এই ফিকিরকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে যেতে হবে এবং কোন কোন ত্রুটি রয়ে গেছে সেগুলো চিহ্নিত করে ইসলাহের ফিকির করতে হবে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের কিতাব 'যিকির ও ফিকির' মূলত পাকিস্তানের দৈনিক 'জঙ্গ'-এর সাপ্তাহিক কলামের সংকলন। এতে হাদীসের ওই চার বিষয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবটি বারবার পড়া দরকার এবং মুহাসাবা ও বাস্তব ইসলাহের পদক্ষেপসহ আত্মস্থ করা দরকার। ৫৬টি শিরোনাম আছে। শুধু সূচিপত্রটা যদি পড়া হয়, তাহলেও দিল-দেমাগে অনেক চিন্তা-চৈতন্য সৃষ্টি হবে এবং ইসলাহের ক্ষেত্রে অনেক অবহেলিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়বে।

যাহোক, এই কিতাবটি সবার কাছে থাকা দরকার। 'ইসলাম ও আমাদের

জীবন' নামে এর বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবটি বারবার পড়া দরকার এবং আমলের নিয়তে ফিকিরগুলো অনুধাবন করা দরকার। এই কিতাব বা এই জাতীয় কিতাবের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনতে হবে। নিজেদের মাঝে এসব ফিকির ও ইসলাহী কথাগুলোর চর্চা হতে হবে এবং সাথী সঙ্গীদের সঙ্গে যখন বিভিন্ন বিষয়ে মুযাকারা হয় তখন এসব ফিকিরও আলোচনায় আসতে হবে।

দ্বীনী কিতাবগুলোর মধ্যে কিছু আছে যেগুলো সহজ ও নরম কথা বেশি বলে থাকে। আর কিছু আছে যেগুলো সরাসরি ইলাজ বা অপারেশনের ভূমিকা পালন করে। তো আমাদের জন্য দ্বিতীয় প্রকারের কিতাবগুলোই বেশি জরুরি।

ওয়ায়েজদের ক্ষেত্রেও বিষয়টা এমন। মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেসবাহ সাহেব রহ. বলতেন, আমার ওয়াজ কারো চোয়ালে লাগে। কারো পোশাকে লাগে। কারো আয়-উপার্জনে গিয়ে লাগে। তখন আর তার বরদাশত হয় না। তার কাছে সেই ওয়াজ পছন্দ হয় না। এখন কারো গায়ে লাগবে দেখে যদি ওয়াজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শুধুই এমন ওয়াজ করা হয় যেটা কারো গায়েই লাগবে না, তাহলে আর ওয়াজেরই প্রয়োজন কী?

আমি শুধু তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহর ওয়াজ করছি, ভালো। মসজিদে প্রবেশের সুন্নত, জুতা পায়ে দেওয়ার সুন্নত, জামা পরিধানের সুন্নত ইত্যাদি বলছি, ঠিক আছে; ভালো। কিন্তু সারা জীবনই কি আমি শুধু এই ওয়াজ করব? তাহলে জুতা-জামা হালাল পয়সার কি না, সেই ওয়াজ করবে কে? কেউ গোল জামার ওয়াজ শুনে তার খুব গুরুত্ব দিচ্ছে, এমনকি সেজন্যে লড়াই-ঝগড়াও করছে, কিন্তু জামা হালাল পয়সায় বানানোর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করছে না, সেটা কেমন?!

পাগড়ির ওয়াজে এক রাকাতে সত্তর রাকাতের সওয়াবের কথা শুনল। সেটা মওযূ রেওয়ায়েত শুনল নাকি গ্রহণযোগ্য কোনো রেওয়ায়েত শুনল, তার খবর নেই। এরপর সে আর পাগড়ি ছাড়ছে না; খুব ভালো। কিন্তু পাগড়ির শান রক্ষা করার ব্যাপারে তার কোনো গুরুত্ব নেই। পাগড়ি মুস্তাহাব। তবে তার শান রক্ষা করা ফরয। এখন মুস্তাহাব আমলের খুব যত্ন, কিন্তু ফরযের ব্যাপারে কোনোই গুরুত্ব নেই, সেটা কেমন কথা? এই যুগে পাগড়ি হল মুত্তাকী ও নেক হওয়ার সর্বোচ্চ আলামত। অতএব তার শান রক্ষা করা খুবই জরুরি। সেজন্যে পাগড়িওয়ালা কেউ কবীরা গোনাহ করলে একদিকে যেমন

কবীরা গোনাহ, অন্যদিকে পাগড়ির শান রক্ষা না করার গোনাহ। পাগড়িওয়ালা কেউ দুর্ব্যবহার করলে, রিক্সার ভাড়া কম দিলে, একজায়গায় নামার কথা বলে আরেকটু সামনে গিয়ে নামলে, সেটা হবে অনেক বড় অপরাধ। তো এসব বিষয়ে খুব খেয়াল রাখতে হবে।

'যিকির ও ফিকির' কিতাবে এজাতীয় ইসলাহের আলোচনাই হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসেবে কবুল করুন এবং আমাদের জীবনের সকল অঙ্গনে ঈমানের শান বজায় রেখে চলার তাওফীক দান করুন, আমীন; ইয়া রাব্বাল আলামীন। #

[মার্চ ২০১৪ ঈ.]

বয়ান

দ্বীনের সমঝ কাকে বলে?

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের অংশবিশেষ তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়েছে।' হিকমাহ যে পেয়েছে সে অনেক কল্যাণ পেয়েছে।

হিকমাহ শব্দের অনেক অর্থ আছে। কুরআন মাজীদেও বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি এসেছে। এই আয়াতে হিকমাহ-এর যে অর্থ তা হল দ্বীনের সমঝ। যে দ্বীন ইসলাম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন সেই ইসলামের সমঝ হল হিকমাহ বা হেকমত। মূল শব্দ হল الحكمة। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিতেন উম্মতকে, সাহাবায়ে কেরামকে। কোনো সময় আয়াত তেলাওয়াত করে তেলাওয়াত শেখাতেন। সঙ্গে সঙ্গে আয়াতের বিধানের ওপর আমল করে দেখাতেন। অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। আর অনেক সময় আয়াতের মর্মকে বিভিন্ন শব্দে ও বাক্যে বলতে থাকতেন। যাতে এই বিষয়টি তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। আত্মস্থ হয়ে যায়। এই আয়াতটিকেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসরূপে বারবার বলেছেন সাহাবায়ে কেরামকে।

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

'যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের সমঝ দান করেন।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের অনেক কিতাবে এই হাদীস আছে। হাদীসের সামনের অংশে আছে– إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ 'আমি তো বণ্টনকারী, প্রকৃত দাতা আল্লাহ।' অর্থাৎ ওহীর জ্ঞান আমার কাছে আসে। সেই ইলম আমি (রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বণ্টন করে দিই। অক্ষরে অক্ষরে উম্মতের কাছে পৌঁছে দিই। কিন্তু সমঝ দান করার মালিক আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে প্রাপ্ত সব কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। একটি অক্ষরও এমন নেই যা

তিনি পৌছাননি। এমনটি হতে পারে না। তো সবাই হাদীস শুনল, আয়াত শুনল, পড়ল, ইয়াদ করল; কিন্তু সমঝ? সেটা আল্লাহ তাআলার দান। এর ব্যাপারে বলা হচ্ছে– وَاللهُ يُعْطِيْ প্রকৃত সমঝ আল্লাহ তাআলা দান করেন। বসে বসে আমি খুব পড়ছি, পাঠ গ্রহণ করছি, কিন্তু সহীহ সমঝ আসতে হলে আল্লাহর দান লাগবে। এজন্য আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে হবে। ইসলামের সঠিক সমঝ পেতে হলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হতে হবে।

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হওয়ার তরিকা কী? আল্লাহ তাআলার বিধিবিধান মেনে চলা। তাকওয়ার রাস্তা অবলম্বন করা। সুন্নতের রাস্তা অবলম্বন করা, কুরআন কারীম বেশি বেশি তেলাওয়াত করা। সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা। ফিকির ও দুআ করা। আর যেসব কাজে আল্লাহ তাআলা নারাজ হন সেসব কাজ থেকে বেঁচে থাকা। যেসব কাজে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় সেসব কাজ বেশি বেশি করা। এর মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক যত মজবুত হবে আল্লাহ তত বেশি দ্বীনের সমঝ দান করবেন।

মাসআলা-মাসায়েল জানলাম, লিখলাম, মুখস্থ করলাম, এতে কিছু তথ্য আমার কাছে এল। খুব ভালো, অগ্রসর হলাম। শুধু কিছু তথ্য সংগ্রহ করার নাম সমঝ নয়। সমঝ আরো সূক্ষ্ম, আরো গভীর একটি ধাপের নাম। অনেক কিছু জানা আছে, কিন্তু সমঝের অভাবে মানুষ সেটার সঠিক প্রয়োগ করতে পারে না। জানা জিনিসের সঠিক ব্যবহার, সঠিক প্রয়োগ তখনই হয় যখন সমঝ থাকে। এজন্য একটা শব্দ হল ইলম, আরেকটা শব্দ হল ফিক্‌হ। ইলম লাগবে এবং ফিকহও লাগবে। আপনারা শুনেছেন عِلْمُ الْفِقْهِ-এর কথা। বাংলায় বলে ফেকাহশাস্ত্র। এই ফেকাহশাস্ত্রের মধ্যে কী পেশ করা হয়েছে? কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরাম বুঝেছেন, তাঁদের থেকে তাবেঈরা, তাঁদের থেকে তাবে-তাবেঈরা, এভাবে মুজতাহিদ ইমামগণ, ফকীহগণ বুঝেছেন। আর যার কাছে কিতাব-সুন্নাহর সঠিক সমঝ আছে তিনি হলেন ফকীহ। যত মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন তাঁরা হলেন ফুকাহা শ্রেণির আলেমদের শীর্ষে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ইবনে আনাস, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেঈ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এঁরা সবাই এই স্তরের। আলেম থেকে ওপরের স্তর হল ফকীহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রহমতে সাহাবীদের

কুরআন-সুন্নাহ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সমঝটা ধারাবাহিকভাবে ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমামদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁরা এই সমঝকে ধারণ করেছিলেন। এর বদৌলতেই তাঁরা সংকলন করতে পেরেছিলেন ইলমুল ফিক্‌হ ওয়াল ফত্‌ওয়া।

এই ফিক্‌হ যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর বিধানাবলির সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপ, এজন্য এটা হল ইলমুল ফিকহ। অর্থাৎ ফিকহুল কুরআন এবং ফিকহুস সুন্নাহ। এখানে যাদের সমঝ পেশ করা হয়েছে তারা হলেন ফকীহ। যে সমঝটা ফিক্‌হশাস্ত্রে পেশ করা হয়েছে ওটার মাধ্যমে, ওটার সহযোগিতা নিয়ে আমল করতে হবে কুরআন-সুন্নাহর ওপর। তাহলে আমলটা সঠিক হবে। কুরআন-সুন্নাহ বুঝার জন্য, শরীয়তের বিধান বুঝার জন্য ফকীহদের শরণাপন্ন হওয়ার কথা আল্লাহর রাসূলও বলেছেন, আল্লাহ তাআলাও বলেছেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ.

সূরা তওবার শেষের দিকে উপরিউক্ত আয়াত রয়েছে। আর হাদীস তো অনেক আছে।

আমি বলতে চাচ্ছিলাম, ইলম ও ফিকহের পার্থক্যের বিষয়টি। হাদীসের কিছু কিতাবের অনুবাদ হয়েছে, সেগুলো পড়ে কেউ হয়ত কিছু তথ্য জানতে পারে, কিন্তু সমঝ?

অনুবাদের ব্যাপারে একটি কথা বলা দরকার। যে কোনো অনুবাদই কি পড়া যায়? কাদিয়ানীরাও তো কুরআনের অনুবাদ করেছে। খ্রিষ্টানরাও অনুবাদ করেছে। হিন্দু কুরআনের অনুবাদ করেছে। এমন মুসলমানও কুরআনের অনুবাদ করছে, যে নিয়মতান্ত্রিক ইলমে দ্বীন শেখেনি।

হয়ত ইংরেজি কোনো অনুবাদকে ভায়া করে কুরআন পড়েছে, তারপর বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছে। অনুবাদকের নাম দেখা যায় 'বিচারপতি', আলেম নন। ফকীহ তো অনেক দূরের কথা। ডাক্তার কুরআনের অনুবাদ করছে, কুরআনের মজলিস করছে। প্রতি মাসে কুরআনের মজলিস করছে 'কোরআনিয়া' নামে। তিনি ওই মজলিসের সভাপতি। কোনো ভয় নেই, সংকোচ নেই। আপনি কিছু বলবেন, তাহলে উত্তর দেবে 'আল্লাহ সবার জন্য কুরআন নাযিল করেছেন।' কুরআন সবার জন্য নাযিল হয়েছে, ঠিক আছে; কিন্তু এর মানে কী? এর অর্থ হল, সবার কুরআনের ওপর ঈমান আনতে হবে। সবাইকে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। সবাইকে কুরআন বুঝতে হবে। কুরআনের বিধানের

ওপর আমল করতে হবে। কিন্তু সবাই কুরআনের তাফসীর করবে– এজন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন?

দেশের আইনের বইতে আইন লেখা আছে। আইনগুলো তো সবার জন্য। সবাইকে দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের আইন মেনে চলতে হবে; কিন্তু সবাই কি আইনজ্ঞ হবে? সংসদে আইন করা হল। ওটা বাংলা ভাষায়, আমার মাতৃভাষায় লেখা হয়েছে। আমি ভার্সিটির বাংলা ভাষার প্রফেসর। আমার অধিকার নেই ওটার ব্যাখ্যা করার। আমি ব্যাখ্যা করলে সেই ব্যাখ্যার কোনো মূল্য নেই। ওটা ধর্তব্য হবে না। একজন আইনজ্ঞ যে ব্যাখ্যা দেবেন সেই ব্যাখ্যাই ধর্তব্য হবে। এখানে তো এই স্বীকৃত নীতি সবাই বুঝে, কিন্তু কুরআনের ক্ষেত্রে? সেখানে কোনো নিয়ম-নীতি নেই? যার মন চায় সে-ই তাফসীর করা শুরু করবে? 'কুরআন সবার জন্য' অর্থ হল, ঈমান আনার জন্য, কুরআনের হেদায়েত গ্রহণ করার জন্য, আমল করার জন্য, বুঝার জন্য কুরআন সবার। 'সবার জন্য' বলে আপনি তাফসীর করা শুরু করে দেবেন? ইংরেজি একটা অনুবাদ পড়ে আপনি মুফাসসিরে কুরআন হয়ে যাবেন? কুরআনের দরস দেওয়া শুরু করবেন আপনি?

আমি বলতে চাচ্ছিলাম সমঝ দরকার। এখন তো অবস্থা এই যে, এক-দুটি কিতাবের অনুবাদ পড়ে, আর মনে করতে থাকে এখন যেহেতু আমি হাদীসের অনুবাদ পেয়ে গেছি, এখন আর কোনো আলেমের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমল নিজেই শুরু করে দেয়। সে তথ্য পেয়েছে, কিন্তু প্রয়োগের পদ্ধতি শেখেনি। যেমন একজন বুখারী শরীফের একটি অনুবাদ সংগ্রহ করল। যখন সে বুখারী শরীফের সালাত অধ্যায় পড়ল, সে দেখল সেখানে একটি অধ্যায় আছে, 'সশব্দে আমীন বলা প্রসঙ্গ'। এই শিরোনামের অধীনে একটি হাদীস এল–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ فَقُوْلُوْا : آمِيْنَ.

'যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলেন তখন তোমরা আমীন বল।'

অধ্যায় তো হল 'সশব্দে আমীন বলা প্রসঙ্গ', কিন্তু এর অধীনে হাদীস এসেছে এটা। এই হাদীসে কি জোরে কিংবা আস্তে আমীনের কথা এসেছে? শুধু আছে 'তোমরা আমীন বল।' 'তোমরা সশব্দে আমীন বল'-এই কথা তো হাদীসে নেই। জোরে কিংবা আস্তে আমীনের বিষয়টা অন্য হাদীস থেকে নিতে হবে।

কিন্তু যেহেতু শিরোনামে বলা হয়েছে 'সশব্দে আমীন বলা প্রসঙ্গ' ব্যস! এখান থেকে পড়ে তিনি মসজিদে এলেন, এখন দেখেন যে মসজিদে সবাই আস্তে আমীন বলে। কিন্তু তিনি যেহেতু বুখারীতে পড়ে এসেছেন, তাই মসজিদে এসে জোরে আমীন বলতে শুরু করেন। তিনি জোরে আমীন বলেন আর মনে মনে ভাবতে থাকেন, হায়রে! এত বছর শান্তিনগরে জুমার বয়ান শুনলাম কোনোদিন তো খতীব সাহেব আমাদেরকে এই হাদীস শোনালেন না যে, আমীন জোরে বলতে হয়। আজকে তো আমি নিজেই বুখারী শরীফে পড়লাম। কাজেই কোনো অপেক্ষার দরকার নেই। আজকে মসজিদে গিয়েই জোরে আমীন বলব। কারণ, এই সুন্নত তো এখানে নেই। মুর্দা সুন্নত যদি জিন্দা করা যায় তাহলে শহীদের সওয়াব, তো এখন মসজিদে এসে জোরে আমীন বলতে শুরু করল।

চিন্তা করা দরকার ছিল, এই দেশে বুখারী শরীফ কি কেবল আমি পড়ি, নাকি আরো কেউ পড়ে? যে হুযুরের পেছনে এতদিন নামায পড়লাম, যে হুযুরদের কাছ থেকে আমি নামায শিখলাম, তাদের মাদরাসায়ও তো বুখারী শরীফ সারা বছর পড়ানো হয়। প্রতি বছর বুখারী শরীফ পড়ছেন, পড়াচ্ছেন। এই বেচারাদের কি এতই দুর্বল ঈমান যে পড়বে একটা আর আমল করবে আরেকটা, জনগণকে এটা জানাবেই না? আপনার মধ্যে বুখারী শরীফ পড়ে এটার ওপর আমল করার জযবা এল। নিজের ব্যাপারে এত সুধারণা যে, এখনই আমল করতে হবে। কিন্তু দেশের এত আলেমের ব্যাপারে এই মন্দ ধারণা কেন যে, তারা হাদীসের ওপর আমল করে না? আপনার এই প্রশ্ন কেন আসে না যে তাঁরাও তো এই হাদীস পড়েন, পড়ান। কথার কথা, শাইখুল হাদীস আজীজুল হক সাহেব তো বুখারীর অনুবাদ করেছেন, তিনি কেন এই হাদীসের ওপর আমল করেন না, একটু গিয়ে জিজ্ঞেস করি। এই প্রশ্নটা আসে না। নিজে নিজে আমল করতে শুরু করে দেয়।

এটা হল দ্বীনের সমঝের অভাব। হাদীস জেনেছি, আমার হাদীসের ইলম হয়েছে, কিন্তু দ্বীনের সমঝের অভাব আছে বিধায় আমি প্রয়োগ করতে পারিনি। প্রয়োগ করলাম কী? এক মসজিদে প্রবেশ করলাম, জোরেশোরে আমীন বললাম। নামাযের পরে কেউ বলল, ভাই ব্যাপার কী? তখন বলে, এই মিয়া! তোমরা তো হাদীসের ওপর আমল কর না, সুন্নত মোতাবেক নামায পড় না(?) এই যে হাদীসে জোরে আমীনের কথা আছে। যদি তার দ্বীনের সমঝ থাকত তাহলে সে বুঝত, একটা তথ্য আমি পেয়েছি। কিন্তু

এটার ওপর আমল করার পদ্ধতি কী হবে? আমি যাই, জিজ্ঞেস করি একজন আলেমকে। যদি সে একজন আলেমের কাছে আসত তাহলে বুঝত, হাদীসের মধ্যে দু-ধরনের হাদীস আছে।

লক্ষ করুন, দুই রাকাত নামায আমি পড়ব। প্রতি রাকাতে দুইটা রুকু নাকি একটা রুকু? একটা রুকু। সেজদা দুইটা নাকি একটা? দুইটা সেজদা। দুই রাকাতে বসা একবার না দুইবার? একবার। কিয়ামের মধ্যে আপনি ফাতেহা পড়বেন তারপর সূরা মেলাবেন। নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা আছে। এই মাসআলাগুলো আপনি দেখবেন সব জায়গায় একরকম। দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় মুসলিম উম্মাহ আছে সবাই এগুলো একভাবে পালন করছে। দেখবেন, একবার রুকু করছে। কেউ একই রাকাতে দুইবার রুকু করছে না। হজে যান, পুবদিকের কোনো দেশে যান, যেখানে যান দেখবেন রুকু একটা, সেজদা দুইটা। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস দেখবেন ব্যতিক্রম। যেমন, এখানে দেখবেন সবাই আমীন বলছে। কিন্তু আস্তে, অনুচ্চস্বরে বলছে। আমীন উচ্চারণ করছে, কিন্তু আওয়াজ ছাড়া উচ্চারণ করছে। যেমন আমরা নামাযে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ উচ্চারণ করি। কিন্তু উঁচু আওয়াজ ছাড়া উচ্চারণ করি। কিন্তু হজ বা ওমরায় গিয়ে দেখবেন, ওখানে অনেকে জোরে আমীন বলে। আপনি আস্তে আমীনও দেখতে পেলেন, জোরে আমীনও দেখতে পেলেন–ঘটনাটা কী? এটা কি এমন যে, একটা বেদআত, একটা সুন্নত? একটা বৈধ, আরেকটা অবৈধ। বিষয়টি কি এ রকম?

আপনি যদি দু-শ কিতাব থেকে দু-হাজার হাদীস পড়েন, রুকু একটার কথাই পাওয়া যাবে। সেজদা দুইটার কথাই পাওয়া যাবে, একটার কথা পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমীনের ব্যাপারে হাদীসের যে কোনো বড় কিতাব আপনি খুলবেন, দু-ধরনের হাদীস পাবেন। এক ধরনের হাদীসে আমীন শব্দ করে বলার কথা আছে (চিৎকার করে নয়)। আরেক ধরনের হাদীসে আছে أَخْفٰى بِهَا صَوْتَهُ নিঃশব্দে আমীন বলা।

এক হাদীসে পাবেন শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত ওঠাবে, আর কোথাও হাত ওঠাবে না। আবার আরেক হাদীসে পাবেন, রুকুতে যাওয়ার সময় হাত ওঠাবে। রুকু থেকে ওঠার পরে হাত ওঠাবে। আরেক হাদীসে পাবেন, প্রতি তাকবীরে হাত ওঠাবে। প্রতি ওঠাবসায় হাত ওঠাবে।

فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ.

এ রকমভাবে তাকবীরে তাহরীমার পরে হাত বাঁধবেন কোথায়? নাভির ওপরে কিংবা নাভির নিচে, দুটিই স্বীকৃত পদ্ধতি। এই যে বিভিন্নতা আমি দেখলাম এর সমাধান কী?

এর সমাধান হল, যে এলাকায় যে হাদীসের ওপর আমল হচ্ছে সেখানে সেই হাদীসের ওপরই আমল হতে দিন। ওখানে আরেক হাদীসের তাবলীগ করবেন না। এখানে আস্তে আমীনের হাদীসের ওপর আমল হচ্ছে, আপনি এসে বললেন, আরে হাদীসে পাননি, জোরে আমীন বলতে হয়! শরীয়তের সমঝ যার আছে সে এটা করবে না।

এক জায়গায় বেদআত হচ্ছে সেখানে এই ওয়াজ করুন, 'বেদআত ছেড়ে সুন্নতের দিকে আসুন।' কিন্তু এক জায়গায় এমন একটি আমল হচ্ছে, যেটা সুন্নত, এর বিকল্প আরেকটি সুন্নতও আছে, যেটার ওপর হয়ত অন্য জায়গায় আমল হচ্ছে, সেখানে এ কথা বলা যায় না, 'এ আমল ছেড়ে ওই আমল করুন।' যেমন, সৌদিতে জোরে আমীনের সুন্নতের ওপর আমল। আমরা কোনো সময় হজ-ওমরায় গিয়ে এই কথা বলি না যে আপনারা কেন জোরে আমীন বলছেন?

এখানে আপনারা দু-একজন যারা জোরে আমীন বলছেন আপনারা যদি এই নিয়তে জোরে আমীন বলেন যে, এত মুসল্লি কেউ সুন্নতের ওপর আমল করছে না, আমি ছাড়া। তাহলে সুন্নত পালন করে আপনি যতটুকু সওয়াব পাচ্ছেন, তারচেয়ে বেশি গোনাহ হয়ে যাচ্ছে অন্য মুসল্লিদের ব্যাপারে কুধারণা করার কারণে।

যদি জোরে আমীন বললে একটু বেশি সওয়াব হত, তাহলে আমরাই জোরে আমীনের ওপর আমল শুরু করে দিতাম। কাজেই কোনো চ্যানেলে একটি হাদীস শুনে কু-ধারণার শিকার হবেন না যে, আমাদের খতীব সাহেব এতদিন আমাদেরকে এই হাদীস কেন শোনাননি? খতীব এই বিষয়ের সব হাদীস অধ্যয়ন করেছেন। সবগুলোর সনদ বিবেচনা করেছেন। এরপর তিনি দেখেছেন, এই বিষয়ে ইমাম ইবনু জারীর তবারী রহ. যা বলেছেন তা-ই সবচেয়ে শক্তিশালী কথা। তিনি ৩১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর লেখা তাফসীর গ্রন্থ হল তাফসীরে তবারী এবং হাদীস গ্রন্থ হল তাহযীবুল আসার। আরো কত গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম ইবনু জারীর তবারী। এগুলোর নাম বলার লোকও আজকাল পাওয়া যায় না। তিনি লিখেছেন–

وَالصَّوَابُ أَنَّ الْخَبَرَيْنَ: بِالْجَهْرِ بِهَا وَالْمُخَافَتَةِ صَحِيْحَانِ، وَعَمِلَ بِكُلٍّ مِنْ فِعْلَيْهِ

جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ كُنْتُ مُخْتَارًا خَفْضَ الصَّوْتِ بِهَا، إِذَا كَانَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ عَلٰى ذٰلِكَ.

'সঠিক কথা হল, সশব্দে আমীন বলা, নিঃশব্দে আমীন বলা উভয় হাদীস সহীহ। এর উভয় আমলকে আলেমগণের এক এক জামাত অবলম্বন করেছেন। আমি অবশ্য আস্তে আমীন বলাকেই অগ্রগণ্য মনে করি। কারণ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈ এর ওপর ছিলেন।' –আলজাওহারুন নাকী ২/৫৮

অধিকাংশ সাহাবী-তাবেঈর আস্তে আমীন বলার মানেই হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ আমল ছিল আস্তে আমীন বলা। এখানে এই নিয়মের ওপর আমল হচ্ছে। এখন এক দুই ভাই জোরে আমীন সম্পর্কে এক দুটি তথ্য শুনে যদি এখানকার আলেমদের সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করেন, তাহলে কি তা ঠিক হবে? এভাবে অন্যের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করা আর নিজের ব্যাপারে সুধারণা রাখা ঠিক নয়।

কয়টা হাদীসের কিতাব অনুবাদ হয়েছে? কত শত হাদীসের কিতাব এখনো অনুবাদ হয়নি, না ইংরেজিতে না বাংলায়। দু-চারটা অনুবাদ পড়েই যদি মনে করি আমি আল্লামা হয়ে গেছি, তাহলে তো মুশকিল। আর যার জানা-শোনার ভিত্তিই হল 'অনুবাদ' সে কি অনুবাদের ভুলগুলো চিহ্নিত করতে পারবে?

এ জন্য বলছিলাম, শুধু জানা যথেষ্ট নয়, ফিক্‌হের প্রয়োজন। কোনো বিষয়ের এক দুটি তথ্য জানা যথেষ্ট নয়, তার সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতিও বোঝা জরুরি। আর তা দ্বীনের সঠিক সমঝ ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। শুধু এক দুই ক্ষেত্র নয়, আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে দ্বীনের সমঝের অভাবে তথ্য জানা সত্ত্বেও অনেকে ভুল বোঝাবুঝি ও প্রান্তিকতার শিকার হয়। তাই দ্বীনী সমঝ অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। আর এ সমঝ শুধু কিতাব পড়ে অর্জন করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন এমন সমঝের অধিকারী আল্লাহওয়ালা আলেমগণের সাহচর্য অবলম্বন। অল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন, আমীন।#

[ডিসেম্বর ২০১৪ ঈ.]

দ্বীনী কিতাবের প্রকাশকগণের খেদমতে

আমাদের এ ভূখণ্ডে দ্বীনী কিতাবাদির বড় সংকট ছিল। বাংলা ভাষায় লিখিত দ্বীনী কিতাবও ছিল কম। উর্দু, ফারসি ও আরবী ভাষায় লিখিত কিতাবও বাইরে থেকে আনা এবং পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল নামমাত্র। আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দিন আমাদের ওই সকল মুরুব্বীকে, যাঁরা এদিকে মনোযোগ দিয়েছেন, অন্যদের মনোযোগী করেছেন। ফলে একদিকে বাংলা ভাষায় দ্বীনী বইপত্রের রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনার ধারা বিস্তার লাভ করেছে, অন্যদিকে বাইরে থেকে বিভিন্ন ভাষার বই-পত্র আসতে শুরু করেছে। আর এখন তো এদেশেই–মাশাআল্লাহ–আরবী ভাষায়ও মৌলিক রচনা ও প্রকাশনার ধারা সূচিত হয়েছে। যদিও বাংলাভাষী প্রাচীন আলেমদের কিছু আরবী পুস্তিকা এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে আছে আর কিছু নষ্টও হয়ে গেছে।

তো দ্বীনী কিতাবের এই সহজলভ্যতার জন্য আমরা সবার আগে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছি। কারণ করার মালিক তো একমাত্র তিনি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

এরপর অন্তরের অন্তস্তল থেকে ওই আকাবির ও মুরুব্বীগণেরও শোকর আদায় করছি, যাঁদের সদিচ্ছা ও নির্দেশনায় এ ধারা শুরু হয়েছে এবং গতিশীল হয়েছে। তেমনি প্রকাশনা জগতের মালিক-প্রকাশকগণেরও আন্তরিক শোকরগোযারি করছি, যারা এই মুবারক কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তলাবা-উলামা ও সর্বস্তরের পাঠকের ওপর বড় অনুগ্রহ করেছেন এবং দ্বীনী কিতাব সংগ্রহ করা সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং প্রত্যেকের খেদমতকে খায়ের ও বরকতপূর্ণ করুন। আর সকলকে সব ধরনের কামিয়াবি দান করুন, আমীন।

শোকর আদায়ের পর আমরা তাদের প্রতি কল্যাণকামিতা ও তাদের মুদ্রিত, প্রকাশিত ও আমদানিকৃত বই-পত্রের পাঠকদের প্রতি কল্যাণকামিতা থেকে কিছু কথা নিবেদন করছি। যে কল্যাণকামিতা থেকে কথাগুলো লেখা হচ্ছে, আশা করি, ওই রকম কল্যাণকামিতার মনোভাব নিয়েই তা পাঠ করা হবে।

নিবেদনসমূহ

১. যদ্দুর আমার ধারণা, আমাদের দ্বীনী কিতাবপত্রের প্রকাশকগণ–ইন্‌শা-আল্লাহ–এই পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে নেক-নিয়তের অধিকারী। তাঁরা হালাল উপার্জন, দ্বীনী ইলমের অন্বেষী পাঠকবৃন্দের সেবা, তলাবায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরামের খেদমত ও ইলমে ওহীর প্রচার-প্রসারে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যেই এই পেশা অবলম্বন করে থাকবেন। ইনশা-আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে এ হাদীসের মধ্যে শামিল হওয়া–

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ.

অর্থাৎ সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গী। –জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৯ (হাসান)

তবুও নিয়তের নবায়ন সওয়াবের কাজ এবং সংকল্পকে শানিত করার এক কার্যকর উপায়। এ কারণে আশা করি, আমরা উপরিউক্ত নিয়তের নবায়নও করতে থাকব।

২. মুমিনের শি'আর ও নিদর্শন হচ্ছে আমানত। হাদীস শরীফে আছে–

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

'যার মাঝে আমানত নেই তার মাঝে ঈমান নেই। আর যার মাঝে অঙ্গীকারের মর্যাদা নেই তার মাঝে দ্বীন নেই।' –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২৩৮৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৯৪

ইলম অনেক বড় আমানত। ইলমে ওহী সবচেয়ে বড় আমানত। মুমিন তো সব বিষয়েই আমানতদারি রক্ষা করবে। আর যে কোনো ব্যবসায় আমানত রক্ষা করা এবং খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকা ফরয। কিন্তু তেজারতের সম্পর্ক যখন হয় ইলমের সঙ্গে এবং সরাসরি ইলমে শরীয়ত ও ইলমে ওহীর সঙ্গে তখন আমানতদারি রক্ষা করা কত বড় ফরয তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ কারণে, আমরা ঈমান-রক্ষার জন্যও এবং ব্যবসায় সফলতার জন্যও আমানতদারি রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।

৩. এ আমানতদারির-ই একটি দিক, অনির্ভরযোগ্য ওযিফার বই, অনির্ভরযোগ্য রচনা-অনুবাদ তথা সব ধরনের অনির্ভরযোগ্য বই-পত্রের প্রকাশনা থেকে বিরত থাকা। প্রকাশনার এটা কোনো নীতি হতে পারে না যে,

বাইরে থেকে যে পুস্তিকাই আসবে তা-ই তরজমা করে প্রকাশ করা হবে। বাইরের হওয়া আর নির্ভরযোগ্য হওয়া এক কথা নয়। ভেতরের হোক বা বাইরের সব কিছু নির্ভরযোগ্য হতে হবে এবং তরজমাও মানসম্মত হতে হবে।

তরজমার ক্ষেত্রে আরো বিবেচনা করা দরকার যে, এ কিতাব আসলেই সাধারণ পাঠকের উপযোগী কি না। দেখুন, কিতাবমাত্রই অনুবাদ-যোগ্য হয় না এবং কিতাবমাত্রই সাধারণ পাঠকের উপযোগী হয় না। তেমনি যে কোনো দরসী কিতাবের তরজমাও তালেবে ইলমদের জন্য উপকারী হয় না। ইলমের খেদমতের রেয়ায়েতকারী প্রকাশকগণ কিন্তু এসব বিষয় খেয়াল করে থাকেন।

৪. আমানতদারির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, ভুল সম্বন্ধ না করা। সংকলন একজনের, নাম আরেকজনের এ-ও খেয়ানত। কিছু দিন আগে একটি সংকলন চোখে পড়ল, যাতে উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের নাম ছাপা হয়েছে। ভেতরে দেখা গেল, গোটা পুস্তিকার হয়ত দুই-তিন জায়গায় তাঁর কোনো কথা আছে। বাকি সবকিছু এদিক-সেদিক থেকে সংকলিত। অথচ প্রচ্ছদে নাম হযরতুল উস্তাযের। বিভিন্ন লক্ষণ থেকে বোঝা গেল, এ কাজ অর্থাৎ হযরতের নামের ভুল ব্যবহার সংকলকের কাজ নয়, প্রকাশকের কাজ।

যে কোনো ক্ষেত্রে যে কারো নামের ভুল ব্যবহার গোনাহ, আর ইলমী কিতাবে, উপরন্তু শাইখুল ইসলামের মতো ব্যক্তিত্বের নাম! এখানে ভুল বিবরণ কত বড় অপরাধ!

৫. আরেকটি বিষয়, যা সরাসরি খেয়ানত না হলেও, আমানতের দাবির পরিপন্থী এবং শরাফত ও ভদ্রতার সম্পূর্ণ বিরোধী; যাকে বলা যায় অন্যায় প্রতিযোগিতা বা অর্থহীন পুনরাবৃত্তি; একটি কিতাবের অনুবাদ হয়ে গেছে, অনুবাদ ও মুদ্রণ মানসম্মতও বটে, এখন তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকাশকের পক্ষ থেকে তরজমা করানো ও প্রকাশ করা প্রশংসনীয় নয়। এ হচ্ছে অন্যায় প্রতিযোগিতা, যা নিন্দা-যোগ্য। বিশেষত, দ্বিতীয় কাজ যদি হয় প্রথমটির চেয়ে নিম্নমানের, তাহলে তো সেটা আরো আপত্তিকর।

হযরতুল উস্তাযের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব 'ঈসাইয়্যাত কেয়া হ্যায়'। এর একটি বাংলা-তরজমা হয়েছিল, এরপরও দ্বিতীয় তরজমার প্রয়োজন ছিল। আমি হযরত মাওলানা আবুল বাশার সাহেবকে অনুরোধ করি। তাঁর দ্বিধা হয়, প্রথম অনুবাদককে জিজ্ঞেস করেন। এরপর ভূমিকায় এর ওপর লম্বা ওজরখাহি করেন। জাযাহুল্লাহু খায়রান।

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-কে দেখেছি, কত কিতাবের তাহকীক তা'লীকের—পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও টীকা লেখার কাজ শুরু করেও স্থগিত করে দিয়েছেন বা কাজ শেষ করার পরও ছাপেননি। কারণ অন্য কোনো প্রকাশক তা ছেপে ফেলেছে। ওই প্রকাশকের সম্পাদনা ও মুদ্রণ যদিও শায়েখের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে গ্রহণযোগ্য। এ কারণে শায়েখ আগে কাজ শুরু করেও নিজের ইচ্ছাকে সংযত করেছেন।

যাহোক, কখনো কখনো কোনো কোনো কিতাবের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও বাস্তবেই এর ওপর আবার কাজ করার প্রয়োজন হয়। এটা পুরোপুরি অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এটুকু তো অবশ্যই হওয়া দরকার যে, মানহীন অনুবাদ ও মুদ্রণের দ্বারা মানসম্পন্ন তরজমা ও মুদ্রণের মোকাবেলা যেন না করা হয়। আজকাল বিশেষ কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই বড় বড় ইলমী কিতাবেও এই অপ্রিয় প্রতিযোগিতা জারি আছে। এ থেকে যথাসাধ্য বেঁচে থাকাই আমাদের জন্য মঙ্গল।

তবে হাঁ, এমন কোনো পুস্তিকা, যার বিষয়বস্তু সাধারণ এবং যার ব্যাপক প্রচার কাম্য, যা প্রত্যেক পাবলিক লাইব্রেরি; বরং প্রতিটি ঘরে থাকা দরকার—এ ধরনের সহজ-সরল প্রয়োজনীয় বিষয় ও দাওয়াতী পুস্তক-পুস্তিকার কথা আলাদা। এ ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচারের স্বার্থে ব্যাপক অংশগ্রহণের রেওয়াজ সব জায়গায় আছে। এ ক্ষেত্রেও মান-রক্ষা জরুরি এবং অন্যের হক নষ্ট করা না-জায়েয।

৬. কিন্তু যা পরিষ্কার খেয়ানত, যাতে কোনো ব্যাখ্যা-তাবীলের অবকাশ নেই, তা এই যে, অন্য কোনো লেখক বা প্রকাশকের কিতাব, তা স্বদেশের হোক, বা বিদেশের, হুবহু ফটো নিয়ে বা নামকেওয়াস্তে এখানে-ওখানে কিছু পরিবর্তন করে প্রকাশ করা। আবারো বলছি, এ কাজ পরিষ্কার খেয়ানত। এতে তাবীলের কোনো সুযোগ নেই। হীলা-বাহানা তো ওই ক্ষেত্রে বের করা যায় যে, কোনো জরুরি কিতাব একশ-দেড়শ বছর আগে ছাপা হয়েছে, এখন তা পাওয়া যাচ্ছে না, প্রকাশকের ওয়ারিসদেরও সন্ধান পাওয়া যায় না তো প্রয়োজনের খাতিরে কোনো প্রকাশক যদি তা ছাপেন, তাহলে এতে যা হোক এক ধরনের ব্যাখ্যা-তাবীল হতে পারে। তেমনি এমন কোনো জায়গা যেখানে বাইরে থেকে কিতাব আনানোর ব্যবস্থা নেই, ওখানে বাইরের কোনো প্রকাশকের কিতাব যদি ছাপা হয়, তাহলে তার কাটতি প্রভাবিত হয় না, এমন ক্ষেত্রেও কেউ কোনো হীলা বের করতে পারে, যদিও সব হীলার দ্বারা কাজ

জায়েয হয়ে যায় না। কিন্তু এখন এমন দেশ কোথায়? এখন তো গোটা বিশ্ব একটি গ্রাম। এখন তো প্রকাশকেরা শুধু ভারত-পাকিস্তান থেকেই নয়, মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য থেকেও প্রচুর কিতাব আনছেন। এমনকি আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশেও। তো এখানে অন্য প্রকাশকদের হক নষ্ট করে, তাদের পরিশ্রমে পানি ঢেলে দিয়ে, তাদের কিতাবসমূহের হুবহু ফটোকপি প্রকাশ করা যে এক নিকৃষ্ট অপরাধ–এ বিষয়ে কি কারো কোনো সংশয় থাকতে পারে?

এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, বাইরের প্রকাশকেরা জানলে নারাজ হবেন না বা অনুমতি দিয়ে দেবেন। উভয় ধারণাই ভুল ও কল্পনাপ্রসূত!

পাকিস্তানের এক প্রকাশক 'কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস' কিতাবটি শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ রহ.-এর টীকাসহ পাকিস্তানে ছেপে দিয়েছেন। শায়েখ আমার সামনে এ প্রকাশকের কঠিন সমালোচনা করেছিলেন এবং সাক্ষাতে স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদও করেছিলেন। এ ধরনের কাজকে শায়েখ স্পষ্ট ভাষায় سرقة (চুরি) বলতেন।

আজ থেকে পনেরো-ষোল বছর আগের কথা, যখন এখানে আরবের কিতাব-পত্র ব্যাপকভাবে আসত না, এক প্রকাশক শায়েখের সাহেবযাদা মুহতারাম সালমান আবু গুদ্দাহ–হাফিযাহুল্লাহু তাআলা–কে চিঠি লিখেছিলেন এবং শায়েখের কিছু কিতাব এখানে প্রকাশের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, 'হক্কুত তবা' প্রদানের পরেই তা হতে পারে। ১৪২৮ হিজরীতে 'কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস'-এর দশম এডিশন প্রকাশিত হয়। এর শুরুতে শায়েখ সালমান এ কিতাবের 'বে-শরা' ও 'চুরি করা' (অননুমোদিত) সংস্করণসমূহেরও উল্লেখ করেছেন।

এখন এদেশে শায়েখের ও তাঁর আলেম সঙ্গী ও শাগরেদদের কিতাব-পত্র কী নির্দয়ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে! বিনা অনুমতিতে ছাপানোর পাশাপাশি অঙ্গ-সজ্জাও প্রায় শূন্যের কোঠায়। এগুলো দেখে আমার মন খুব কাঁদে। আর এসব কিতাবের প্রকাশক ও সম্পাদকগণের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছয় তখন তারা খুব অসন্তুষ্ট হন এবং অত্যন্ত কঠিন বাক্য ব্যবহার করেন। সুতরাং ওই প্রকাশকদের মৌন সম্মতির দাবি আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়।

এখানকার এক প্রকাশক 'ফাতাওয়া উসমানী' ছাপার জন্য হযরতুল উস্তাযকে চিঠি লিখেছিলেন। হযরত ইজাযত দেননি, তিনিও ছাপেননি।

যাহোক, 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত' কথাটা আমরা নিজেরা যখন লিখি তখন তা অর্থপূর্ণ; আর অন্য প্রকাশক লিখলে 'অর্থহীন'–এ স্ববিরোধী নীতি বা চিন্তা

নিন্দনীয় নয় কি? তো আমাদের কি ভেবে দেখা উচিত নয়?

আমি যখন শুনি, বিনা অনুমতিতে কেউ অন্যদের কোনো কিতাব প্রকাশ করেছেন তখন আমার খুব কষ্ট হয়। বিভিন্ন প্রকাশকের তরফ থেকে এ ধরনের কিছু কিতাবের কপি আমার কাছে হাদিয়া হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আমি তা গ্রহণ করিনি; বরং আমি তো এমন কিতাব আমার তালেবে ইলম ভাইদেরও কিনতে বলব না। কারণ তা অন্যের হক নষ্ট করায় সহযোগিতার মধ্যে পড়ে, যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

মাসিক আলকাউসারে বিভিন্ন মাকতাবার (লাইব্রেরির) বিজ্ঞাপন আসে। এতে পাঠকদেরও ফায়েদা হয়। আজকাল দেখছি, ওইসব বিজ্ঞাপনে বাইরের কিতাব-পত্রের ফটো-মুদ্রণেরও উল্লেখ থাকছে। বিজ্ঞাপন যারা পাঠান তাদের কাছে আমাদের জোর নিবেদন, তারা যেন তাদের বিজ্ঞাপনে এমন কোনো কিতাবের উল্লেখ না করেন, যার মুদ্রণ-স্বত্ব অন্য কারো। আর তিনি তা বিনা অনুমতিতে এখানে প্রকাশ করেছেন। কেউ যদি এমন কোনো বিজ্ঞাপন আলকাউসারে পাঠান তাহলে আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

আলকাউসারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলকেও বলা হচ্ছে, এ ধরনের অন্যায় উপায়ে মুদ্রিত কোনো কিতাবের উল্লেখ বিজ্ঞাপনে থাকার কথা যদি তাদের জানা থাকে তাহলে যেন এমন বিজ্ঞাপন কোনোভাবেই গ্রহণ না করেন।

কথা অনেক হয়ে গেল। সম্মানিত প্রকাশকবৃন্দের সমীপে আমাদের নিবেদন, আল্লাহ তাআলা যখন আপনাদেরকে কিতাবের খেদমতের মতো উঁচু ও মহৎ পেশা অবলম্বনের তাওফীক দিয়েছেন তখন আপনারা এর হক আদায় করুন। বড় প্রকাশকগণ যদি চান, তাহলে নিজের মাকতাবার জন্য আলাদা 'দারুত তাসনীফ' (রচনা বিভাগ) ও 'মাকতাবু তাহকীকিত তুরাছ' (পাণ্ডুলিপি-সম্পাদনা বিভাগ)ও খুলতে পারেন। আপনারা ইচ্ছা করলে নিজেদের এ পেশাকে এত উঁচুতে নিয়ে যেতে পারেন যে, আপনাদের 'সম্পাদিত' ও 'মুদ্রিত' কিতাবসমূহ ছাপার জন্য অন্য দেশের প্রকাশকেরা আপনাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবেন। শুধু সাহস ও সদিচ্ছার প্রয়োজন। আমরা সেই শুভ দিনটির প্রতীক্ষায় রইলাম।#

১৭-০৩-১৪৩৬ হি.
বৃহস্পতিবার দিনগত রাত
১ টা ৩০ মিনিট
[ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঈ.]

এসব ক্ষেত্রেও ইজাযত প্রয়োজন
বিলুপ্তপ্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব

কুরআন কারীম আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব শিক্ষা দিয়েছে, যা গ্রহণ করা এবং অনুসরণ করা জরুরি। আর তা হচ্ছে, কারো ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়া। যদি ইজাযত না পাওয়া যায় তো ফিরে আসা। এমনকি বিশেষ বিশেষ সময়ে একই পরিবারের সদস্যদের জন্যও এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে অনুমতি নেওয়া জরুরি। নিজের মাহরাম ব্যক্তির ঘরেও যেন কেউ ওই সময়গুলোতে অনুমতি ছাড়া ঢুকে না পড়ে। হাদীস শরীফের ভাষ্য হল–

إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ.

অর্থাৎ অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় দৃষ্টিগোচর হওয়া থেকে বাঁচার জন্যই তো অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করাকে আবশ্যক করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬২৪১) যে বিষয় বা যে অবস্থা অন্যের দৃষ্টিগোচর হওয়াটা ঘরওয়ালার পছন্দ নয়, তাতে যেন অন্যের নজর না পড়ে–এ উদ্দেশ্যেই প্রবেশের আগে অনুমতি প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রেক্ষাপটে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি সাক্ষাতের অনুমতি নিতে এসে দেখল, পর্দার মাঝ দিয়ে একটু ফাঁকা রয়েছে। তখন সে ওই জায়গা দিয়ে ঘরের ভেতর তাকাচ্ছিল।

শরীয়তে অনুমতি প্রার্থনা বিষয়ে আরো নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব নির্দেশনা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলে ইনশা-আল্লাহ বুঝে আসবে, এসব নির্দেশনার রূহ হল :

১. শরীয়তের দৃষ্টিতে যেসব বিষয় অন্যের দৃষ্টিগোচর না হওয়া উচিত, তার ওপর যেন দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

২. কারো কোনো বিশেষ অবস্থা বা অবস্থান, ব্যক্তিগত সামানা বা কাগজপত্র অথবা একান্ত গোপনীয় বিষয় যেন তার ইচ্ছার বাইরে কারো দৃষ্টিগোচর না হয় বা কেউ জেনে না ফেলে।

৩. কারো সময় বা অন্য যে কোনো জিনিস তার সন্তুষ্টি ছাড়া ব্যবহার না হয়। বিষয়টির উপরিউক্ত উদ্দেশ্য যদি ঠিক হয় এবং ইনশা-আল্লাহ সবার দৃষ্টিতেই এর উদ্দেশ্য এটাই হবে, তাহলে আমরা একটু ভেবে দেখি, যেসব জায়গায় আমাদের ইজাযত নেওয়া জরুরি ছিল অথবা অন্তত ইজাযত নেওয়া কাম্য ছিল–এমন কত স্থানে আমরা বিনা ইজাযতে হস্তক্ষেপ করছি অথচ কোনো পরোয়াই করছি না!

বাকি কথা বলার আগে কয়েকটি ঘটনা লক্ষ করুন :

১. দারুল উলূম সাহবানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আমাকে শুনিয়েছেন, তার শায়েখ ও উস্তায শাইখুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা সাহবান মাহমুদ রহ. যখন ঢাকায় তাদের বাসায় এসেছিলেন, তখন হযরত যে ঘরে অবস্থান করেছিলেন সে ঘরে ওই সব কিতাব রাখা ছিল, যা তিনি দারুল উলূম করাচির ছাত্র অবস্থায় পুরস্কারস্বরূপ পেয়েছিলেন। হযরত এক-দুদিন ওই ঘরে থাকার পর তিনি তাঁকে বললেন, হযরত ওই কিতাবগুলো আমি দারুল উলূম করাচির পক্ষ থেকে পুরস্কারস্বরূপ পেয়েছিলাম। (তার ধারণা ছিল, হযরত ইতিমধ্যে কিতাবগুলো দেখেছেন।) হযরত তখন বললেন– ভাই, আমি তো কোথাও গেলে যেখানে বসি বা অবস্থান করি, এর আশেপাশে কী রাখা আছে দেখি না!

২. অনেক বছর আগের কথা। সাপ্তাহিক 'তাকবীর'-এর মরহুম সম্পাদক সালাহুদ্দীন সাহেব প্যারিসে ড. মাওলানা হামীদুল্লাহ রহ.-এর বাসায় সাক্ষাতে যান এবং তাঁর একটি ইন্টারভিউ নেন। ইন্টারভিউ শেষে তাঁর একটি ছবি তোলার অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, আমাকে মাফ করবেন। এটা থেকে আমাকে মুক্ত রাখুন। ফলে তিনি তাঁর ফটো তোলেননি এবং ফটো ছাড়াই ইন্টারভিউ ছেপেছেন। (ডক্টর হামীদুল্লাহ কি বেহতেরীন তাহরীরে : ভূমিকা)

শরীয়তে তাসবীর অকাট্যভাবে হারাম এবং মারাত্মক গোনাহ। আর আরবের অধিকাংশ আলেম এবং হিন্দুস্তানী সকল আলেমের কাছেই ডিজিটাল-পূর্ব ক্যামেরার ছবি তাসবীরের অন্তর্ভুক্ত। ডিজিটাল ছবির ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ বলেন, প্রিন্ট করার আগ পর্যন্ত এটা সম্ভবত হারাম তাসবীরের মধ্যে পড়বে না।

ব্যস! তাদের এ কথাকে বাহানা বানিয়ে বহু এমন লোকও ছবির ব্যাপারে ঢিলেঢালা হয়ে গেছেন, যারা এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এমনটি না হওয়া উচিত ছিল। শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কোনো প্রাণীর ডিজিটাল ছবি

থেকেও বেঁচে থাকা জরুরি। কোন ধরনের ছবির ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় প্রয়োজনের আওতায় আসে, তা বিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে নিতে হবে।

এখন মাসআলা বর্ণনা করা আমার আসল উদ্দেশ্য নয়, আমি তো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আদব সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছি। ড. হামীদুল্লাহ রহ. প্যারিসের মতো স্থানে বসে নিজের ফটো দিতে অপারগতা পেশ করছেন এবং সালাহুদ্দীন সাহেব মরহুমের মতো আধুনিক ব্যক্তিও অনুমতি না দেওয়ায় তাঁর ছবি নেওয়া থেকে বিরত থাকছেন!

৩. একবার কোনো এক মজলিসে এক ব্যক্তি মোবাইলের ক্যামেরায় শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা দামাত বারাকাতুহুমের ফটো নেওয়ার ইজাযত চাইলেন। তিনি নিষেধ করাতে ওই ব্যক্তি ছবি নেওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

৪. কয়েক বছর আগের কথা। মসজিদে হারামে একজন আরব হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুমের সঙ্গে মানহাজে তালীম ও নেযামে তরবিয়ত বিষয়ে আলোচনা করলেন। মাদানী নেসাবের বিষয়ে জানলেন। কথা শেষে সে বারবার অনুরোধ করল, আমাকে একটি 'ছবি' তোলার অনুমতি দিন। কিন্তু তিনি ছবি না দেওয়ার ব্যাপারে অটল থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সেও আর ছবি নেয়নি।

আমার উদ্দেশ্য এই যে, যারা ডিজিটাল ছবিকে না-জায়েয মনে করেন না, তারাও জবরদস্তিমূলক বা ব্যক্তির অজান্তে ছবি তোলেন না। ইজাযত নেওয়ার প্রতি লক্ষ রাখেন।

৫. আরেক সফরে রওযায়ে আতহার যিয়ারতের সময় একবার হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুমের সঙ্গে থাকার সুযোগ হয়েছিল। যিয়ারতের পর যখন মসজিদে নববী থেকে বের হলেন– বললেন, সালামের সময় দৃষ্টি অবনত রাখা চাই। কিছু মানুষ এদিক ওদিক দেখতে থাকে। জালি দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে ভেতরে দেখতে চেষ্টা করে। এমনটি করা তো 'সূয়ে আদব' হবে মনে হয়।

এখন চিন্তা করুন, অনেক লোক যে সালাম পেশ করার সময় বা আগে-পরে মোবাইলে অথবা ক্যামেরায় রওযায়ে আতহারের ছবি তুলতেই থাকে– এটা তাহলে কত বড় বেয়াদবি হবে?!

উল্লিখিত মূলনীতি এবং এসব ঘটনার আলোকে দ্বিতীয়বার আমাদের হালতের ওপর চিন্তা করি যে, যেখানে অনুমতি নেওয়া জরুরি বা কমসে কম অনুমতি নেওয়া কাম্য, এমন কত ক্ষেত্রে আমরা অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনই বোধ

করি না। আমাদের এ কাজ ইসলামী আদবের পুরোপুরি খেলাফ। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন, আমীন।

উদাহরণস্বরূপ কিছু বিষয় আলোচনা করছি :

১. কারো সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তার পূর্ব-ইজাযত ছাড়া যাওয়া

এর মাঝে উভয়ের সমস্যা। উভয়ের জন্য এটা কষ্টের কারণ হয়। সুতরাং এ থেকে বিরত থাকা চাই।

২. সাক্ষাতের জন্য অসময়ে হাজির হওয়া

স্বাভাবিকভাবেই সবার জানা থাকে, অমুক অমুক সময় সাক্ষাতের সময় নয়। সুতরাং এ সময় কারো সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া উচিত নয়। পূর্ব-ইজাযত নিয়ে এলে এমনিতেই এসব না-মুনাসিব বিষয় থেকে বাঁচা যায়।

কেউ কেউ বলেন, আমি মানসিকভাবে এ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি যে, সাক্ষাৎ হলেও ঠিক আছে, না হলেও ঠিক আছে। কিন্তু এ চিন্তা একতরফা। যার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসা হয়েছে তাকে তো মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হল না! যখন সাক্ষাতের জন্য কেউ হাজির হয়ে যায় তখন তো তাকে আর না করা যায় না। অবশেষে নির্ধারিত কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে হলেও তাকে সাক্ষাতের সময় দিতে হয়।

৩. সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া

কারো যদি সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকে, তাহলে ওই সময়ের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি। এ ছাড়া অন্য সময়ে সাক্ষাতের জন্য হাজির হওয়া একেবারেই অনুচিত। হাঁ, যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয় এবং নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় যেতেই হয়, তাহলে ইজাযত না নিয়ে বা কমসে কম না জানিয়ে যাবে না।

৪. কারো সাক্ষাতে গিয়ে তার ছবি নেওয়া

এটা এমনিতেই গলদ কাজ। আর অনুমতি ছাড়া এমনটি করা আরো বড় অন্যায়। কিছু মানুষ এজন্য ইজাযত নেয় না, ইজাযত চাইলে পাওয়া যাবে না। যদি ইজাযত না পাওয়া যায়, ছবি নেবে না। ইজাযত পেলেও তো এ কাজ না করা চাই। আমরা কি সকল খাহেশ পুরো করার জন্য দুনিয়ায় এসেছি?

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں

اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

৫. কারো সাক্ষাতে গিয়ে তার কথা রেকর্ড করা

কারো কাছ থেকে শুধু সাক্ষাতের ইজাযত পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার কথা রেকর্ড করারও অনুমতি হয়ে গেছে। এজন্য আলাদা ইজাযত নেওয়া প্রয়োজন।

৬. সাক্ষাতের মজলিস ভিডিও করা

শরীয়তসম্মত জরুরত না হলে এমনিতেই ভিডিও করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। আর যদি তা হয় ইজাযত ছাড়া, তাহলে তো আরো অন্যায়।

৭. কারো কল রেকর্ড করা

কারো ফোনের জবাব দেওয়া, ফোনে যা জিজ্ঞেস করা হয় তার উত্তর দেওয়া বা মাসআলার উত্তর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, অপরপ্রান্তের ব্যক্তিকে তা রেকর্ড করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কারো কল রেকর্ড করার প্রয়োজন দেখা দিলে তার অনুমতি নেওয়া জরুরি।

৮. খাস বিষয়কে আমভাবে প্রচার করা

একান্ত মজলিসের কথাবার্তা ইজাযত ছাড়া আমভাবে প্রচার করার জন্য দেওয়া; এটিও একটি অন্যায় কাজ।

ইজাযত নিয়েও যদি কারো ছবি তোলা হয় বা কোনো মজলিসের ভিডিও করা হয় কিংবা কারো কথা রেকর্ড করা হয় তথাপিও শুধু এইটুকু ইজাযতের দ্বারা এসবের ব্যাপক প্রচারের ইজাযত সাব্যস্ত হয় না। কিছু মানুষ এ ধরনের খাস বিষয় পত্রিকায় ছেপে দেয় বা ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয় অথবা সিডি বানিয়ে ব্যাপক প্রচার করে–এ সবই গলদ এবং ইসলামী আদবের সরাসরি খেলাফ কাজ।

এটি এখন ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে– ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হয়েছে, এর উত্তর নেটে দিয়ে দেওয়া হল। কাউকে ফোনে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এরপর মাসআলার জবাব নেটে ছেড়ে দেওয়া হল। এমনটি করা অনুচিত। এর জন্য ইজাযত নেওয়া জরুরি। কারণ, মানুষের যখন একথা জানা থাকে যে, তার কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে তখন তিনি বেশি সতর্ক হন এবং বেশি গুরুত্বের সঙ্গে কথা বলেন। কারো ব্যক্তিগত আলোচনা প্রচারের জন্য যদি ইজাযত নেওয়া হয়, তাহলে তিনি দ্বিতীয়বার দেখে সম্পাদনা করে দিতে পারবেন। কিন্তু ইজাযত ছাড়া যদি প্রচার করা হয়, তাহলে আর সম্পাদনা করার সুযোগ পাওয়া যাবে না।

উসূলে হাদীসের কিতাবে মুযাকারার মজলিসে শোনা রেওয়ায়েত একেবারে আম রেওয়ায়েতের মতো বর্ণনা করা অর্থাৎ মুযাকারা-মজলিসে শ্রুত হওয়ার কোনো লক্ষণ রাখা ছাড়া বর্ণনা করা যখন নিষেধ, তখন ব্যক্তিগত মজলিসের আলোচনার হুকুম কী হবে?

যারা আম মজলিসের বয়ানও দ্বিতীয়বার দেখা ছাড়া না কিতাব আকারে প্রকাশ করতে চান, না অডিও আকারে; শুনেছি তাদেরও কিছু কিছু বয়ানের ভিডিও কোনো বদযওক লোক নেটে ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি খাস মজলিসের কথাও নেটে ছেড়ে দিয়েছে।

যে ব্যক্তি নিজের ফটো ও ভিডিওর ইজাযত দেন না, তার ভিডিও যদি নজরে আসে তাহলে বুঝতে হবে, নিঃসন্দেহে এটা তার অজান্তে সংগ্রহ করা হয়েছে। ইনসাফের সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার, এটাও এক-প্রকারের চুরি কি না!

ব্যক্তিগত মুযাকারা বা একান্ত মজলিসের আলোচনা প্রচারকারীরা যদি তা নিজেদের ভাষায় প্রচার করে, তখন তো তাতে সঠিকভাবে না বুঝেও প্রচারের সম্ভাবনা থাকে। আর ভাষা ও উপস্থাপনার পার্থক্য তো হতেই থাকে, যার কারণে অনেক সময় বক্তব্যের মাঝে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এ ছাড়া এ ধরনের বর্ণনার ক্ষেত্রে বক্তব্যের প্রেক্ষাপট সামনে থাকে না। আর স্বাভাবিক কথা যে, বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ছাড়া তা যথাযথভাবে বোঝা খুবই কঠিন! যারা মিডিয়ায় এ ধরনের কাজ করে, তাও আবার দাওয়াতের নামে, আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়েত নসীব করুন, আমীন।

৯. মাহফিলের বয়ানকে কিতাব বানিয়ে দেওয়া

আম মাহফিলের কোনো বয়ান শুনে ওটাকে ওভাবেই লিপিবদ্ধ করে ব্যাপক প্রচার করা বা কিতাবে রূপ দেওয়ার সহীহ তরিকা হল, যদি বয়ানকারী জীবিত থাকেন, তাহলে লিপিবদ্ধ করার পর তাকে দেখানো এবং তার ইজাযত ছাড়া ব্যাপক প্রচার না করা। আর যদি বয়ানকারী জীবিত না থাকেন, তাহলে লিপিবদ্ধ করার পর কোনো বিজ্ঞ আলেমকে দেখিয়ে নেওয়া।

হাকীমুল উম্মত রহ.-এর মাওয়ায়েজ–ওয়াজ চলা অবস্থায়–লিপিবদ্ধ করতেনই বড় বড় আলেম। তা সত্ত্বেও তারা পরিষ্কারভাবে লিখে হযরতকে দেখাতেন। হযরত দেখে সম্পাদনা করে দেওয়ার পর তা প্রকাশিত হত বা প্রকাশের স্বীকৃতি পেত।

এ ব্যাপারে মাজালিসে মুফতীয়ে আযম (মুফতী আবদুর রঊফ সাহেব কৃত)-

এর শুরুতে হযরতুল উস্তাযের লিখিত ভূমিকায় যে সতর্কবাণী ও পথনির্দেশনা রয়েছে তা আমাদের বারবার পড়া উচিত। অনুরূপভাবে তাঁর পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর কিতাব 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত'-এর ভূমিকাও পড়া উচিত। হাকীমুল উম্মত রহ.-এর বিভিন্ন মজলিসে লিখিত ফাওয়ায়েদ, যা মুফতী সাহেব রহ. নিজে নোট করেছিলেন, যখন সেগুলো প্রকাশ করার অনুরোধ করা হল, তো মুফতী সাহেব রহ. তা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন–এ ভূমিকায় তা বর্ণনা করা হয়েছে। বহুতই গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

১০. কিতাবের ওপর সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছেপে দেওয়া

কেউ যদি কোনো কিতাব তাসহীহ (সংশোধন-সম্পাদনা) না করে থাকেন, তাহলে তার অনুমতিক্রমেও সম্পাদক হিসেবে তার নাম দেওয়া জায়েয নয়। তেমনি ওই ব্যক্তির জন্যও এই ইজাযত দেওয়া নাজায়েয। আর আমি যে আদবের কথা আরয করতে চাচ্ছি তা হল, কেউ যদি আমার কিতাবের সংশোধন-সম্পাদনা করেনও তবুও ইজাযত ছাড়া সম্পাদক হিসেবে তার নাম উল্লেখ করা একেবারে অনুচিত কাজ।

আর মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার সম্পাদনার ভিত্তিতে কিতাবের মলাটে সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছেপে দেওয়া যে না-জায়েয কাজ–যারা এমনটি করে সম্ভবত তাদেরও জানা আছে।

১১. দাওয়াত দেওয়া ছাড়া প্রচার-পোস্টারে কারো নাম ছেপে দেওয়া

এটা কত বড় গোনাহ ও নির্লজ্জতা তা সুস্থ বোধ-বিবেকের অধিকারী যে কেউ অনুভব করতে পারেন।

১২. শুধু দাওয়াত দিয়েই নাম ছেপে দেওয়া

কাউকে শুধু দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো তিনি দাওয়াত কবুল করেননি, পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ করতে বলেছেন, এ অবস্থায় পোস্টারে তার নাম ছেপে দেওয়া কীভাবে জায়েয হয়? আর যদি তিনি দাওয়াত কবুল করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং পরিষ্কার ভাষায় ওজর পেশ করেন, এর পরও যদি তার নাম ছেপে দেওয়া হয়, তাহলে তো তা আরো বড় অন্যায়। বরং কিছু মানুষ তো এমন আছেন, যারা পোস্টার বা হ্যান্ডবিলে নাম প্রচার করা পছন্দ করেন না। এমন ব্যক্তি যদি দাওয়াত কবুলও করেন এরপরও তার নাম পোস্টার বা হ্যান্ডবিলে প্রচার করার জন্য আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করা

জরুরি। স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া এমন ব্যক্তিদের নাম ছেপে দেওয়া অনুচিত।

১৩. না জানিয়ে কাউকে মজলিসের আহ্বায়ক বানিয়ে দেওয়া

ইজাযতও নেওয়া হয়নি এমনকি জানানোও হয়নি, কিন্তু দাওয়াতনামায় কিংবা পোস্টারে তাকে মজলিসের আহ্বায়ক হিসেবে পেশ করা হয়েছে–এমনো ঘটনা ঘটে থাকে আমাদের সমাজে। এও স্পষ্ট অন্যায় এবং নাজায়েয কাজ।

১৪. মজলিসে শুধু উপস্থিত রয়েছে বলে আলোচনায়ও দখল দেওয়া

কোনো মজলিসে বসার ইজাযত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আমি ওই মজলিসের আলোচনায়ও শামিল হয়ে যাব। এ জন্য আলাদা অনুমতির প্রয়োজন। আমি ছোট। বড়দের মজলিসে বসেছি। তো এক্ষেত্রে সাধারণ আদব হল, বড়দের কথা ও হাসি-ঠাট্টায় শরিক না হওয়া; বরং আদবের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকা। আমার প্রতি খাস নির্দেশ না এলে কথা না বলা।

১৫. খাস দরসে বসে যাওয়া

এক হল আম দরস, যা সবার জন্য উন্মুক্ত; এর কথা ভিন্ন। কিন্তু খাস দরস, খাস মজলিস বা খাস আলোচনায় আমাকে ডাকা ছাড়া বা আমি ওই মজলিসের সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি হওয়া ছাড়া মজলিসে বসে যাওয়া–এটা শুধু অনুচিতই নয়, না-জায়েযও বটে। মজলিসে বসার বেশি আগ্রহ থাকলে অনুমতি চাইব, অনুমতি মিললে বসব, নইলে বিরত থাকব।

১৬. কারো অপ্রকাশিত কোনো লেখার পাণ্ডুলিপি ফটোকপি করে নেওয়া।

১৭. কারো ডায়েরি পড়া।

১৮. কারো চিঠি পড়া।

১৯. কেউ কোনো কিছু লিখছে, তার অজান্তেই তা দেখতে থাকা। বিশেষ করে যদি সে চিঠি লেখে।

২০. কারো ব্যক্তিগত কিতাব মুতালাআর জন্য উঠিয়ে নেওয়া।

২১. কারো ব্যক্তিগত সামান ব্যবহার করা।

এ ধরনের আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে ইজাযত নেওয়া জরুরি। কিন্তু আমরা ইজাযত ছাড়াই এগুলো করতে থাকি। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেদায়েত নসীব করুন। এ জাতীয় সকল অনুচিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন!#

[ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঈ.]

‘বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ...’

জুমার নামাযে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়া (هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ) তেলাওয়াত করতেন। কখনো প্রথম রাকাতে পড়তেন সূরা জুমুআ, যে-ই সূরার শেষের দিকে আছে এই আয়াত–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ...

আর দ্বিতীয় রাকাতে পড়তেন এর পরের সূরা, যার শুরু হল–

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ...

এই সূরায় আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের নিন্দা করেছেন। সেজন্য এ সূরার নামই হয়েছে সূরা মুনাফিকূন।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, তা সূরা আ'লার শেষ অংশ–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

‘সফলতা অর্জন করেছে সে-ই, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের নাম নিয়েছে ও নামায পড়েছে। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও অথচ আখেরাত কত বেশি উৎকৃষ্ট ও কত বেশি স্থায়ী। নিশ্চয়ই এ কথা পূর্ববর্তী (আসমানী) গ্রন্থসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে– ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।’

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের অবস্থা বলছেন–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.

তোমরা তো পবিত্রতার রাস্তা ধরছ না। দেহ-মনের পবিত্রতা, চিন্তার পবিত্রতা, চোখের জবানের আমলের পবিত্রতা, পবিত্রতা অবলম্বন করছ না। যিকির ও সালাতের রাস্তা ধরছ না, বরং তোমরা তো পার্থিব জীবনকে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দাও। وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ অথচ উত্তম হল আখেরাত।

আখেরাতের জীবনই উত্তম। اَبْقٰى; এবং চিরস্থায়ী, যার শুরু আছে শেষ নেই।

এ জীবন তো ক্ষণস্থায়ী। আগেও আমি ছিলাম না। পরেও থাকব না। মাঝখানে কিছু দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের অবস্থা হল, তোমরা প্রাধান্য দাও দুনিয়ার জীবনকেই। অথচ আখেরাতের জীবনই হল উত্তম এবং সেই জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। তাহলে কোনটাকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার? আখেরাত।

এখানে আমরা খেয়াল করি, আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেননি যে, তোমরা তো দুনিয়া নিয়ে আছ। দুনিয়া কামাই কর, দুনিয়ার চিন্তায় থাক–এ কথা বলেননি। কারণ, এটা নিন্দনীয় নয়। দুনিয়ার চিন্তায় থাকা, দুনিয়া উপার্জন করা, দুনিয়ার কাজকাম করা–এগুলো খারাপ কিছু নয়। এর ওপর আল্লাহ তাআলার কোনো আপত্তি নেই। এর ওপর আল্লাহ তাআলা আপত্তি করবেনও না। বরং তিনি বলেছেন, দুনিয়াতে তোমাদের যখন থাকতে দিয়েছি, মওত পর্যন্ত তোমাকে দুনিয়াতে থাকতে হবে; কবরের জীবনের আগ পর্যন্ত তো তোমাকে এই জমিনেই টিকে থাকতে হবে। এখানে থাকার জন্য যা জরুরত তা তুমি অর্জন করবে। এর তো আল্লাহ তাআলা কোনো নিন্দা করেন না। এজন্যই তো 'তোমরা দুনিয়া নিয়ে আছ'–এ কথা বলেননি, বরং বলেছেন, 'তোমরা দুনিয়াকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দাও।' প্রাধান্য দেওয়াটা হল আপত্তির বিষয়। দুনিয়ার পিছে পড়ে আখেরাত ভুলে যাওয়া–এটা আপত্তির বিষয়। এটা করো না তোমরা।

দুনিয়ার বৈধ সব কর, আখেরাতকে ভুলে নয়। আখেরাতকে স্মরণ রাখ। আখেরাতের জন্য দুনিয়া থেকে কামাই কর।

আচ্ছা, দ্বীন-শরীয়ত মানে না বা ইসলামই মানে না বা কালেমা পড়েছে ঠিকই কিন্তু দ্বীন-শরীয়ত, ইসলামের বিধিবিধানের কোনো খোঁজ-খবর নেই–এমন একজনকে দেখুন। আরেকজন দ্বীনদার লোককে দেখুন। এই দুজনের মধ্যে তুলনা করুন। পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য কি এই– যে দ্বীনদার সে খায় না, অপরজন খায়? যে দ্বীনদার সে ঘুমায় না, অপরজন ঘুমায়? যে দ্বীনদার সে ব্যবসা-বাণিজ্য করে না, অপরজন করে?!

অথবা একজন লোকের মাঝে যখন পরিবর্তন আসে, প্রথমে কোনো পরোয়া ছিল না দ্বীন-শরীয়তের, কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধানের। পরে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে কোনো আল্লাহ-ওয়ালার সান্নিধ্যে গেল বা তার বন্ধু-বান্ধব কেউ তাকে আদর-যত্ন করে হজে নিয়ে গেল বা কোনো তাবলীগী

ভাইয়ের তাশকিলে তিন চিল্লা সময় লাগাল; মোটকথা কোনো না কোনো মাধ্যমে তার মাঝে পরিবর্তন এল। তো এই ব্যক্তির পরিবর্তনের আগের আর পরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য খোঁজেন, পার্থক্য কোথায়? পরিবর্তনের পর সে কি খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত ছেড়ে দিয়েছে? না সব ঠিক আছে? এর অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কুরআন-সুন্নাহয় এমন কোনো বিধান দেননি, যার কারণে আমরা সংকটে পড়ব। সব স্বাভাবিক বিধান। আপনার দুনিয়ায় চলাফেরা, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক থাকবে। পার্থক্য শুধু এই হবে যে, আগে আমি হালাল-হারামের তোয়াক্কা করতাম না, এখন হালাল-হারামের তোয়াক্কা করি। আগে কোনো বাছ-বিচার ছিল না, যা সামনে এসেছে তাই করেছি। যা-ই পেয়েছি তা-ই গ্রহণ করেছি। এখন অবৈধটা নেব না, আরেকজনের ওপর জুলুম করব না।

আমি বুঝি প্রস্রাব-পায়খানা দুর্গন্ধ, খারাপ। শরীয়তে এগুলো কি শুধু নাপাক; শরীরে লাগলে ধুয়ে ফেলতে হবে এইটুকু? নাকি ভক্ষণও না জায়েয–এ মাসআলা কি বলা লাগে? কিন্তু মাসআলা তো আছে– এগুলো খাওয়া জায়েয নয়। হারামের তালিকায় আছে। কিন্তু এটা কি কাউকে বলতে শুনেছেন? শুনেননি। কারণ, এটা কাউকে বলে দেওয়া লাগে না। এটা এমনিতেই বুঝি। কিন্তু আরো কিছু বিষয় আছে, যেটা আমি বুঝি না বা বুঝলেও বিবেক অনুযায়ী চলি না। আমার বিবেক ঠিকই বলছে এটা খারাপ, কিন্তু আমি বিবেক অনুযায়ী চলি না, জযবার তালে চলি, নফসের খাহেশের তালে চলি। প্রবৃত্তির তালে চলি।

ঘুষ দেওয়া-নেওয়া হারাম। প্রস্রাব-পায়খানা ভক্ষণ যেমন হারাম, তেমনি ঘুষ দেওয়া-নেওয়া হারাম, সুদ দেওয়া-নেওয়া হারাম। (শব্দ দুটি উচ্চারণ করতে, শুনতে খারাপ লাগে। সে জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।) এ দুটোর নাম শুনতেই আমাদের কাছে খারাপ লাগে। আলোচনা করতেও খারাপ লাগে। কিন্তু এগুলোর চেয়ে লাখো গুণে বেশি ঘৃণিত হল সুদ আর ঘুষ। সুদ আর ঘুষের মধ্যে কী পরিমাণ দুর্গন্ধ যদি তা অনুভব করার শক্তি আল্লাহ তাআলা দিয়ে দেন বা আল্লাহ তাআলা যদি এগুলোর দুর্গন্ধ আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেন তাহলে ...। হাঁ, আখেরাতে তো সব দুর্গন্ধ প্রকাশ পেয়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার জায়গা, এখানে আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করেন না। এখানে নবী-রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা নিচ্ছেন– আমার কথা কে শুনে, এটা আমি দেখব। এজন্য আল্লাহ তাআলা যত ধরনের পাপ আছে

এগুলোর ভয়াবহতা, ওগুলোর দুর্গন্ধ প্রকাশ করেন না। কিন্তু যার আকল আছে, আল্লাহ তাআলা যাকে বিবেক দান করেছেন সে বুঝে এগুলো প্রস্রাব-পায়খানা থেকে লাখো গুণ বেশি দুর্গন্ধযুক্ত, বেশি খারাপ, বেশি ঘৃণিত। আর আল্লাহ তাআলা সেই জিনিসগুলোই হারাম করেছেন।

তো যে মুমিন কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক চলে তার মাঝে আর অন্যদের মাঝে পার্থক্য হল, অন্যজন হালাল-হারামের পার্থক্য করে না, মুমিন হালাল-হারামের পার্থক্য করে। সে খারাপ কাজ করে, অপরাধ করে; মুমিন কোনো খারাপ কাজ করে না, কোনো অপরাধ করে না। সে আরেকজনের ওপর জুলুম করে, মুমিন কারো ওপর জুলুম করে না। মুমিন বলে–

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

জুলুম তো অন্ধকার। কেয়ামতের দিন মুক্তির কোনো রাস্তাই খুঁজে পাব না যদি অন্যের ওপর জুলুম করি। জুলুম মানে অত্যাচার, আর জুল্‌মাতুন মানে অন্ধকার। শব্দের মিল আছে। 'জুলুম' 'জ' 'লাম' 'মীম' দিয়ে, এর সঙ্গে 'তা' যোগ করে 'জুল্‌মাতুন' মানে অন্ধকার। বহুবচন হল জুলুমা-তুন। তুমি একজনের ওপর একটা জুলুম করেছ। এই একটা জুলুম অনেক অনেক অন্ধকার হয়ে দাঁড়াবে তোমার জন্য, কবরে, হাশরে। তুমি মুক্তির রাস্তা খুঁজে পাবে না। তো আমি জুলুম করব না, আরেকজনের হক নষ্ট করব না, আমার বোনের হক ধরে রাখব না, স্ত্রীর মোহর ধরে রাখব না। আরেকজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছি, সে ঋণ দিয়ে দয়া করেছে, দেওয়ার তাওফীক আছে তাও দিচ্ছি না বা অস্বীকার করে বসে আছি বা কিছু দিয়ে বললাম, আর দিতে পারব না। মুমিন এমন করে না। মুমিন রিকশাওয়ালার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, বাসের লোকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, ভাড়া ঠিকমতো দিয়ে দেয়। কিছু লোক আছে খামোখা তর্ক করে, বলে এত ভাড়া না। হেলপার কন্ট্রাকটররা যেন মানুষই না; সিটে যিনি বসে আছেন তিনিই বাবু। এই যে আরেকজনকে মানুষ মনে না করা, এটা বিরাট অন্যায়। তোমাকেও তো আল্লাহ তাআলা তার স্থানে রাখতে পারতেন। কেন তুমি ভালো ব্যবহার কর না? ঘরের বুয়াদের সঙ্গে কেন ভালো ব্যবহার কর না? নিজের মেয়ের সঙ্গে মহিলারা ভালো ব্যবহার করে, ছেলের জন্য বউ আনবে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে না। নিজের মেয়েকে এক দৃষ্টিতে দেখে, ছেলের বউকে আরেক দৃষ্টিতে দেখে।

তো তওবা করার আগে ও পরে যে পার্থক্য হবে তা হচ্ছে খারাপ কাজগুলো,

অপরাধগুলো ছেড়ে দেবে নতুবা সংসার এরও আছে ওরও আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য এরও আছে ওরও আছে। এও খাচ্ছে, সেও খাচ্ছে। এও ঘুমাচ্ছে, সেও ঘুমাচ্ছে। কোনো পার্থক্য নেই। দুনিয়া কেউ ছাড়েনি। দ্বীনের ওপর আসতে হলে কখনো দুনিয়া ছাড়তে হয় না। শুধু আল্লাহ তাআলা যেগুলো অপরাধ বলেছেন, পাপ বলেছেন, গোনাহ বলেছেন ওগুলো ছেড়ে দেবে। এগুলোর ওপর তোমার কোনো কিছু মওকুফ না, নির্ভরশীল না। দুনিয়াতে শান্তি পাওয়া কি ওগুলোর ওপর মওকুফ? না ওগুলো আরো অশান্তি টেনে আনে!

আল্লাহ তাআলা এ কথাই বলেছেন–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى.

(হে আমার বান্দারা! আমি দেখছি) তোমরা তো দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে চলছ। প্রাধান্য দিতে হবে আখেরাতকে।

আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার অভিযোগ শুধু একটা– তোমরা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছ কেন? তোমাদের তো দুনিয়ার জন্য বানাইনি। দুনিয়াতে রেখেছি আখেরাতের জন্য। দুনিয়াকে কেন প্রাধান্য দিচ্ছ। তোমার প্রাধান্য দিতে হবে আখেরাতকে।

প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ কী? আমি দোকানে আছি। ব্যবসা-বাণিজ্য করছি। যোহরের আযান হল, মসজিদে যাওয়া দরকার, দোকানে আর কেউ নেই, হিম্মত তো করা দরকার, আমি দোকান বন্ধ করে মসজিদে যাই, নামাযের পরে আবার দোকান খুলি। চল, এমন হিম্মত না থাকলে তুমি দোকানেই অন্তত চার রাকাত ফরয আদায় করে নাও। কিন্তু আসরের আযান হয়ে গেছে, আমি যোহরের চার রাকাত ফরযও আদায় করিনি। কাকে প্রাধান্য দিলাম? দুনিয়াকে। এটাকে বলে প্রাধান্য দেওয়া। চার রাকাত ফরয নামাযেরও যদি সময় বের করতে পারতাম তাও আল্লাহ তাআলা বলতেন না– তুমি দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছ। ঠিক আছে, বান্দা ফরয তো আদায় করেছে।

পিতা জায়গা-জমি রেখে গেছেন। ভাইয়েরা ভাগ করে নিল। দুজন বোন আছে তাদের। তাদেরকে তো আল্লাহ তাআলা একটি অংশ দিয়েছেন। ওরা আপনার পিতার সন্তান, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা একটি নির্ধারিত অংশ রেখেছেন। ভাইয়েরা তাদের অংশ দিল না। এখন তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে অংশ বরাদ্দ রেখেছেন তা তাদের দাও। কিন্তু তা তোমরা দখল করে বসে আছ। এটা হল দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া আখেরাতের ওপর।

আপনি কবিতা আবৃত্তি করুন, আনন্দ করুন। কিন্তু আনন্দ-ফুর্তির নামে আপনি একেবারে গান-বাদ্য শুরু করলেন। আনন্দ-ফুর্তি তো আল্লাহ আপনার জন্য বৈধ করেছেন, কিন্তু আপনি এখন এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন, দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছেন আখেরাতের ওপর। এই গান-বাদ্য আখেরাতে আপনার জন্য কালসাপ হয়ে দাঁড়াবে!

বলবেন, হুজুর আপনি গান-বাদ্য না শোনার ওয়াজ করেন; আমরা তো এসব দেখি। ঘরের মধ্যে সব ব্যবস্থা রেখেছি। ঘরে নয় বরং পকেটে এসবের ব্যবস্থা আছে। সবকিছু হাতের মুঠোর মধ্যে। আপনি কী ওয়াজ করবেন! আমি তো এত লজ্জিত হই; যখনই বয়ানের জন্য বসি, নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কী বয়ান করব। পাপের সরঞ্জাম সব হাতের মধ্যে। দুনিয়ার যত অশ্লীলতা আছে এতে সব দেখে, সব শুনে। আল্লাহ তাআলা কি এজন্য মোবাইল দিয়েছেন? এটি তো একটি নেয়ামত। এই নেয়ামত আল্লাহ তাআলা এজন্য দেননি। তা দিয়েছেন, এর দ্বারা মা-বাবার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য; মা কেমন আছেন। এর দ্বারা মায়ের দুআ নেবে বা কোনো উপকারী তথ্য সংগ্রহ করবে। নেটে আছে, নেট থেকে তথ্য সংগ্রহ কর। আল্লাহ তাআলা কি গান শোনার জন্য এই নেয়ামত দিয়েছেন? অশ্লীল কিছু দেখার জন্য দিয়েছেন?

তো যে-ই এগুলোর ভুল ব্যবহার করবে, আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করবে, সে-ই দুনিয়াকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিল। প্রয়োজনে ব্যবহারের ওপর আল্লাহর কোনো আপত্তি নেই। মানুষের সেবার জন্য এটা ব্যবহার করুন, কোনো আপত্তি নেই। গবেষণা ও ভালো কাজে ব্যবহার করুন, কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু অশ্লীলতার জন্য ব্যবহার করবেন, অন্যের ক্ষতি করার জন্য ব্যবহার করবেন, এতে আপত্তি আছে।

এটাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى.

তোমরা তো দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে চলছ। আখেরাত হল উত্তম ও চিরস্থায়ী। এর শুরু আছে শেষ নেই। আখেরাতের খেয়াল রাখ।

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى. صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى.

আল্লাহ তাআলা বলছেন– হে উম্মতে মুহাম্মদী, এই ওয়াজ এই উপদেশ-নসীহত আমি শুধু তোমাদের দিচ্ছি না, এ কথা আগের উম্মতদের বলে

এসেছি। সবার জন্য এ কথা ছিল। দুনিয়াতে থাক, দুনিয়া ভোগ কর, আপত্তি নেই। তবে আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ো না। যেখানে দুনিয়া ও আখেরাতে টক্কর হবে; দুনিয়ার যে ব্যবহার আখেরাতকে নষ্ট করে দেবে, আখেরাতে জাহান্নামী বানাবে সেক্ষেত্রে আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়ো দুনিয়ার ওপর। কারণ, সে দুনিয়া তোমার প্রয়োজনের দুনিয়া নয়, তোমাকে বরবাদ করার দুনিয়া। প্রয়োজনের কোনো কিছু আল্লাহ তাআলা হারাম করেননি। প্রয়োজনের কোনো কিছুর দ্বারা আখেরাত নষ্ট হয় না। আখেরাত নষ্ট হয় দুনিয়ার অন্যায় ব্যবহারের দ্বারা।

তো আল্লাহ তাআলা বলেন, এ কথা সবাইকে বলে এসেছি–

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى. صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى.

আগের উম্মতের হেদায়েতের জন্য যত কিতাব দেওয়া হয়েছে, সবগুলোতে এ নসীহত ছিল। ইবরাহীমের কিতাব, মূসার কিতাব, যাকে যে কিতাব দিয়েছি হেদায়েতের জন্য, সবগুলোতে এ কথা ছিল। যদিও ওগুলোর সংরক্ষিত কপি থাকেনি। ইহুদি-নাসারারা সংরক্ষিত রাখেনি। বিকৃত করে ফেলেছে। ইঞ্জিল নামে, বাইবেল নামে বিভিন্ন ভাষায় যা এখন প্রচার করে, সেটা আল্লাহর নাযিলকৃত তাওরাত-ইঞ্জিল নয়। যে ইঞ্জিল আল্লাহ নাযিল করেছেন, যে তাওরাত আল্লাহ নাযিল করেছেন, এর কিছু কথা এতে খুঁজে পাবেন আর সব বিকৃত ও বর্ধিত। কিন্তু যেটা আল্লাহ নাযিল করেছিলেন তাতে এগুলো ছিল। এই নসীহত আগের উম্মতদেরকেও আল্লাহ বলেছেন, এই উম্মতকেও বলেছেন। এই উম্মত হল শেষ উম্মত। শেষ নসীহত আল্লাহ তাআলা করে দিয়েছেন কুরআনে। আল্লাহ তাআলা আমাদের কুরআন শেখার, কুরআন বুঝার, কুরআন মোতাবেক আমল করার, কুরআনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার তাওফীক নসীব করুন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আখেরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।#

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[এপ্রিল ২০১৬ ঈ.]

বরকত হাসিল করা, নাকি মানুষকে কষ্ট দেওয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى...

ইসলাম 'ইসতিসলাম' ও 'সিল্‌ম' তথা সমর্পণ ও শান্তির ধর্ম। অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সামনে সমর্পিত হওয়া, আল্লাহ তাআলার বিধানের সামনে নতশীর হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়া থেকে শান্তিতে ও নিরাপদে রাখা। এটা ইসলামের বুনিয়াদি তালীম ও মৌলিক শিক্ষা। ইসলাম বড় জামে এবং কামেল (যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ) দ্বীন। এতে রয়েছে স্রষ্টার হক এবং সৃষ্টির হকের অপূর্ব সম্মিলন। ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম। যা সব ধরনের প্রান্তিকতা, বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা থেকে মুক্ত। এর যাবতীয় বিধান পরিপূর্ণ ইনসাফ ও মধ্যপন্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামের বড় সৌন্দর্য এই যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে আবেগ ও জযবার অনুগামী না হয়ে নিজের আবেগ ও জযবাকে শরীয়তের বিধানের অধীন বানানোর জোর হুকুম করে।

ইসলামের আরেকটি বড় সৌন্দর্য এই যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অতি গুরুত্বের সঙ্গে فِقْهُ الْأَوْلَوِيَّاتِ-এর নীতি ও বিধান মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়। فِقْهُ الْأَوْلَوِيَّاتِ অর্থ, শরীয়তের সেসব শিক্ষা ও তালীম, যেগুলোর আলোকে ব্যক্তি এটা নির্ধারণ করতে পারে যে, কোন বিধান থেকে কোন বিধান অগ্রবর্তী, কোন দায়িত্ব থেকে কোন দায়িত্ব অগ্রবর্তী, কোন অধিকার থেকে কোন অধিকার অগ্রবর্তী। করার মতো অনেক কাজ জমা হয়ে গেলে কোনটা করব আর কোনটা ছাড়ব বা কোনটা আগে করব আর কোনটা পরে।

এ জন্যই ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, সৌভাগ্য অর্জন করা এবং বরকত হাসিল করা ভালো কাজ। কিন্তু নিজে সৌভাগ্য অর্জন করতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি করা জায়েয নয়। নিজে বরকত হাসিল করতে গিয়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া জায়েয নয়। তেমনি সৌভাগ্য অর্জন করতে গিয়ে দায়িত্বে ত্রুটি করাও জায়েয নয়।

মুস্তাহাব আমলের জন্য গোনাহের কাজ করা, মুস্তাহাব পালনের জন্য মানুষকে

কষ্ট দেওয়া এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে ফেলা, এসব মুমিনের শান হতে পারে না। ইসলাম কখনোই এরকম শিক্ষা দেয় না।

বিষয়টি যদি এমনই হয়ে থাকে, আর কোনো সন্দেহ নেই যে বিষয়টি এমনই, তাহলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে আমাদের নিজেদের অবস্থা যাচাই করে দেখা উচিত :

১. মুসাফাহার জন্য ভিড় করা

কোনো বুযুর্গ এলে তাঁর সঙ্গে মুসাফাহার জন্য ভিড় করা, ধাক্কাধাক্কি করা, এমনকি বুযুর্গের নিরাপত্তা পর্যন্ত ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া, মুসাফাহার জন্য আসা শিশু ও বৃদ্ধদের পর্যন্ত খেয়াল না রাখা, এসব কি কখনো ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

বিশেষ করে মুসাফাহা যদি সাক্ষাতের মুসাফাহা না হয়, সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ার পর শুধু বরকত হাসিলের জন্য বা সৌভাগ্য অর্জনের জন্য অথবা শুধু 'নিসবত' তৈরি করার জন্য বা শুধু মহব্বত প্রকাশের জন্য আলাদাভাবে মুসাফাহা করা হয়, তাহলে প্রথমত এই ধরনের মুসাফাহা সুন্নত তো কখনোই নয়। আপত্তিকর কোনো কিছু না থাকলে একটি মুবাহ কাজ মাত্র। কিন্তু একটি মুবাহ কাজের জন্য শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, মানুষকে কষ্ট দেওয়া, নিজেও কষ্টের মধ্যে পড়ে যাওয়া, এগুলোর শরয়ী বিধান কী? সামান্য আকল-বুদ্ধি রাখে এমন কোনো মুসলিমেরও কি এই বিষয়টি বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে? কখনোই নয়। আসল বিষয় হল, আমরা আমাদের আবেগ ও জযবা নিয়ন্ত্রণ করা শিখিইনি। জযবার মোকাবেলায় শরীয়তের বিধানের প্রতি খেয়াল রাখা, জযবার মোকাবেলায় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের (যারা আমীরের হুকুমে) আনুগত্যের প্রতি খেয়াল রাখা, যা ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, এসব বিষয় আমলে আনার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো পরোয়াই যেন নেই। এটাই আমাদের সমস্যা। অন্যথায় এত সহজ-সরল, সুস্পষ্ট মাসআলা কার না জানা আছে, মুস্তাহাব বা মুবাহ কাজের জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা জায়েয নয়। ভিড়-ভাড় সৃষ্টি করা জায়েয নয়। কাউকে কষ্ট দেওয়া, নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলা জায়েয নয়। আর আমি যেখানেই যাব সেখানকার দায়িত্বশীলের আনুগত্য আমার ওপর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। শুধু গোনাহের কাজে কারো আনুগত্য হতে পারে না। এ ছাড়া সাধারণ অবস্থায় আমীর বা আমীরের নায়েবকে অমান্য করা কখনোই জায়েয নয়।

জানা কথা যে, কোনো মুস্তাহাব বা মুবাহ কাজ ছেড়ে দেওয়া গোনাহের কিছু নয়। এমনিভাবে কোনো কাজে আমার বরকত বা সৌভাগ্যের আশা আছে এমন কাজ ছেড়ে দিতেও কোনো গোনাহ নেই। কিন্তু এ ধরনের কাজে আমি যদি মেহমান বুযুর্গ অথবা দায়িত্বশীলদের হুকুম অমান্য করি, তো সেটা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয। আবার সেটা যদি হয় গলদ তরিকায়, অর্থাৎ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বা কাউকে কষ্ট দিয়ে বা নিজেকে ঝুঁকির মুখে ফেলে!

২. মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখার জন্য ভিড় করা

অনেক অনুসন্ধানের পরও এখনো পর্যন্ত আমরা এমন কোনো দলিল পাইনি, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় মৃত ব্যক্তি, চাই তিনি কোনো বুযুর্গ বা বড় ব্যক্তিত্বই হোন না কেন, মৃত্যুর পর তার চেহারা দেখার মধ্যে বিশেষ কোনো ফযীলত বা সওয়াব আছে, যে দলিলের ওপর ভিত্তি করে এই কাজকে অন্তত মুস্তাহাব বলা যাবে। এটা বেশির চেয়ে বেশি মুবাহ কাজ। কেউ যদি একে বিশেষ ফযীলতের কাজ মনে করে অথবা কোথাও একে রসম বানিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে এটা বেদআতের সীমায় চলে যাবে।

সুতরাং মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখানোর জন্য জানাযার নামায বিলম্ব করা, দাফনকাজ বিলম্ব করা কখনোই জায়েয নয়। আর চেহারা দেখার জন্য শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, ভিড় করা, ঠেলাঠেলি করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া, নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া, এসব কাজ তো আরো আগে নাজায়েয। কিন্তু চিন্তা করুন তো, বুযুর্গদের মৃত্যুতে আমরা কীরূপ আচরণ করি? কীভাবে আমরা ওই সময় শরীয়তের বিধিবিধান ভুলে যাই? কীভাবে আমরা এসব ক্ষেত্রে আবেগকে শরীয়তের ওপর, এমনকি আকলের ওপরও প্রাধান্য দিতে থাকি?

৩. খাটিয়া ওঠাতে গিয়ে ভিড় করা

মাইয়েতের খাটিয়া ওঠানো সওয়াবের কাজ। কিন্তু এখানেও একই কথা, সওয়াব হাসিলের জন্য ভিড় সৃষ্টি করা কি ঠিক? খাটিয়া ধরার জন্য এমন ভিড় লাগিয়ে দেওয়া যে, এদিক সেদিক ধাক্কাধাক্কিতে খাটিয়া পড়ে যাওয়ারই উপক্রম হয়। কখনো খাটিয়া কারো মাথায় লাগে। ভিড়ের মাঝে কারো ওপর পড়ে গিয়ে তার পায়ে বা জুতায় আমার পা পড়তে পারে। এই ভিড়ের মধ্যে কখনো রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মানুষজনের চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটে। এগুলো তো জায়েয নয়। আর যদি মজমা এত বড় হয় যে, প্রত্যেকে জানাযা বহনের সৌভাগ্য অর্জন করতে গেলে জানাযার

নামায বিলম্ব বা দাফনকাজ বিলম্ব হবে, তাহলে তো এটা আরো বেশি নাজায়েয কাজ।

৪. কবরে মাটি দেওয়ার জন্য ভিড় করা

কবরে এক মুঠ, দুই মুঠ, তিন মুঠ মাটি দেওয়া দাফনে শরিক হওয়ার একটি তরিকা। দাফনে শরিক হতে পারা সৌভাগ্যের বিষয় এবং সওয়াবের কাজ। কিন্তু অনেকে ধারণা করে থাকে, এক দুই মুঠ মাটি দেওয়ার মাঝে আলাদা কোনো ফযীলত আছে, এই ধারণা ঠিক নয়। এখানে দেখার বিষয় হল, দাফনে শরিক হতে গিয়ে আমি যদি দাফনের জিম্মাদারিতে যে ভাইয়েরা আছেন তাদের সমস্যা বা কষ্টের কারণ হই, তাহলেও কি এই কাজে আমার সৌভাগ্য লাভ হবে? দাফনে শরিক হওয়ার সওয়াব পাওয়া যাবে? তা ছাড়া মাটি দিতে গিয়ে যদি এমন ভিড় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করি, যাতে নিজেরও কষ্ট হয় অন্যকেও কষ্ট দেওয়া হয়, এমনকি কবর ভেঙে পড়ারই উপক্রম হয়, তাহলেও কি এতে সওয়াবের আশা করা যায়?

এটাও তো একটু ভেবে দেখা উচিত, এসব কাজ (মুসাফাহা করা, মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখা, জানাযার খাটিয়ায় হাত লাগিয়ে শরিক হওয়া এবং কবরে মাটি দেওয়ায় শরিক হওয়া) এগুলো যদি এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় যে, বড় মজমাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এতে শরিক হতেই হবে, তাহলে আমাদের চিন্তা করা উচিত, এর পদ্ধতি কী হওয়া চাই? কোনো সন্দেহ নেই, এর একমাত্র পদ্ধতি এটাই যে, প্রত্যেকে কাতারবন্দী হয়ে আসবে, আসার সময় এক পথে আসবে, কাজ শেষ করে যাওয়ার সময় আরেক পথে যাবে, কেউ উল্টো পথে আসবে না, সেই জায়গায় কেউ দাঁড়িয়েও থাকবে না। কিন্তু আমরা কি এখন এসব নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি কোনোরূপ লক্ষ্য রাখি? যা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এবং যে শিক্ষা 'মাহাসিনে ইসলাম' (ইসলামের সৌন্দর্য)-এর অন্তর্ভুক্ত। বড় মজমা কী, আমরা তো পঞ্চাশ-ষাটজনের, বরং ত্রিশ-চল্লিশজনের মজমাতেই শৃঙ্খলা রক্ষা করি না। বিশৃঙ্খলা করি। এটা কি মুমিনের শান, যার দ্বীন হল এমন দ্বীন যা থেকে অন্য ধর্মের লোকেরাও নিয়ম-শৃঙ্খলা বিন্যস্ততা ও পরিপাটির সবক নিয়েছে?

আমরা কেন চিন্তা করি না যে, ওপরের কোনো কাজই হাজরে আসওয়াদকে 'স্পর্শ' করা বা চুম্বন করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বেশি বরকতপূর্ণ এবং অধিক সওয়াবের কাজ নয়। হাজরে আসওয়াদের ক্ষেত্রেই যখন ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে গিয়ে

ধাক্কাধাক্কি করা ঠিক নয়, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে গিয়ে একজন মানুষকে কষ্ট দেওয়া বা নিজেকে কোনো প্রকার ঝুঁকিতে ফেলা জায়েয নয়, তারপরও আমরা জীবিত বুযুর্গদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এবং ইন্তেকাল করে যাওয়া বুযুর্গদের বিদায় দেওয়ার সময় এই ধরনের কাজ কেন করি? কেন আমরা নিজেদের আবেগ ও জযবাকে শরীয়তের অধীন বানাই না? কেন আমরা নিজেদের কর্মে ও আচরণে ইসলামের শিক্ষার মুখপাত্র হই না?

* * *

এই তো গত সোমবার (২৫ই যিলকদ ১৪৩৭ হিজরী মোতাবেক ২৯ই আগস্ট ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ) আমাদের উস্তায ও মুরুব্বী, আমাদের শায়েখ ও মুরশিদ হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى رَحْمَةً وَاسِعَةً আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভরপুর রহম করুন।

যদিও তিনি ছিলেন বড় যাহেদ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত এবং সম্পূর্ণ প্রচার-প্রচারণা-বিমুখ, তা সত্ত্বেও তাঁর মকবুলিয়ত, মাহবুবিয়ত এবং তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল এটা যে, ওফাতের পর অল্প সময়ের ব্যবধানে জানাযার নামাযের সময় নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও, জানাযার স্থান শহর থেকে দূরে হওয়া সত্ত্বেও মানুষের এত সমাগম হয়েছে যে, তা কারো কল্পনাতেও ছিল না। আল্লাহ তাআলা সবাইকে এই মহব্বতের নেক প্রতিদান দান করুন, আমীন।

সেদিন আমি এত বড় মজমা দেখে যেমন খুশী হয়েছি, তেমনি বড় ব্যথিত হয়েছি যে, এই মজমায় আমরা আনুগত্য ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে পারিনি। ইসলামের فِقْهُ الْأَوْلَوِيَّاتِ-এর ওপর আমলের প্রমাণ দিতেও পারিনি। এ জন্যও অনেক আফসোস হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে কথা বলার মানুষ বেশি, শোনার মানুষ কম। মুতাকাল্লিম বেশি সামে কম। আর নামাযে তো সবাই যেন ছিল মুকাব্বির।

নীরব জানাযা না সরব জানাযা

জানাযা ও দাফনের সময় আখেরাতের ফিকিরে নিমগ্ন থাকার একটি পরিবেশ থাকে। কিন্তু এই মজমায় আমরা নীরবতাটুকুও বজায় রাখিনি। আওয়াজ শোরগোলের মধ্যেই ছিলাম। শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. 'আপবীতি'তে লিখেছেন, হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর জানাযায় এমন নীরবতা দেখা গেছে যে,

পশুপাখি পর্যন্ত নীরব হয়ে গিয়েছিল! হায়! আমরা যদি নীরবতার সবকটুকু হাসিল করতে পারতাম। প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলতাম। আওয়াজ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উঁচু না করতাম। আওয়াজ সীমার ভেতরে রাখার শিক্ষা তো ইসলাম বড় গুরুত্বের সঙ্গে দিয়েছে, কুরআন মাজীদে এবং সুন্নাহ ও সীরাতে। আমাদের পূর্বসূরিগণ তো এসব বিধানের ওপর আমলের নমুনাও আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

এই জানাযারই ঘটনা। দাফনের পর যখন মাদরাসাতুল মাদীনায় পৌঁছালাম, তখন মাদানী মঞ্জিল থেকে ইত্তেলা এল যে, কোনো অসুবিধা না থাকলে সামান্য সময়ের জন্য যেন ওখানে হাজির হই। উদ্দেশ্য ছিল এতটুকু যে, তাঁর ধারণায় কবরে অন্তত এক মুঠ মাটি দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়ে থাকবে। তাই তিনি আমাকে এক নজর দেখতে চাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমি কবর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারতাম, কিন্তু অন্যদেরকে কষ্ট দেওয়া আমার পছন্দ হয়নি। এজন্য দূরেই বসে ছিলাম। অথচ মরহুমের ছেলেদের পরে তিনিই হয়ত কবরে মাটি দেওয়ার এবং কবরে নামার সবচেয়ে বেশি হকদার ছিলেন অথবা বলি, সম্ভবত তাঁরই এই সৌভাগ্যের অনুভূতি সবচেয়ে বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু নিজের আবেগের ওপর তিনি শরীয়তের বিধানকে অগ্রবর্তী করেছেন। নিজের সৌভাগ্যের ওপর অন্যের হককে অগ্রবর্তী রেখেছেন।

তিন চার দিন পরে নূরিয়ার কাদীম তালেবে ইলম, বর্তমানে জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামের সঙ্গে মুলাকাত হল। তিনি বললেন, জানাযার পর আমি মসজিদের সংলগ্ন ওই কামরায় গেলাম, যেখানে আদীব হুযুর বসা ছিলেন। আমি কিছুক্ষণ তার সামনে বসে ছিলাম। কিন্তু পরিবেশ এমন ছিল যে, তখন কোনো কথা বলা মুনাসিব মনে হয়নি, বরং সালাম-মুসাফাহারও হালাত ছিল না। এমনিতেই তো তিনি অসুস্থ, এর ওপর তার জন্য এত বড় ঘটনা। আমি কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে এলাম। কিছুই বললাম না।

আমরা কি আমাদের বড়দের এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব, না শুধু নিজেদের পছন্দমতো বড়দের প্রতি মহব্বতের প্রকাশ ঘটাতে থাকব?

আমাদের আচরণ থেকে মনে হয় না যে, আমরা নিজেদের ইসলাহ চাই। সেদিন মাদরাসাতুল মাদীনাহ থেকে নূরিয়ার মসজিদে আসার পথে হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ্‌র সঙ্গে যা কিছু হল তা থেকে তো এটাই প্রমাণ হয়!!

নূরিয়ার মাঠে তো তিনি পড়ে গিয়ে আহতই হতে যাচ্ছিলেন, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাকে হেফাজত করেছেন। এরচেয়েও বড় আফসোসের বিষয় হল, হুজুর যখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন তখন কিছু সাথী তাঁর দিকে মোবাইল ধরে রেখেছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন!! এমন কাজ কোনো তালেবে ইলমের পক্ষ থেকে এবং এমন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে?! যাঁর একটি মাত্র কথার কারণে পাকিস্তানী এক যুবক তৎক্ষণাৎই নিজের মোবাইল সেট ভেঙে ফেলেছিল। তওয়াফের হালতে ওই যুবক মোবাইলের ক্যামেরা চালু করে রেখেছিল। তিনি তাকে শুধু বললেন, 'ওপর থেকে আসমান-ওয়ালার হুকুমে আমাদের সবকিছু রেকর্ড করা হচ্ছে, সেখানে আমাদের চিত্র কেমন হবে সেটাই তো বোধহয় চিন্তা করা উচিত।' এ কথায় তার মনে এমন আসর হল যে, সে সঙ্গে সঙ্গে তার সেটটাই ভেঙে ফেলল। অথচ সম্ভবত সেই যুবক ইলমে ওহীর তালেবে ইলম ছিল না। কিন্তু আমরা কেন এত অনুভূতিহীন?!

এটাও শোনা গেছে যে, দোতলায় এবং ছাদের ওপরে যারা ছিল, তাদের অনেকের হাতে মোবাইল ছিল এবং তারা মোবাইলের ক্যামেরা মজমার দিকে তাক করে রেখেছিল। এদের মধ্যে যারা ছাত্র তারা কি আসলেই তালেবে ইলম? তালেবে ইলম এবং মোবাইল কি একত্র হওয়া সম্ভব? আবার তাও ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল?!

আমরা কি সেদিন সত্যিই কোনো বুযুর্গের জানাযা ও দাফনের জন্য এসেছিলাম নাকি কোনো অনুষ্ঠানে?! এরই নাম কি আখেরাতের ফিকির, এমন মুহূর্তে যা মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখার কথা?! আয় আল্লাহ! আমাদের অবস্থার ওপর রহম করুন। আমাদেরকে একটু অনুভূতি দান করুন, আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।#

[অক্টোবর ২০১৬ ঈ.]

ইসলামী আকায়েদই ঈমানের ভিত্তি

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার ওপর সবচেয়ে বড় ফরয হল ঈমান। ঈমান বান্দার ওপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় হক। ঈমানের পরিচয় হল, ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম মেনে কবুল করে নেওয়া। ইসলাম আকায়েদ ও আহকামের সমষ্টি। ইসলামের বর্ণিত সঠিক আকায়েদ, ইসলামের প্রদত্ত শরীয়ত মেনে নেওয়ার নাম ঈমান।

আকায়েদ মানা, ইসলামী শরীয়ত অস্বীকার করা অথবা শরীয়ত মানা, ইসলামী আকায়েদ অস্বীকার করা উভয়ই কুফর। এ কুফর থাকা অবস্থায় ইসলামের দৃষ্টিতে কাউকে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। যেমনটি আমি 'উম্মাহর ঐক্য' বইয়ে বিস্তারিত লিখেছি। শাখাগত মাসআলায় তো দলিলভিত্তিক মতবিরোধ সম্ভব। এমন মতবিরোধ হয়েছেও। ওই মতবিরোধের দরুন আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করবেন না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে মন্দ বলেননি। অবশ্য এ ব্যাপারে মতবিরোধের আদব-কায়েদা রক্ষা করতে আমরা বাধ্য এবং এ ধরনের মতবিরোধ ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যম যেন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

কিন্তু আকায়েদের ব্যাপারটি (মুমিন ও মুসলিম হওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো আন্তরিকভাবে স্বীকার করা এবং সেগুলো সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি) সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাতে দলিলভিত্তিক মতবিরোধের কল্পনাও করা যায় না। আকায়েদের বেলায় বিরোধ হয় সত্য-বিরোধীদের অন্যায় বিরুদ্ধাচরণ অথবা মূর্খতার কারণে। আকায়েদের ক্ষেত্রে বিরোধ আল্লাহ তাআলা মেনে নেননি। এক্ষেত্রে সবাইকে একমাত্র দ্বীন কবুল করে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণকারীদের জালেম, ফাসেক ও কাফের আখ্যায়িত করেছেন। সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন, পরকালে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

আল্লামা খালেদ মাহমূদের ভাষায়–

'ইসলামী আকায়েদে এ কথা অকাট্য যে, আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন একটাই। তা হল ইসলাম। এ হতে পারে না যে, অন্যান্য ধর্ম আপন

আপন জায়গায় সঠিক, সে মতবাদ অনুযায়ী চলেও পরকালে মুক্তি লাভ হবে। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান না এনে কেউ মুক্তি পাবে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয রা.কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় আহলে কিতাবদের ইসলামের দাওয়াত দিতে বলেছিলেন। সেসব দ্বীন আপন আপন ক্ষেত্রে মুক্তি দেওয়ার যোগ্য হলে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয রা.-কে এ নির্দেশনা দিয়ে ইয়ামান পাঠান–

إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلى شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

'তুমি আহলে কিতাবের (ইহুদি ও নাসারাদের) কাছে যাচ্ছ। প্রথম তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র সাক্ষ্য দেওয়ার দাওয়াত দেবে এবং এ কথার শাহাদত প্রদানের দাওয়াত দেবে– মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তারা এ কথা মেনে নিলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাআলা দিন ও রাতে তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।' –সহীহ মুসলিম ১/২৩৮, হাদীস ২৯; সহীহ বুখারী, ৮/৪৯৩, হাদীস ৪৩৪৭

ইমাম তহাবী রহ. 'আলআকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ' কিতাবে বিষয়টি এভাবে লেখেন–

وَدِيْنُ اللهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِيْنُ الْإِسْلَامِ، قَالَ اللهُ تَعَالٰى: اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ.

অর্থাৎ আসমান ও জমিনের অধিবাসী সবার জন্য আল্লাহ তাআলার মনোনীত দ্বীন একটিই। তা হল দ্বীনে ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন শুধু ইসলাম। (সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৯) –আলআকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ ৭৮৬

ইবনে হাযম যাহেরী রহ. লেখেন–

اَلْإِسْلَامُ دِيْنٌ وَاحِدٌ، وَكُلُّ دِيْنٍ سِوَاهُ بَاطِلٌ.

অর্থাৎ ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম। এ ছাড়া সব ধর্মই বাতিল। -আলমুহাল্লা, ইবনে হাযম ১/১০৪

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এই আকীদাকে পেশ করেছেন এভাবে-

مَنْ لَمْ يُقِرَّ بَاطِنًا وَظَاهِرًا بِأَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ دِيْنًا سِوَى الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.

অর্থাৎ যে অন্তর ও মুখে একথা স্বীকার করে না- আল্লাহর কাছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়, তাকে মুসলমান ধরা হবে না। -ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৭/৪৬৩

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, সকল ধর্ম হক হওয়ার মতাবলম্বীরা ইসলামের দাবি করা সত্ত্বেও মুসলমান নন। (আকায়েদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআ, মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের মাসউদের ভূমিকা ৪৫-৪৬ থেকে গৃহীত)

শাইখুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা সালীমুল্লাহ খান রহ.-এর ভাষ্য হল, মানুষের নিজস্ব বলতে কিছু নেই। অস্তিত্ব তার নিজস্ব নয়। বিবেক ও প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বোধ নিজস্ব নয়। শোনা, দেখা ও বলার শক্তিও নিজস্ব নয়। এ সবই খোদাপ্রদত্ত। নিঃস্ব এ মানুষের কাছে আছে শুধু শূন্যতা। এ শূন্যতা মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এ শূন্যতার মালিকও সে নয়।

আসলে আল্লাহ তাআলার পুরস্কার ও অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষকে এসব মূল্যবান নেয়ামতে ভূষিত করেছেন। বিবেকের সিদ্ধান্ত হল, পুরস্কারদাতা ও অনুগ্রহকর্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জরুরি। আর যে নেয়ামতদাতা এত উদারতার সঙ্গে অসংখ্য অগণিত নেয়ামত দিয়েছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় তো যে কোনো অনুগ্রহকর্তা ও নেয়ামতদাতার চেয়ে বেশি করা জরুরি।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য সর্বপ্রথম জরুরি কাজ হল, মহাপবিত্র খোদার সত্তা ও গুণ-সংশ্লিষ্ট আকীদা সঠিক হতে হবে, তিনিই আহাদ- এক। সামাদ- তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং ইবাদতের যোগ্য তিনিই। তিনিই আমাদের সবার খালিক ও মালিক। তিনিই প্রতিপালক, তিনিই রিযিকদাতা, তিনিই মৃত্যু ও জীবনদাতা। অসুস্থতা-সুস্থতা, ধনাঢ্যতা-দারিদ্র্য, লাভ-ক্ষতি শুধুই তাঁর ক্ষমতাধীন। সব মাখলুক তাঁরই সৃষ্টি। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। এ সৃষ্টিকর্মের মধ্যে কেউ তাঁর অংশীদার কিংবা পরামর্শক নেই। কেউ তাঁর হুকুম বদলাতে পারে না। না তাঁর কাজে কারো দখল দেওয়ার অবকাশ আছে। তিনি মালিকুল মুল্‌ক- রাজাধিরাজ। আহকামুল হাকিমীন- মহাবিচারক। এজন্য

তাঁর প্রতিটি হুকুম মানা জরুরি। তাঁর হুকুমের বিপরীতে অন্য কারো হুকুম কখনো মানা যাবে না। চাই সে শাসনকর্তা, বাবা-মা কিংবা গোত্রপতি অথবা নিজের প্রবৃত্তি হোক।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হোক আমাদের স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা, আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হোক আমাদের আমল ও শান। এ আকীদাই দ্বীনের মূল ভিত্তি। সমস্ত নবীর সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ সবক। সাত আসমান, সাত জমিন এবং যা কিছু তাতে আছে সব এক পাল্লায় রাখা হলে আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর পাল্লায় রাখা হলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র পাল্লা ভারী হবে। এই ফযীলত ও ওজন এজন্য যে, এই কালেমায় আল্লাহর তাওহীদের অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে। তাঁরই ইবাদত-বন্দেগি করার, তাঁরই আদেশ মতো চলার, তাঁকেই পরম প্রার্থিত বানানোর, তাঁর সঙ্গেই সম্পর্ক করার সিদ্ধান্ত ও অঙ্গীকার। এটাই ঈমান ও ইসলামের রূহ।

হাদীস শরীফে এসেছে–

جَدِّدُوْا إِيْمَانَكُمْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

'হে লোকসকল, ঈমান তাজা করে নাও। প্রশ্ন করা হল, কী করে ঈমান তাজা করব? বললেন, বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়।' –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৭১০; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৬৫৭; আলমুনতাখাব মিন মুসনাদি আব্‌দ ইবনে হুমাইদ, হাদীস ১৪২৪

সে আল্লাহ জীবিত, জ্ঞানের অধিকারী, ক্ষমতাধর, সিফাতে কালামের অধিকারী, ইচ্ছা ও শ্রবণশক্তির অধিকারী, সৃষ্টি ও সৃজন তাঁর গুণ। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সম্মান ও লাঞ্ছনা তিনিই দেন।

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ কালেমার এ অংশে হযরত মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল হওয়ার স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা আছে। যার মর্ম হল, আল্লাহ তাআলা তাঁকে পৃথিবীবাসীর হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি যা বলেছেন, যে খবর দিয়েছেন সব সঠিক। যেমন, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া, ফেরেশতার অস্তিত্ব, কেয়ামত সংঘটিত হওয়া, মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়া, নিজ নিজ আমল অনুযায়ী জান্নাত ও জাহান্নামে যাওয়া ইত্যাদি। রাসূলের প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্যই হল তাঁর সব কথা মানা। তাঁর শিক্ষা ও হেদায়েতকে আল্লাহ তাআলার শিক্ষা ও হেদায়েত মনে করা এবং তাঁর বিধান মোতাবেক

চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

কেউ যদি কালেমা পড়ে কিন্তু এ সিদ্ধান্ত না নেয় যে, আমি নবীজীর বর্ণিত প্রতিটি কথা একেবারে সত্য এবং তাঁর বিপরীতের সব কথা ভুল বলে বিশ্বাস করব, তাঁর আনীত শরীয়ত ও হুকুম অনুযায়ী চলব, তাহলে এমন মানুষ মুসলমান বলে গণ্য হবে না। কালেমা মূলত একটি অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি। এর মর্ম এটাই– আমি শুধু আল্লাহ তাআলাকে সত্য খোদা এবং মাবুদ ও মালিক মানি। দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর চেয়ে তাঁর সঙ্গে বেশি মহব্বত ও সম্পর্ক রাখছি। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য রাসূল মানছি। উম্মতের এক সদস্যের মতো আমি তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করব এবং তাঁর আনীত শরীয়তের ওপর আমল করতে থাকব।

আকায়েদের বিষয়টি বড় গুরুত্বপূর্ণ। আকীদা দ্বীনে ইসলামের মূল বিষয়। আমল হল তার শাখা। আকীদা ঠিক না হলে দোযখে চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করতে হবে। আমলে অবহেলা হলে নাজাতের আশা করা যায়। নাজাত হয়ত শুরুতেই লাভ হবে অথবা শাস্তি ভোগ করার পর। –আকায়েদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআ ২৮-৩০

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামী আকীদার যথার্থ ও বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করার তাওফীক দান করুন। ঈমান নবায়নের এমন তাওফীক দান করুন, যার প্রভাব আমাদের কথা ও কাজ, আমাদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে দৃশ্যমান হয়।

আমাদেরকে এ বাস্তবতাও মনে রাখতে হবে, যা হযরত মাওলানা আব্দুল হক খান বশীর লিখেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর সমকালীন ইমাম হযরত মাওলানা সারফরায খান সফদর রহ. যার পূর্ণ সমর্থন করেছেন এভাবে–

'উপমহাদেশ পাক-ভারতে গত চার শতাব্দীর মধ্যে অসংখ্য ফেতনার জন্ম হয়েছে। মুসলমানদেরই কিছু মূর্খ ও স্বার্থপর ধর্মীয় নেতৃত্বের কারণে শিরক ও বেদআতের উত্থান হয়। কবর পূজার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। অগণিত শরীয়তবিরোধী প্রথার জন্ম হয়। চিন্তাগত কুবিশ্বাস মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। খতমে নবুওত, হাদীসের প্রামাণ্যতা, সুন্নাহর প্রামাণ্যতা, তাকলীদের প্রামাণ্যতা, মুজিযা ও কারামাতের বাস্তবতা, সাহাবা ও আহলে বাইতের মর্যাদা এবং নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার মতো শরীয়ত বর্ণিত সর্বসম্মত আকীদা অস্বীকার করে বিভ্রান্তির নতুন পথ খোলা হয়েছে।

এ অবস্থায় ইমামে রাব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফে-সানী হযরত শায়েখ আহমদ

সারহিন্দী রহ., হাকীমুল হিন্দ হযরত মাওলানা শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এবং সিরাজুল হিন্দ হযরত ইমাম শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. প্রমুখ বুযুর্গ সমস্ত জটিলতা সহ্য করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর মুতাওয়াতির ও মুতাওয়ারাস আকীদা হেফাজতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তাঁদের পর তাঁদের প্রকৃত জ্ঞানগত আত্মিক উত্তরাধিকারী আকাবিরে দেওবন্দ এই দায়িত্ব যথাযথ সামলান। এদিক থেকে তাঁদের চেষ্টা-মেহনত অন্যান্য দল থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, এ যুগে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর মুতাওয়াতির ও মুতাওয়ারাস আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি হেফাজতের ক্ষেত্রে দেওবন্দের বুযুর্গদের উপমা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে তাঁদের মেধা, চিন্তা, জ্ঞান ও বোধ এ চেষ্টা ও মেহনতে ব্যয় করেন। যেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর মুতাওয়াতির ও মুতাওয়ারাস আকীদা ও চিন্তায় কোনো ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অনুপ্রবেশ করতে না পারে। এমনকি এ প্রচেষ্টায় নিজের আপনজন বাধা হলেও তাদেরকে নিজেদের থেকে পৃথক করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। যার একাধিক উদাহরণ আছে।

দেওবন্দের পূর্বসূরিদের এই আন্তরিকতা, দ্বীনদারি, দায়িত্বশীলতা ও পূর্ণ প্রচেষ্টার ফলাফল হয়েছে এই– আজ আমরা পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এ দাবি করতে পারি, আলহামদু লিল্লাহ আমাদের কাছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর আকীদা সে অবস্থাতেই আছে এবং সে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহই আছে, যে অবস্থায়, যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলমানদের কাছে ছিল। দেওবন্দের পূর্বসূরিদের জ্ঞানগত ও আত্মিক উত্তরাধিকারীরা কেয়ামত পর্যন্ত ইনশা-আল্লাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর আকীদা সংরক্ষণের এ দায়িত্ব পালন করে যাবে। –আকায়েদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআ ৩৫-৩৬

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক আকীদা গ্রহণ করার, তার ওপর অবিচল থাকার এবং তার সংরক্ষকদের কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাওফীক দান করুন, আমীন। #

বুধবার
২২ রবিউল আখির, ১৪৩৯ হিজরী
১০ জানুয়ারি, ২০১৮ ঈসাব্দ
[ফেব্রুয়ারি ২০১৮ঈ.]

অল্পেতুষ্টির ক্ষেত্র কী?

হামদ ও সানার পর। আলহামদু লিল্লাহ, জুমার দিন আমরা জুমার জন্য মসজিদে আসি। সেই উপলক্ষ্যে কিছু দ্বীনী কথা হয়। দ্বীনী কথা, দ্বীনী আলোচনা শুধু জুমার দিনের বিষয় নয়। যে কোনো দিন, যে কোনো সময় হতে পারে। দিনে একাধিকবারও হতে পারে। কিন্তু আমাদের জীবন অনেক ব্যস্ত। তবে আফসোস, সেই ব্যস্ততার মূল বিষয় দ্বীন-ঈমান হল না। ওই চিন্তাধারা থেকেই মূলত জুমার দিনের এ আলোচনা। যেহেতু জুমার জন্য সকলে আসছেই; সেই উপলক্ষ্যে কিছু দ্বীনী কথা হয়ে যাক। সেজন্য খুতবার আগে স্থানীয় ভাষায় কিছু দ্বীনী কথা হয়। খুতবা তো আরবী ভাষায় হওয়াটা নির্ধারিত। বাংলা এ আলোচনা জুমার নামাযের অংশ নয় এবং জুমার দিনের বিশেষ আমলও নয়। এ আমল যে কোনো দিন হতে পারে, জুমার দিনও হতে পারে। জুমার নামাযের পরেও হতে পারে। আপনাদের মনে থাকবে, যারা প্রথমদিকে এ মসজিদে জুমা পড়েছেন তখন এখানে বয়ান হত জুমার পরে, আগে না। যাহোক, দ্বীনের কথা যেভাবেই হোক আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে কিছু না কিছু ফায়েদা হয়েই যায়।

আমি বিভিন্ন ওজরে আসতে পারি না। আজকে এসেছি মুরুব্বী অনেকদিন থেকে অসুস্থ; ডক্টর আনওয়ারুল করীম সাহেব। তার খেদমতে হাজির হতে পারি না, আপনাদের সঙ্গেও দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ হয় না। ভাবলাম যাই, দেখা-সাক্ষাৎ হোক। আল্লাহ তাআলা কবুল করার মালিক। আল্লাহ তাআলার কাছে মহব্বতের অনেক মূল্য, অনেক দাম। আমি আপনাদেরকে মহব্বত করি, আপনারা আমাকে মহব্বত করেন। এটা শুধু একটা প্রথাগত বিষয় নয়; এই মহব্বতটা যদি আল্লাহর জন্য হয় তাহলে এটিও একটি নেক আমল এবং গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল।

যাহোক, আজ আমি শুধু একটা কথা আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা আমাকেও উপকৃত করুন, আপনাদেরকেও উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাচ্ছি তা হল, মুমিনের মধ্যে একটি

গুরুত্বপূর্ণ গুণ ও সিফাত থাকা দরকার। সেটি হল ‘অল্পেতুষ্টি’। আরবীতে বলা হয় قناعة (কানাআহ)। এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। তবে আমাদের জানতে হবে অল্পেতুষ্টির ক্ষেত্র কী?

অল্পেতুষ্টি মানে আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা। যা পেলাম, যদ্দুর হয়েছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট আলহামদু লিল্লাহ–আল্লাহর শোকর। তো এই অল্পতে তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর শোকর আদায় করা– এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। একজন মুমিনের মধ্যে এই গুণ থাকা দরকার। কিন্তু এই অল্পেতুষ্টির ক্ষেত্রটা কী?

এটির ক্ষেত্র হল দুনিয়া– জাগতিক বিষয়। জাগতিক যত বিষয় আছে, তাতে ‘কানাআত’ বা অল্পেতুষ্টি বাঞ্ছনীয়। অল্পেতুষ্টির বিপরীত হল লোভ ও মোহ- বেশি থেকে বেশি উপার্জন করতে হবে, বেশি থেকে বেশি পেতে হবে। আমাকে ধন-সম্পদ বাড়াতেই হবে, আসবাব-পত্র বাড়াতেই থাকতে হবে- এমনটি বাঞ্ছনীয় নয়। যদ্দুর পেয়েছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব।

এটি হল জাগতিক বিষয়ে। কিন্তু দ্বীন-ঈমানের বিষয়ে, নেক আমলের বিষয়ে এর উল্টোটা। এখানে সামান্য একটু পেয়েই খোশ– হাঁ, আমি অনেক ইবাদত-বন্দেগি করে ফেলেছি, দ্বীন-ঈমানের অনেক মেহনত করে ফেলেছি; আর দরকার নেই, বেশি হয়ে গেছে। না, এমন নয়; বরং দ্বীন-ঈমানের ক্ষেত্রে, নেক আমলের ক্ষেত্রে, আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে হবে। জাগতিক বিষয়ে প্রতিযোগিতা নয়, অল্পেতুষ্টি। আর দ্বীন-ঈমানের বিষয়ে, আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দরকার হল প্রতিযোগিতা। কত অগ্রসর হতে পারি আমি! ফরয নামাযের বাইরে, সুন্নতে মুআক্কাদার বাইরে আমি দুই রাকাত নফল পড়ি। আচ্ছা নফল চার রাকাত পড়তে পারি কি না চেষ্টা করি। মাগরিবের পরে দুই রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা, তারপরে দুই রাকাত নফল পড়ি; সামনে থেকে চেষ্টা করি চার রাকাত পড়ার। ইশার পরে দুই রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা তারপরে বিত্‌রের নামায; বিত্‌রের আগে দুই রাকাত নফল বা চার রাকাত পড়া উত্তম এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ নফল নামায। অন্যান্য নফল থেকে এই নফলের অনেক গুরুত্ব। আমরা কিন্তু খেয়াল করি না। ইশার পরে দুই রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদার পরে আমরা বিত্‌র পড়ে ফেলি। বিত্‌রের মূল সময় কিন্তু তাহাজ্জুদের পরে। শেষ রাতে যদি আমি জাগতে পারি, নিজের ওপর যদি এই আস্থা থাকে যে, ইনশা-আল্লাহ জাগতে পারব, তাহলে তো তাহাজ্জুদ পড়ে– চার রাকাত, আট রাকাত যে কয়

রাকাত তাহাজ্জুদ পড়া যায়, তাহাজ্জুদের পরে তিন রাকাত বিত্‌র পড়ব। কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ইশার পরেই আমি শোয়ার আগে বিত্‌র পড়ে ফেলব। তখনো উত্তম হল, বিত্‌রের আগে দুই, চার, ছয় যা পারি নফল পড়ে তারপরে বিত্‌র পড়ব।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মাগরিবের মতো বিত্‌র পড়ো না।' মাগরিবের আগে তো সুন্নত নেই। মাগরিবের আযান হলে একটু অপেক্ষা করে তারপরেই মাগরিবের ফরয পড়া হয়। 'বিত্‌র মাগরিবের মতো পড়ো না।' لَا تَشَبَّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ 'বিত্‌রকে সালাতুল মাগরিবের সদৃশ করো না।' সালাতুল মাগরিবের আগে যেমন কোনো নামায পড় না, তেমনি বিতরের আগেও কোনো নামায পড়লে না, এমন করো না। বিত্‌রের আগে নফল পড়। দুই রাকাত পড়, তারপর তিন রাকাত, তাহলে পাঁচ রাকাত হল। চার রাকাত নফল পড়, তারপর তিন রাকাত, তাহলে সাত রাকাত হল– এভাবে। বিত্‌র মানে তো বেজোড়; তিন রাকাত বেজোড়। এই বেজোড়টা যদি আগে কোনো নফল ছাড়া হয় সেটাকে কোনো কোনো সাহাবী বলেছেন– بُتْرٌ একটা হল وِتْرٌ আরেকটা بُتْرٌ একটা শুরুতে 'ওয়াও' দিয়ে আরেকটা 'বা' দিয়ে। পড়লেন তো 'বিত্‌র' হয়ে গেল 'বুত্‌র'। ب ت ر বুত্‌র মানে অসম্পূর্ণ।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُوْنَ ثَلَاثًا بُتْرًا، وَلٰكِنْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا.

–মারিফাতুস সুনানি ওয়াল-আসার, ইমাম বায়হাকী ৪/৭১, বর্ণনা ৫৫০৭

তিন রাকাত পড়বে? বিত্‌র তো তিন রাকাতই। তুমি এর আগে দুই রাকাত নফল পড়, চার রাকাত নফল পড়। তা না করে শুধু বিত্‌র পড়লে এটা অসম্পূর্ণ। এতে বিত্‌রের হক আদায় হল না। বিত্‌রের হক আদায় হবে বিত্‌রের আগে যদি দুই রাকাত বা চার রাকাত নফল পড়ি। তো আমি প্রথম প্রথম বিত্‌রের আগে দুই রাকাত পড়ি, কিছুদিন পর চার রাকাত পড়ি– এভাবে এগুতে থাকি।

আমার কেরাত কোনোরকম শুদ্ধ– ফরয আদায় হয়ে যায়; কিন্তু পুরো শুদ্ধ না। এত মারাত্মক ভুল হয়ত আমার কেরাতে নেই, যে কারণে নামাযই হবে না। এমন ভুল হচ্ছে না, কিন্তু এখনো অনেক ভুল আছে। ভুলে ভুলে তারতম্য আছে না? কিছু ভুল আছে কেরাত পড়ার সময় যদি সে ভুল হয়, তাহলে অর্থ

এমন বিগড়ায় যে ঈমানের কথা হয়ে যায় কুফুর, হালালের কথা হয়ে যায় হারাম। নামায হবে? এত মারাত্মক ভুল হয়ত সবার নেই; কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু মানুষের এরকম মারাত্মক ভুল আছে; কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। কারণ আমি তো নিজের ভুলটা নিজে ধরতে পারব না। আরেকজনের কাছে শোনাতে হবে। যার তেলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ তার কাছে শোনাতে হবে। কিন্তু শোনাই না। নিজে ভাবি যে, আমার তেলাওয়াত ঠিক আছে। হাঁ, যদি মোটামুটি শুদ্ধ হয় তাও চলে। কিন্তু মোটামুটি শুদ্ধের ওপর কেন ক্ষান্ত হব? চেষ্টা করব আরো উন্নতি করার।

তো বলছিলাম, আমরা দ্বীন-ঈমানের বিষয়ে অল্পতেই ক্ষান্ত হয়ে যাই। ব্যস! হয়ে গেছে, আর প্রয়োজন নেই। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টায় দশবার দরূদ শরীফ পড়ি, আলহামদু লিল্লাহ। সামনে চেষ্টা করি বিশবার পড়ার, ত্রিশবার পড়ার। এই দশবারের ওপর ক্ষান্ত না হই।

এমন কিন্তু আমরা জাগতিক বিষয়ে করি না। হাদীসের শিক্ষা হল– তুমি জাগতিক বিষয়ে অল্পতে তুষ্ট হয়ে আলহামদু লিল্লাহ বল– শোকর আদায় কর। বাকি সময়টা বেশি বেশি দ্বীন-ঈমানের কাজে ব্যয় কর। তারপরও নিষেধ করা হয়নি। ঠিক আছে, জাগতিক ব্যস্ততা বাড়াও। নিষেধ করা হয়নি যে, জাগতিক ব্যস্ততা তোমাকে একেবারে এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে; ছাড় আছে। কিন্তু এই ছাড়ের মানে কি ফরয নামায ছেড়ে দেব, সুন্নতে মুআক্কাদা ছেড়ে দেব, ফরয রোযায় অবহেলা করব? এই ছাড়ের মানে কি হালাল-হারামের তারতম্য রাখব না? আল্লাহ তো অনেক ছাড় দিয়েছেন। আল্লাহর সেই ছাড় গ্রহণ করে আমাকে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। সেই শোকর কীভাবে? দুনিয়ার ক্ষেত্রে অল্পেতুষ্টির পরে শোকর আর দ্বীন-ঈমানের ক্ষেত্রে শোকর আদায় করে ক্ষান্ত হব না; বরং অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতে থাকব। আরো অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতে থাকব। এটা হল হাদীসের শিক্ষা।

এ বিষয়টি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন। এর পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদীস, আপনারা শুনেছেন–

أُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.

'তোমাদের চেয়ে যারা গরীব-দুঃখী তাদেরকে দেখ, তোমাদের চেয়ে যারা

সুখী-সচ্ছল তাদেরকে নয়। এটা হবে তোমাদের জন্য আল্লাহ-প্রদত্ত নেয়ামতের শোকরগোযারির পক্ষে অধিক সহায়ক ও সম্ভাবনাপূর্ণ।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৬৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৩

জাগতিক বিষয়ে তোমার চেয়ে তুলনামূলকভাবে যার অবস্থা নিম্নমানের তার দিকে তাকাও আর দ্বীন-ঈমানের বিষয়ে তোমার চেয়ে যার অবস্থা উন্নত তার দিকে তাকাও। জাগতিক বিষয়ে তোমার চেয়ে দুর্বল যে তার দিকে তাকাও, তাহলে আল্লাহর শোকর আদায় করতে পারবে– আমার তো যাক তাও একটা ঘর আছে আরেকজনের তো ঘর নেই, কোনোরকম একটা ছাপরা করে আছে। তোমার চাইতে জাগতিক দিক থেকে দুর্বল, বৈষয়িক দিক থেকে দুর্বল তার দিকে তাকাও যে, আল্লাহ তো তার থেকে আমাকে অনেক ভালো রেখেছেন। এরকম তো সবাই খুঁজে পাবে– তার চেয়ে আরো নিম্নমানের অবস্থা, দুর্বল অবস্থা– কে খুঁজে পাবে না বলুন? নিজের থেকে দুর্বলের দিকে তাকাও, তাকে একটু সাহায্য করতে পার কি না। দেখ আর আল্লাহর শোকর আদায় কর; আল্লাহ তাআলা আমাকে ভালো রেখেছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাকে যে বিষয়ে আক্রান্ত করেছেন আমাকে তা থেকে নিরাপদ রেখেছেন আর তাঁর অনেক মাখলুকের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩১

আল্লাহ তোমাকে ভালো রেখেছেন তো আল্লাহর শোকর আদায় কর। আর দ্বীন-ঈমানের বিষয়ে যারা তোমার চেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে তাদের দিকে তাকাও– সে তাহাজ্জুদের জন্য নিয়মিত ওঠে, আমি তো মাসে একবার দুইবার জাগি, আর না হয় শুয়েই থাকি। কোনোরকম ফরযে যাই, ফজরের জামাতে শরিক হই। তো এখন আমি ফজরের নামায পড়ি, কিন্তু মসজিদের জামাতে আসি না; আমি খোশ! কেন? বলে, আরে কতজন তো ফজরের নামাযের জন্য ওঠেই না। ওই আটটা-নয়টার দিকে যখন ওঠে, গোসল করে ফজরের কাযা আদায় করলে করল বা না করেই অফিসে রওনা হয়ে গেল। যার যেই কাজ, কর্মস্থলে চলে গেল, ফজরের নামায বাদ!

এখন বলে, সে তো ফজরের নামাযই ছেড়ে দিল। আমি তো পড়ি, সময়মতো সূর্য ওঠার আগে আগে ফজরের নামায পড়ি। এজন্য আমি খোশ্। কেন? আমি অন্যদের দিকে তাকাচ্ছি, ঈমান আমলের দিক থেকে আমার চেয়ে যে দুর্বল অবস্থায় আছে তার দিকে তাকাচ্ছি। ও তো ফজর পড়েই না, আমি

পড়ি। সেজন্য আমি খোশ! আমি চিন্তা করি না যে, আরে আমার পাশেই তো মসজিদ, মসজিদে যে দুই কাতার মুসল্লি এরা সবাই তো ফজরের নামায জামাতে পড়ছে, আমি তো জামাতে যাচ্ছি না, মসজিদে যাচ্ছি না, জামাতে পড়ছি না; আমার অবস্থা তো তাদের চেয়ে খারাপ, আমাকে আরো ভালো হতে হবে। আমি তো শুধু মাগরিবের নামায মসজিদে জামাতে পড়ি, বাকি চার ওয়াক্ত পড়ি না। অন্যরা তো দেখি পাঁচ ওয়াক্ত পড়ে, আমি তো তাদের থেকে পেছনে পড়ে আছি; আমাকে অগ্রসর হতে হবে।

তো দ্বীন-ঈমানের ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে ভালো যারা, তাদের দিকে তাকাও, তাহলে তোমার মধ্যে একটু অনুশোচনা আসবে– আহা! আমি তো পেছনে পড়ে আছি, আমাকে অগ্রসর হতে হবে। জাগতিক বিষয়ে তোমার চেয়ে দুর্বল যারা ওদের দিকে তাকাও– আমাকে তো আল্লাহ ওদের চেয়ে ভালো রেখেছেন, আলহামদু লিল্লাহ– আল্লাহর শোকর।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বলে দিয়েছেন, যদি তুমি জাগতিক বিষয়ে তোমার চেয়ে ভালো যে তার দিকে তাকাও তুমি নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারবে না। আহা! ওর তো গুলশানে বাড়ি আছে, আমার গুলশানে বাড়ি নেই। ধানমণ্ডিতে আছে বহুত বড় সুন্দর বাড়ি, তাও শোকর আসে না; কেন? গুলশানে নেই। এজন্য শোকর আসে না। এটা অন্যায়। আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত, যা আল্লাহ দিয়েছেন এর ওপর আল্লাহর শোকর আদায় করা। যে নেয়ামত আমি অর্জন করেছি তা আল্লাহর দান। একথা মনে রাখতে হবে। পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে কোন সূত্রে আমি সম্পদ হাসিল করেছি? অবৈধ পন্থায় যদি কোনো কিছু হাসিল করে থাকি ওটা শুধরিয়ে নেওয়া, পাক করে ফেলা।

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيْثٍ، وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটা সিফাত, চারটা গুণ যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহলে কী আছে কী নেই–এটা নিয়ে আর পেরেশান হওয়ার দরকার নেই :

১. আমানত রক্ষা করা। খেয়ানত না করা।

২. সত্য বলা; সত্য কথা বলব, মিথ্যা বলব না।

৩. আখলাক সুন্দর হওয়া, চরিত্র পবিত্র হওয়া এবং ব্যবহার সুন্দর হওয়া।

৪. খাবার হালাল হওয়া। রিযিক হালাল হওয়া। (দ্র. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬৫২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৪৪৬৩; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৮৭৬)

তো চারটা গুণ অর্জন করতে হবে। কী কী?

১. حِفْظُ أَمَانَةٍ আমানত রক্ষা করা। যে কোনো ধরনের খেয়ানত, দুর্নীতি, ভেজাল এবং ধোঁকা সবকিছু থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. صِدْقُ حَدِيْثٍ সত্য বলা, মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা।

৩. حُسْنُ خَلِيْقَةٍ ভালো ব্যবহার এবং দিলের উত্তম অবস্থা। আরবী خَلِيْقَةٌ বা خُلُقٌ শব্দের মধ্যে দুইটা দিক আছে :

ক. দিলের অবস্থা ভালো থাকা; দিলের যেই ব্যাধিগুলো আছে সেগুলো থেকে দিলকে পাক করা। দুনিয়ার মহব্বত, দুনিয়ার মোহ–এটা একটা আত্মিক রোগ, আত্মিক ব্যাধি। কিব্‌র–অহংকার, উজ্‌ব; উজ্‌ব মানে নিজের সবকিছু নিজের কাছে ভালো লাগে, অপরের কোনোটাই ভালো লাগে না। নিজেরটাই সবচেয়ে ভালো; আমার কাছে আমার কথা সুন্দর, চাল-চলন সুন্দর, আমার সবকিছু সুন্দর। অপরের কোনোটাই ভালো লাগে না। এটা ব্যাধি, রোগ। অন্তরের এসব রোগ থেকে অন্তর পাক-সাফ থাকা। এটাকে বলে حُسْنُ خَلِيْقَةٍ।

খ. আর মানুষের সঙ্গে কথা-বার্তা, চাল-চলন, ওঠা-বসা–এগুলো ভালো করা। সবার সঙ্গে, রিক্সাওয়ালা ভাইয়ের সঙ্গে, বাসের হেলপারের সঙ্গে, তোমার ঘরের যে খাদেম আছে, কাজের লোক আছে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা আর নিজের স্ত্রী-সন্তান সবার সঙ্গে তো বটেই। আমরা অনেক সময় করি কি, বাইরের লোকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি, আমার বসের সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করি, কিন্তু আমার অধীনে যারা, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি না। বাইরে ভালো ব্যবহার করি, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি, কিন্তু ঘরে গেলে স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে সুন্দর করে কথা বলি না, ধমকের সুরে কথা বলি। এটা অন্যায়। তো حُسْنُ خَلِيْقَةٍ -এর মধ্যে এই দুইটা বিষয় শামিল।

৪. عِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ তোমার রিযিক হালাল হতে হবে। বাসস্থান, তোমার খাবার, এই যে লোকমা যাচ্ছে, এই লোকমার সঙ্গে ইবাদতের সম্পর্ক আছে। এটা হালাল হতে হবে।

তো চারটা জিনিস– আমানত রক্ষা করা, খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকা; সত্য বলা; আখলাক ভালো হওয়া, চরিত্র ভালো হওয়া, মানুষের সঙ্গে আচার-

ব্যবহার ভালো হওয়া; আর রিযিক হালাল হওয়া, পানাহার-বাসস্থান হালাল হওয়া। এগুলোতে যদি আমার মধ্যে ত্রুটি থাকে, আমার রিযিক যদি সন্দেহযুক্ত হয়ে থাকে, হারামের সঙ্গে মিশে গিয়ে থাকে তাহলে হবে না।

আর একটা কথা বলেই শেষ করছি, শুরুতে যে বললাম অল্পেতুষ্টির কথা, সে বিষয়ে আরেকটি কথা–

আল্লাহ তাআলা হজের তাওফীক দিয়েছেন। এখন মুখে দাড়ি এসে গেছে, নামায ঠিকমতো আদায় করছি, অনেক আমল ঠিক হয়ে গেছে বা তাবলীগের চিল্লায় গেলাম, চিল্লা থেকে ফেরার পর অনেক কিছু সংশোধন হয়ে গেছে বা কোনো আল্লাহওয়ালার সান্নিধ্যে গেলাম ওখান থেকে আমার মাঝে বড় পরিবর্তন এসে গেছে–এটা খুশির বিষয় না? খুশির বিষয়, আল্লাহর শোকর আদায় করার বিষয়। এসব পরিবর্তন তো আমার মাঝে এসেছে, কিন্তু পেছনের কাফফারা আদায় করি না। পেছনের ভুলগুলোর, পেছনের জিন্দেগির কাফফারা আদায় করি না। পেছনের জিন্দেগির কাফফারা কী? কারো হক নষ্ট করেছি, এটা আদায় করি। বোনদের হক দিইনি, এখন বোনদের মিরাস দিয়ে দিই। অনেক পাওনাদার আছে, ওদের পাওনা আদায় করিনি, ওরা চাইতে চাইতে বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেছে। যত দ্রুত সম্ভব আদায় করে দিই।

তো পেছনের জমানার কাফফারা করা এটা খুব জরুরি। যদি এটা না করি তাহলে এটা তো কঠিন ধরনের অল্পেতুষ্টি হয়ে গেল (অন্যায়ের ওপর তুষ্টি) যেটা একেবারে গোনাহ, পাপ। আল্লাহ আমার মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন। এই পরিবর্তনের হক আদায় করতে হবে আমাকে। এই পরিবর্তনের হক এবং এর শোকর হল পেছনের জিন্দেগির যা যা কাফফারা সম্ভব আমার দ্বারা তা আদায় করা।

কাউকে খামোখা অন্যায়ভাবে থাপ্পর মেরেছি, খুব ধমক দিয়ে কথা বলেছি, গালি দিয়েছি, এখন গিয়ে ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাই তার কাছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজেদের পেছনের জিন্দেগির কাফফারা আদায় করার তাওফীক নসীব করুন, শুধরাবার তাওফীক নসীব করুন। দুনিয়ার বিষয়ে অল্পেতুষ্টির গুণ দান করুন; আখেরাতের বিষয়ে আরো আগে বাড়ার তাওফীক দিন, আমীন। #

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[জুলাই ২০১৮ ঈ.]

কুরআনের হেদায়েত সবার জন্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ...

সংক্ষেপে তিনটি কথা আরয করছি :

প্রথম কথা, মসজিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু রমযানকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়। মসজিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে দায়েমী। দুনিয়াতে জান্নাতের নমুনা মসজিদ।

দ্বিতীয় কথা, কুরআন মাজীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেন হয় দায়েমী। একবার একজনকে দেখেছি, তাঁর ভক্তদেরকে বলছেন, তেলাওয়াত করতে না পারলে কুল হুওয়াল্লাহ দুই শ বার পড়ুন। এ কথাটা শুনে আমার বড় কষ্ট লেগেছে। সূরা ইখলাস দু শ বার কেন চার শ বার পড়। এক হাজার বার পড়; কিন্তু এটা পুরো কুরআন শেখার বিকল্প কীভাবে হয়? না পড়তে পারলে শিখুন–এ কথা বলতে হবে। মুসলমানকে কুরআন শিখতে হবে। পড়তে পারতে হবে।

আমরা রমযানে তারাবীতে কুরআন শুনলাম। কুরআন শুধু শোনা– এটা কোনো মুমিনের শান হতে পারে না। মুমিনকে কুরআন শোনানোর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এক সূরা, দুই সূরা, এক পারা, দুই পারা এভাবে পরিমাণ বাড়াতে হবে। পুরো কুরআন যেন তেলাওয়াত করতে পারে, দেখে দেখে পুরো কুরআন পড়তে পারে–এমন যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এজন্য আমরা এই রমযান থেকেই মেহনত শুরু করি। প্রয়োজনে আলিফ বা তা ছা থেকে শুরু করি।

কুরআন শেখা ফরয। সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শেখা সবার ওপর ফরয। শেখার জন্য এখন আপনাদের কোনো ওজর নেই যে, আমরা কুরআন শেখার জন্য কোনো রাস্তা পাইনি। দশ বছর আগের বৌনাকান্দি আর এখনকার বৌনাকান্দিতে কত পার্থক্য! দশ বছর আগের হযরতপুর আর এখনকার হযরতপুরে কত পার্থক্য! পুরো কুরআন সূরা ফাতেহা থেকে নাস

পর্যন্ত দেখে দেখে সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়তে পারার যোগ্যতা যুবকদের সবাইকে অর্জন করতে হবে। অর্জন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর বুড়োরা ছোট ছোট সূরা দিয়ে শুরু করবেন। আর বড় বড় সূরার অংশ-বিশেষ করে শিখতে হবে। শিখতে শিখতে কবরে যাব। শেখা বন্ধ করে কবরে যাওয়ার চেয়ে শিখতে শিখতে কবরে যাওয়া কি ভালো না?

হযরত হারদুঈর ঘটনা। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন এমন এক জেনারেল শিক্ষিত লোক। হয়ত ডাক্তার হবেন। তিনি নাযেরা শিখেছেন। আগ্রহ হল, পুরো কুরআন হিফয করবেন। তার বুঝ হল, আমি যদি হিফয শেষ করতে নাও পারি, হিফয করতে করতে কবরে যাই...। ঠিক যখন তার এক পারা দুই পারা করে (সম্ভবত) আঠারো পারা হিফয হল, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক এসেছে। তিনি কবরে চলে গেছেন। তো এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কী আশা করতে পারি। শুরু করা তো আমার সাধ্যের ভেতরে আছে। শেষ করানো আল্লাহর কাজ। কুরআন শেখার ক্ষেত্রে এ কথা বড় অন্যায় যে, নামাযে তো শুধু আমার চার সূরা দরকার। আচ্ছা, কুরআন কি শুধু নামাযের জন্য, না জিন্দেগির জন্য?

তৃতীয় বিষয় হল, বুযুর্গদের একটি উক্তি আছে। বড় চমৎকার। একেবারে বাস্তবসম্মত কথা- رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ অনেক মানুষ আছে এমন, সে কুরআন তেলাওয়াত করে আর কুরআন তাকে লানত করে। অর্থাৎ সে নিজেই কুরআনের ভাষায় নিজেকে লানত করে চলেছে। কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে সে হয়ত পড়ছে- فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ 'মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লানত।' ওই লোক মিথ্যাবাদী। সে তেলাওয়াত করছে অথচ মিথ্যা ছাড়ছে না। সে হয়ত পড়ছে- أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ 'অত্যাচারীদের ওপর আল্লাহর লানত' অথচ সে নিজেই মানুষের ওপর জুলুম করে। যেখানেই তার ক্ষমতা থাকে সেখানেই সে জুলুম করে। এভাবে সে নিজেই নিজেকে কুরআনের ভাষায় লানত করে।

তেলাওয়াত শব্দটা বড় তাৎপর্যপূর্ণ। তেলাওয়াত শব্দের মধ্যে এই কথাও আছে, যা পড়বে সে অনুসারে চলবে। তালা-ইয়াতলু- পেছনে পেছনে চলা। পড়ব আর যা পড়ছি ওটার পেছনে পেছনে চলব। কুরআনের হেদায়েতগুলো মেনে চলব। তিনটা কথা বলা হল আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

দ্বিতীয় মজলিস

আমরা যদি চিন্তা করি, এই রমযানে আমাদের দেশে কত খতম হয়েছে– তারাবীতে, তাহাজ্জুদে, নফলে; মসজিদের তারাবীতে, ব্যক্তিগত তারাবীতে... । আর যদি সারা বিশ্বের কথা ধরা হয়, তাহলে তো বলতে হবে, খতম অনবরত চলতে থাকে। হারামে তারাবীহ্ চলছে। আরো পশ্চিমে আরো পরে তারাবীহ্ শুরু হবে। চব্বিশ ঘণ্টা সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে তারাবীহ্ চলতে থাকে।

আমাদেরকে যে কথাটি মনে রাখতে হবে তা হল, তেলাওয়াত কুরআনের একটি হক, একমাত্র হক নয়। তেলাওয়াত অনেক গুরুত্বপূর্ণ হক, তবে কুরআনের আরো বড় বড় হক রয়েছে। কুরআনের সব হককে যদি এক কথায় বলতে চাই, তাহলে কুরআনের ভাষায়–

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا۝

'আর রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে পরিত্যক্ত করে রেখেছিল।' –সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

মক্কার মুশরিকরা যখন দাওয়াত কবুল করেনি তখন হয়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শেকায়েত করেছেন, সেটা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে অথবা আখেরাতে শেকায়েত করবেন, সে কথা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। কুরআনকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ কী, কীভাবে হয়? যত কিছু কুরআন ছেড়ে দেওয়ার অধীনে আসে তত কিছু হিজরানে কুরআনের আওতায় আসে।

এর বিপরীত হল কুরআনকে গ্রহণ করা। কুরআনের হক আদায় করা এবং যথাযথভাবে আদায় করা। যদি আমরা কুরআন তেলাওয়াতের হকের কথা বলি, তাহলে শুধু তেলাওয়াতই আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন, এমন নয়। ...حَقَّ تِلَاوَتِه তেলাওয়াতের হক আদায় করে তেলাওয়াত করা জরুরি। তেলাওয়াতের হক আদায় করার জন্য কমপক্ষে তিনটি বিষয় দরকার–

১. তেলাওয়াত বিশুদ্ধ হতে হবে।

২. বুঝে বুঝে তেলাওয়াত করতে হবে।

৩. তেলাওয়াত মোতাবেক আমল করতে হবে। তাহলে এটা হবে হক আদায় করে তেলাওয়াত করা।

হক আদায় করে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে– এ কথার ওপর এ আয়াত

যে দালালাত করে এটা এ আয়াতের দালালাতুন নস। اَلدَّلَالَةُ بِالطَّرِيقَةِ الأَوْلَوِيَّةِ।
দালালাতুন নস অনেক সময় ইবারাতুন নস থেকে অধিক শক্তিশালী হয়। আবলাগ হয়। কথাটা তালেবে ইলম ভাইদের জন্য বলে রাখলাম।

এই আমরা তেলাওয়াত শুনলাম, এটা যদি বুঝে-শুনে হয়-চাই সেটা নির্ভরযোগ্য কোনো অনুবাদনির্ভর হোক-যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখব যে, কুরআনের কত বিধান পরিত্যক্ত হয়ে আছে।

প্রথম ঈমানের বিষয়টা ধরি। যেসব করণীয় সম্পর্কে কুরআন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় ঈমান। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঈমান সম্পর্কে যত আয়াত আছে আমরা আমাদের সমাজে তালাশ করে দেখি– কোন ঈমান আল্লাহ ফরয করেছেন আর সমাজে আছে কী? কত আকীদা কুরআন ফরয করে দিয়েছে আর আমাদের সমাজের বড় অংশ সে আকীদার কাছেধারেও নেই। কুরআনের তালীমগুলোকে ব্যাপকভাবে চর্চা করা দরকার।

هُدًى لِّلنَّاسِ কুরআন তো সবার জন্য হেদায়েত। যাদের দিলে আল্লাহর ভয় নেই আখেরাতের ভয় নেই, তারা এখান থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে না। এটা তাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তো দিয়েছেন সবার জন্য। হেদায়েত গ্রহণ করে, উপকার গ্রহণ করে শুধু মুত্তাকীরা– هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ। যদিও শুধু মুত্তাকীদের জন্য দেননি। দিয়েছেন সবার জন্য।

প্রয়োজন কুরআন কারীমের সকল হেদায়েতের ব্যাপক চর্চা। বিশেষত ফরযে আইন শ্রেণির হেদায়েতগুলোর তো অত্যাবশ্যকভাবে ব্যাপক চর্চা দরকার। এমনিভাবে যে শ্রেণির মানুষের জন্য যে হেদায়েতগুলো বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে সে শ্রেণির মানুষের মাঝে ওই হেদায়েতগুলো বিশেষভাবে প্রচার-প্রসার করা দরকার।

মুসলিম বিশ্বের যত দেশ আছে সব দেশের সরকারকে, প্রশাসনের লোকদেরকে কুরআন মাজীদ কী কী কথা বলেছে? বিচারকদেরকে কী বলেছে? আইনের লোকদেরকে কী বলেছে?

যত অ্যাডভোকেট আছে সবাইকে কুরআন এক কথা বলে দিয়েছে–

وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا.

'খেয়ানতকারীদের পক্ষে ওকালতি করতে যেও না।' যে হকের ওপর আছে তার পক্ষে তুমি সাফাই গাও। তাকে আইনি সহযোগিতা দাও। যে হকের

ওপর নেই, যে খেয়ানত করছে, তার পক্ষে তুমি দাঁড়াতে পারো না।

তারা কি কুরআন পড়ে না? কুরআনের তরজমা পড়ে না? হয়ত না। হয়ত এমনো লোক থাকবে, যারা কুরআন ধরেও দেখে না। কিন্তু এসব বিধান সবাই জানে।

পুরো মুসলিম বিশ্বে যত আদালত আছে, কোর্ট আছে, বিচারপতি ও বিচারক আছে, সবাইকে কুরআন বলে দিয়েছে–

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ.

যারা ওহীর ইলম থেকে বঞ্চিত তোমরা কি তাদের বিধান চাচ্ছ? অথচ তোমরা দাবি কর তোমরা মুমিন। তোমরা মুসলিম। তাদের তাহযীব তামাদ্দুন, তাদের আইন ও সংবিধান কীভাবে তোমাদের আইন হয়? এর ভিত্তিতে কীভাবে তোমরা ফয়সালা কর? তুমি যদি মুমিন হয়ে থাক তবে কুরআনের চেয়ে ভালো বিধান তোমাকে কে দেবে? এর চেয়ে বড় আইন কে দেবে? কার কাছে যাচ্ছ? তোমার রব তো আল্লাহ। তোমার খালিক মালিক আল্লাহ। আল্লাহর বান্দাদের ওপর হুকুমত করবে, আল্লাহর বান্দাদের ঝগড়া মেটাবে, মামলা মোকাদ্দমার ফয়সালা করবে, বিচার করবে, সেই বিচারের নীতি তুমি কার থেকে নেবে? তোমার খালিক থেকে নাও। তোমার মালিক থেকে নাও। যিনি মাবুদ তার কাছ থেকে নাও। সবকিছু কুরআনে আছে।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

আল্লাহর নাযিল করা বিধান মোতাবেক তুমি ফয়সালা করছ না, তুমি জালেম না হয়ে আর কী হবে?

তুমি মুমিন। তোমার হেদায়েতের জন্য আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, এর মধ্যে সবকিছু আছে। একজন বিচারকের জন্য যা কিছু দরকার, একজন সরকার প্রধানের যা কিছু দরকার সব হেদায়েত ও নির্দেশনা এবং মূলনীতি দেওয়া আছে। একজন আইনজীবীর যা দরকার হয় আছে। একজন ব্যবসায়ীর যা দরকার হয় আছে। সামাজিক রীতিনীতির জন্য যা দরকার সব আছে। একটা ভালো সমাজের জন্য যা দরকার সব আছে। যত শ্রেণির মানুষ এবং মানব জাতির যত ধরনের সমস্যা হতে পারে সবকিছুর হেদায়েত ও সমাধান কুরআনে আছে। আল্লাহ তো তোমাকে ইলমে ওহী দান করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে এই উম্মতকে আল্লাহ ধনী বানিয়ে দিয়েছেন। তুমি কেন অন্যের দুয়ারে হাত পাতবে?!

কুরআন কারীম সকল ক্ষমতাধর শাসকগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে নমুনা দিয়ে দিয়েছে–

اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ۝

'যাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।' –সূরা হজ (২২) : ৪১

কুরআন তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে সেই নির্দেশও, যা আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালামকে দিয়েছিলেন। তাঁকে আল্লাহ তাআলা নবুওতও দান করেছিলেন এবং বাদশাহীও দান করেছিলেন। বাদশাহী কী এবং কেন তা জানিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তাঁকে এবং সেই হেদায়েত কুরআনে নাযিল করে কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকলের জন্য বিধান করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

یٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ یَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌۢ بِمَا نَسُوْا یَوْمَ الْحِسَابِ۝

'হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচারদিবসকে ভুলে আছে।' –সূরা ছদ (৩৮) : ২৬

রমযানে তারাবীতে কুরআন খতম তো সবাই করেছে, সব দেশের প্রশাসনের লোকেরা করেছে, আদালতের লোকেরা করেছে, পার্লামেন্টের লোকেরা করেছে। কুরআন কিন্তু সবাইকে সম্বোধন করে করে বলেছে, পথনির্দেশ দিয়েছে, দিয়ে যাচ্ছে। কুরআন বলেছে, সুদ ছাড়, ঘুষ ছাড়, ধোঁকা ছাড়। ভেজাল ছাড়। দুর্নীতি ছাড়। মাপে কম দিয়ো না। ওয়াদা পূরণ কর। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।...

যুবকদেরকে কেমন পাক্কা ঈমানদার হতে হবে সে বর্ণনা আল্লাহ তাআলা সূরা কাহ্ফে দিয়েছেন–

اِنَّهُمْ فِتْیَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًی۝ وَّرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا۝

'তারা ছিল একদল যুবক, যারা নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে হেদায়েতে প্রভূত উৎকর্ষ দান করেছিলাম। আমি তাদের অন্তর সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম। এটা সেই সময়ের কথা যখন তারা (রাজার সামনেই) দাঁড়াল এবং বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে কখনোই ডাকব না। তাহলে তো আমরা চরম অবাস্তব কথাই বলব।' –সূরা কাহ্ফ (১৮) : ১৩-১৪

কোন শ্রেণির মানুষ আছে, যে বলবে, আমার কথা কুরআনে নেই। বাচ্চাদের কথা বলুন, মা-বাবা তাদেরকে কীভাবে লালন-পালন করবে সে কথা কুরআনে আছে। মৃত্যু এসে গেছে, কবরে কীভাবে সোপর্দ করবেন, কবরে গিয়ে তার কী হালত হবে। সব এসে গেছে কুরআনে। কুরআন হল জিন্দা কিতাব। কুরআন এমন জিনিস নয় যে, এটা গিলাফে ভরে তাকে রেখে দেবেন। কুরআন এমন কিতাব নয় যে, শুধু তেলাওয়াত করে ক্ষান্ত থাকবেন।

তেলাওয়াত করার সময় আপনাকে কুরআন বলতে থাকবে। শুধু তেলাওয়াত করে চলে যাবেন এটা হবে না। গাফেল হয়ে কেউ কুরআন তেলাওয়াত করে চলে যাবে এটা হতে পারে না। কুরআন তাকে সজাগ করে দেবে। দিল খুলে, দিলের কান খুলে যে তেলাওয়াত করে, কুরআন তাকে গাফেল থাকতে দেয় না। আল্লাহ তাআলা এজন্যই মুমিনের দায়িত্বে কুরআন তেলাওয়াত জরুরি করে দিয়েছেন। কুরআন তেলাওয়াত ঈমানী দায়িত্ব। এর দ্বারা মুমিনের ঈমান জাগ্রত হয়। ঈমানী তাকাযা জাগ্রত হয়। এই জিনিসটা আমরা খেয়াল করার চেষ্টা করি। যার সাধ্যে যতটুকু আছে, কুরআনের হেদায়েতগুলোকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি।

কুরআনকে আমরা জিন্দা কিতাব হিসেবে গ্রহণ করি। শুধু তেলাওয়াত করে খতম করব। এটা অনেক বড় সওয়াবের বিষয়। কিন্তু হক আদায় করে তেলাওয়াত শুধু খতম করা আর সওয়াব হাসিল করার নাম নয়। সবাই সবার সাধ্যের ভেতরে কুরআনের হেদায়েতগুলোকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি। وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ... এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের গুণাবলি বলে দিয়েছেন। قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ এখানে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের গুণাবলি বলে দিয়েছেন। উলুল আলবাব কারা কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। মুত্তাকী কারা

বলে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সূরা মাআরিজে তেলাওয়াত হল, মুসল্লি কেমন হবে। মুসল্লি এমন হবে, মুসল্লির সিফাত এই হবে। মুসল্লির মধ্যে চারিত্রিক পবিত্রতা থাকতে হবে। মুসল্লিদের গুণাবলি ওখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসল্লিদের সম্পদে, যা আল্লাহর দেওয়া, তাতে বঞ্চিতদের হক থাকে। কুরআনে বর্ণিত এসব সিফাত খুঁজে খুঁজে নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভরপুর তাওফীক নসীব করুন।

আমর বিল-মারুফ নাহি আনিল মুনকার ও জিহাদের কত আয়াত কুরআন মাজীদে আছে। এসব আজ অবহেলিত। ইসলামী খেলাফত নেই। এ কথা আমরা বলি। এখন সরকারও বলে– দেশে ইসলামী খেলাফত নেই। ইসলামী হুকুমত নেই। ইসলামী হুকুমত না থাকার কারণে খেলাফত-বিষয়ক যত ইসলামী বিধান আছে সব মাফ!! নাউযু বিল্লাহ!

ইসলামী হুকুমত কীভাবে হবে? ইসলামী হুকুমত কি আসমান থেকে নাযিল হয়, যেমন ঈসা আ.-এর উম্মতের জন্য আসমান থেকে তৈরি খাবার এসেছে? যাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা দিয়েছেন সে যদি তার হুকুমতকে ইসলামী তরিকায় পরিচালনা করে তাহলে ইসলামী হুকুমত আসে। সে আমর বিল-মারুফ নাহি আনিল মুনকারের চূড়ান্ত বিভাগ খুলবে। সে জিহাদের বিধান বাস্তবায়ন করবে। হুদূদ (ইসলামী দণ্ডবিধি) বাস্তবায়ন করবে। তার অফিস আদালত সবকিছু কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হবে। তাহলে ইসলামী হুকুমত অস্তিত্ব লাভ করবে। মুসলিম দেশের সরকার যদি বলে, আমাদের দেশে ইসলামী হুকুমত নেই। এজন্য এসব বিধান প্রয়োজন নেই–এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কী আছে!

সকল মুসলিম দেশের প্রশাসনকে ডেকে ডেকে কুরআন বলে, তোমরা আমর বিল-মারুফের কাজ কর। নাহি আনিল মুনকারের কাজ কর। ইবাদত নিজে কর। ইবাদতের পরিবেশ কায়েম কর। সালাত কায়েম কর। যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা কর। নিজে যাকাত দাও। তোমার অধীনরা যাকাত দিচ্ছে কি না সেটা তদারকি কর। শরীয়ত যেসব হদ নির্ধারণ করে দিয়েছে সে হদগুলো কায়েম কর। চুরির কী শাস্তি? ফাহেশার কী শাস্তি? মদপানের কী শাস্তি? কোনটার কী শাস্তি সেটা বাস্তবায়ন কর। নিজের থেকে পণ্ডিতি করো না। শরীয়ত যেটা নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটা বাস্তবায়ন কর। সেটা বাস্তবায়ন করবে, সুফল পাবে। নিজের থেকে পণ্ডিতি করলে একে তো শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন হবে,

শরীয়তের বিপরীতে আরেক আইন দাঁড় করানোর মতো কুফুরি কাজ হবে, অপর দিকে ফায়েদা কিছুই হবে না। ক্ষতি আর ক্ষতি হবে।

মাদরাসার মধ্যে কুরআনের পরিবেশ, ঘরের মধ্যে কুরআনের পরিবেশ, এটা যে আল্লাহ তাআলার কত বড় নেয়ামত, এটা বুঝতে পারে সে যার পুরো ঘর এক দিকে আর সে কুরআন শিখেছে, কুরআনী জিন্দেগি, ঈমানী জিন্দেগি বোঝা শুরু করেছে এবং সেটা একটু বাস্তবায়ন করতে চায়। কিন্তু পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য পারে না। তখন বোঝা যায় পরিবেশটা কুরআনী হওয়া, পুরো পরিবারটা কুরআনী হওয়া কত বড় নেয়ামত।

একটা ঘরে পর্দার পরিবেশ নেই। হঠাৎ একজন পর্দার বিধান জেনেছেন। আল্লাহ তাআলা তার ঈমানী শক্তি জাগ্রত করে দিয়েছেন। মনে করুন, তিনি তার মায়ের কাছে বসা। এমন সময় তার কাছে আসতে চায় তার ভাবি বা এমনো হতে পারে, আপনার ভাবি ওখানে আর আপনি কোনো দরকারে ওখানে যেতে চান। তখন তাকে সরে যেতে হবে বা আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। এটা অনেক বড় একটা বাধা। কিন্তু যদি আপনিও পর্দার বিধান মানেন, সেও পর্দার বিধান মানে তাহলে বিষয়টা সহজ। আপনার ভেতর যদি পর্দার বিধানের গুরুত্ব থাকে, আপনি যদি দ্বীন-ঈমান শিখে থাকেন, তাহলে এই বাধার ওপর আপনি খুশিই হবেন।

আমি আমার ভাতিজাদের ঘটনা শুনিয়েছি। যখন রিয়াদ থেকে এসেছি, তারা একেবারে ছোট। আমি ঘরে ঢুকেছি। গ্রাম দেশে একটা ঘরের দুইটা পাশ থাকে। একটাকে বলে আতীনা। সামনের অংশ আর ভেতরের অংশ। আমি সামনের অংশ থেকে ভেতরের অংশে গিয়েছি। এখন বের হব। বাইরে উঠান। উঠান আবার দুই ধরনের, ভেতরের উঠান, বাইরের উঠান। আমি ভেতরের উঠানে যাব, আম্মার সঙ্গে দেখা করার জন্য। যাওয়ার আগে আমি আওয়াজ দেব, কিন্তু আমি আওয়াজ দেওয়ার আগেই ভাতিজারা আমার ভাব দেখে বুঝতে পেরেছে আমি ওইদিকে যাব। তখন দুজনই দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে নিষেধ করছে, এদিকে আসবেন না, আসবেন না; আম্মা ওখানে আছেন। কে তাদেরকে এটা শিখিয়েছে? এটা শিখিয়েছে তাদের পরিবেশ।

আমাকে বাধা দিয়েছে এতে আমি খুশি। আমাকে যদি এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টাও দেরি করতে হয়, তাও আমি খুশি। কিন্তু যদি কারো কাছে এই বিধানের গুরুত্ব না থাকে, তাহলে সে এক-দুই ঘণ্টা তো দূরের কথা বাধা দেওয়ার ওপরেই নারাজ হয়ে যাবে। মাদরাসার তালেবে ইলম যারা, তাদের

পুরো পরিবারই যদি এমন মাদরাসী হয় তাহলে এক অবস্থা। আর যদি এমন হয়, পরিবারের মধ্যে সে একজনই মাদরাসায় পড়ছে, তাহলে দেখুন কী দুর্দশা! ভাবিরা নারাজ। কারণ, তার সামনে এসে পড়লে সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। সে হয়ত মায়ের কাছে বসা। হঠাৎ ভাবি না জানিয়ে সামনে এসে পড়লেন। তখন সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল এবং ওঠে চলে গেল। এতে তারা নারাজ। কারণ, পর্দার বিধানের গুরুত্ব এখনো তাদের অন্তরে বসেনি।

এখন তো অনেকে পর্দার বিধানকেই ভাগ করে ফেলেছে। খাস পর্দা আর আম পর্দা। শরীয়তে দুই ধরনের পর্দা নেই। শরীয়তে আছে পর্দার বিধান। কেউ পুরো মানে আর কেউ কিছুটা মানে। ঘরে পর্দা আছে, খাস পর্দা নেই। এর মানে হল পর্দা নেই। এজন্য খালা শাশুড়ি, মামি শাশুড়ি কত ধরনের শাশুড়ি যে আছে। এই সব শাশুড়ি পর্দার বিধানের আওতায়। এসব শাশুড়ির সঙ্গে পর্দা করতে হবে। আসল শাশুড়ি তো হলেন আপনার স্ত্রীর মা। হাঁ, আপনি অন্যদের খোঁজ-খবর নেন ভায়া হয়ে। আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে। সরাসরি তাদের সঙ্গে কথাও বলতে যাবেন না, দেখা দেওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু এসব বিধান অনেকেই মানে না। তাই এগুলোর পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এমন পবিত্র পরিবেশই কুরআনী পরিবেশ।

ঘরকে কবরস্থান বানাবেন না। কবরস্থানে কেউ কুরআন পড়ে না। ঘরকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। রেডিও ছেড়ে, মোবাইল ছেড়ে কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে দিন শুরু করেছেন। সূরা ইয়াসীনের তেলাওয়াত শোনার মধ্য দিয়ে দিন শুরু করেছেন। ভালো কথা, কিন্তু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না। সূরা ইয়াসীনের অর্থের প্রতি খেয়াল করুন। সূরা ইয়াসীনকে বলা হয়েছে কল্‌বুল কুরআন। এ সূরায় পুরো কুরআনের হেদায়েতের সারসংক্ষেপ চলে এসেছে। অর্থ বুঝে বুঝে সূরা ইয়াসীন শুনুন এবং সে মোতাবেক আপনার দিনটা পরিচালিত করুন। আপনার ঘরটা, দোকানটা পরিচালিত করুন। তাহলে সূরা ইয়াসীন শোনা সার্থক। এক ধাপ আরো অগ্রসর হোন, সূরা ইয়াসীনের তেলাওয়াত শিখুন; নিজে তেলাওয়াত করুন। আরো সূরা শিখুন। পূর্ণ কুরআনের সহীহ তেলাওয়াত শিখুন, তেলাওয়াত করুন এবং কুরআনের ইলম ও আমল গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক নসীব করুন, আমীন।#

[আগস্ট ২০১৮ ঈ.]

প্রসঙ্গ : করোনা ভাইরাস

আসল হল তাওয়াক্কুল এবং ঈমানী শক্তি

ভারসাম্য রক্ষা করে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণও জরুরি

আমরা আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমানের নেয়ামত দান করেছেন। মুমিন বানিয়েছেন–

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى نِعْمَةِ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি আমাদের ঈমানের নেয়ামত দান করেছেন। ইসলামের নেয়ামতে ধন্য করেছেন। (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন আমরাও হৃদয়ের গভীর থেকে বলছি–) আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে ধন্য ও সন্তুষ্ট।'

বিপদাপদ ও বালা-মসিবত মানুষের জীবনে আসতেই থাকে। মুসলিম-অমুসলিম সবার জীবনেই আসে। কিন্তু বিপদাপদে মুমিনের শানই আলাদা। হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

'মুমিনের অবস্থা বড়ই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর। আর এটি শুধু মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য, অন্য কারো নয়। সুখ-সচ্ছলতায় মুমিন শোকর আদায় করে ফলে তার কল্যাণ হয়। আবার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হলে ধৈর্যধারণ করে। ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৯৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৮৬৯

যেহেতু আল্লাহ তাআলা মুমিনকে এই স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন, তাই বিপদাপদের বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং এসব ক্ষেত্রে তার কর্মপন্থাও স্বতন্ত্র

হওয়া উচিত। বিশেষত যখন এক্ষেত্রে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা বিদ্যমান আছে, যার যথাযথ মূল্যায়ন করা শোকর আদায়ের অনিবার্য অংশ। মহামারি বা যেকোনো ধরনের ব্যাপক বিপদাপদ যেমনিভাবে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের মাধ্যম, তেমনিভাবে তা মুমিনের জন্য মাগফেরাত লাভের উপায়। এসব ক্ষেত্রে মুমিনের প্রথম কাজ হল 'আকীদায়ে তাকদীর' অন্তরে জাগ্রত করা। এই বিশ্বাস রাখা যে, সবকিছু আল্লাহ তাআলার হুকুমে হয়। যে কোনো মসিবত থেকে তিনিই উদ্ধার করেন। জীবন-মরণ ও লাভ-ক্ষতির মালিক তিনিই। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। কারো মৃত্যু নির্ধারিত সময়ের আগেও হবে না, পরেও হবে না। আরোগ্য তাঁরই হাতে। আফিয়াত-সালামত এবং শান্তি ও নিরাপত্তার মালিক তিনিই। ইরশাদ হয়েছে–

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۚ﴿۲۲﴾ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿۲۳﴾

'পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীদের পছন্দ করেন না।' –সূরা হাদীদ (৫৭) : ২২-২৩

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

'হে নবী, আপনি বলে দিন, আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু হবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর ওপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত।' –সূরা তওবা (৯) : ৫১

তাই এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুমিন তার অন্তরে ঈমানী শক্তি জাগ্রত করবে। আর ঈমানী শক্তির উপস্থিতি ও অনুভূতি যেমনিভাবে ঈমানের উৎকর্ষ সাধন ও আমল-আখলাকের সংশোধনের ক্ষেত্রে উপকারী, তেমনি তা ওয়াস্ওয়াসা, অমূলক চিন্তা ও আতঙ্ক রোধের সফল ওষুধও। এমতাবস্থায় যা অত্যন্ত জরুরি। রোগ প্রতিরোধে বাহ্যিক শক্তির চেয়ে ঈমানী শক্তিই অধিক ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত, আর ঈমান-ইসলামের বরকতে প্রত্যেক মুমিনের মাঝেই তা আছে। প্রয়োজন শুধু এ শক্তিকে জাগ্রত করা এবং কাজে লাগানো।

অতএব তাওয়াক্কুল করা, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ঈমানী শক্তি জাগ্রত করা–এসব হল মুমিনের প্রথম কাজ।

দ্বিতীয় কাজ, খাঁটি দিলে তওবা করা এবং আল্লাহমুখী হওয়া। সবাই একথা চিন্তা করা যে, এসব বিপদাপদ হয়ত আমার মন্দ আমলের পরিণতি।

وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.

'আর তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।' –সূর শূরা (৪২) : ৩০

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান। যাতে তারা ফিরে আসে।' –সূরা রূম (৩০) : ৪১

ব্যস, এ অবস্থায় আল্লাহর দিকে ফিরে আসাই প্রত্যেক মুমিনের প্রধান কর্তব্য। আল্লাহর দিকে ফিরে আসার অর্থ হল শিরক ছেড়ে তাওহীদের দিকে আসা। অবাধ্যতা ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের দিকে আসা। গোনাহ ছেড়ে তাকওয়ার দিকে আসা। আল্লাহ তাআলার প্রতি উদাসীন হয়ে জীবন অতিবাহিত করা থেকে ফিরে আল্লাহর স্মরণের দিকে আসা। মিসকীনের মতো আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত তুলে কান্নাকাটি করা, মাফ চাওয়া এবং আফিয়াতের জিন্দেগি প্রার্থনা করা।

প্রতিটি মানুষ এবং প্রত্যেক শ্রেণির মানুষ নিজ নিজ হিসাব নেবে যে, আমার মধ্যে কী ত্রুটি আছে, আমি আল্লাহর কোন নাফরমানিতে লিপ্ত আছি, আমি আমার খালেক ও সৃষ্টিকর্তার কী হক নষ্ট করছি এবং আল্লাহর মাখলুকের কী কী হক নষ্ট করছি।

বিশেষত আমাদের এভাবে হিসাব নিতে হবে যে, সেই অপরাধগুলো কী কী, যেগুলোর কারণে পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর ব্যাপক আযাব নাযিল করে তাদেরকে একদম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। সেই অপরাধগুলো কী কী, যেগুলোর কারণে রহমতের জায়গায় লানত ও ভর্ৎসনা আসে। শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গায় ভয়, শঙ্কা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এরপর দেখতে হবে, আমাদের সমাজে সেগুলোর মধ্য থেকে কোন কোন অপরাধ বিদ্যমান।

সুতরাং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার অর্থ হল এসব অপরাধ থেকে আমরা নিজেরা বের হয়ে আসব এবং সমাজকে এসব অপরাধ থেকে পবিত্র করার কর্মপন্থা গ্রহণ করব।

মাপে কম দেওয়া, অশ্লীলতার বিস্তার, হত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম ও খেয়ানতের

বিস্তার, সুদ-ঘুষের লেনদেন, খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান হারাম উপার্জনের হওয়া, অবৈধ মজুতদারি, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও তা গ্রহণ করা, দেশে কুরআন-সুন্নাহ ও শরয়ী আহকামের বিপরীত আইন বাস্তবায়ন হওয়া ও আদালতে সে অনুযায়ী ফয়সালা হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হদ (দণ্ডবিধি) বাস্তবায়ন না হওয়া।

এগুলো এমন সব অপরাধ, যেগুলো সকল বিপদাপদের মূল। অবশ্য তার অনুভূতি আমাদের তখন হয়, যখন এই বিপদাপদ ও মসিবত মহামারি বা অন্য কোনো বাহ্যিক বড় বিপদের আকারে প্রকাশিত হয়। নতুবা আমরা গাফলত ও উদাসীনতার ঘুমে ডুবে থাকি। আমাদের খবরই নেই যে, সামাজিক অবক্ষয়, শান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা এবং মুসলিম উম্মাহর লাঞ্ছনা ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত কঠিন আযাব; যে আযাবে আমরা উপরিউক্ত অপরাধসমূহের কারণে তলিয়ে যাচ্ছি। এই আযাব মহামারিসহ অন্যান্য আসমানী দুর্যোগ ও বাহ্যিক ব্যাপক বিপদাপদের চেয়ে বহু গুণ ভয়ঙ্কর। এর একমাত্র সমাধান হল দ্বীন-শরীয়ত কবুল করা এবং সমাজে তা বাস্তবায়ন করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ، حَتّٰى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ أَسْلَافِهِمِ الَّذِيْنَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ، إِلَّا أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ، وَشِدَّةِ الْمَئُوْنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا، وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللهِ، وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوْا بَعْضَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

'যখন কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে এমনকি তারা সেগুলো প্রচার করতে থাকবে, তখন তাদের মধ্যে তাউন (প্লেগ) মহামারি আকারে দেখা দেবে এবং এমন সব ব্যাধি ও কষ্ট ছড়িয়ে পড়বে, যা আগের মানুষের মাঝে দেখা যায়নি।

যখন কোনো সম্প্রদায় ওজন ও মাপে কম দেবে, তখন তাদের ওপর নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ, কঠিন অবস্থা এবং শাসকের জুলুম-অত্যাচার।

যখন কোনো কওম তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করবে না তখন তাদের প্রতি আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। যদি জন্তু-জানোয়ার না থাকত তাহলে আর বৃষ্টিপাত হত না। আর যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তখন আল্লাহ তাদের ওপর কোনো বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেবেন...।

যখন কোনো সম্প্রদায়ের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবে না আর আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানসমূহের কিছু গ্রহণ করবে আর কিছু ত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তাদেরকে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদে জড়িয়ে দেবেন।' –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪০১৯, হাদীসটি হাসান

মোটকথা, আমাদের প্রথম কাজ– তাকদীরের আকীদা মনে জাগ্রত রাখা এবং তাকদীরের প্রতি ঈমান মজবুত করা।

দ্বিতীয় কাজ– আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা এবং ঈমানী শক্তি জাগ্রত করা।

তৃতীয় কাজ– তওবা করা এবং আল্লাহমুখী হওয়া।

চতুর্থ কাজ– দুআ ও যিকিরের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

বিশেষত সেসব দুআর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, কুরআন হাদীসে যেগুলোর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং যেগুলোর এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর রহমতে বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ–

১. সূরা ফাতেহা একবার বা সাতবার পড়ে নিজের ওপর দম করা।

২. প্রত্যেক নামাযের পর কুরআন কারীমের শেষ তিন সূরা (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস) একবার একবার পড়া।

৩. সকাল-সন্ধ্যা এই তিন সূরা (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস) তিনবার করে নয়বার পড়া।

৪. শোয়ার সময় এই সূরাগুলো এভাবে পড়া–

প্রথমে উভয় হাত চেহারার সামনে রেখে (যেভাবে দুআর সময় করা হয়) একবার একবার তিন সূরা-ই পড়বে। এরপর হাতে দম করে উভয় হাত দ্বারা সারা শরীর যতটুকু সম্ভব মুছবে। এভাবে তিনবার করবে।

৫. প্রতি নামাযের পর একবার আয়াতুল কুরসী পড়া। শোয়ার সময়ও

আয়াতুল কুরসী পড়া। আয়াতুল কুরসী হল সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত।

৬. কতিপয় সংক্ষিপ্ত দুআ :

ক. সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়া–

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

'আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে শারীরিক সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। আয় আল্লাহ, আমার শ্রবণে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। আমার দৃষ্টিতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

আয় আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি কুফুরি ও দারিদ্র্য থেকে। আয় আল্লাহ, আমি আপনার কাছে পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৪৩০; আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৭০১

খ. যখন পারেন যতবার পারেন, এই দুআ পড়া–

لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

'আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয় আমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।' –সূরা আম্বিয়া (২১) : ৮৭

এ সময় নিজের অপরাধ স্মরণ করে এবং নিজেকে অপরাধী ভেবে এ দুআ যত বেশি পড়া যায় ততই ভালো।

গ. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পড়া–

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

'আল্লাহ তাআলার নামে, যাঁর নাম সঙ্গে থাকলে জমিন ও আসমানের কোনো বস্তু ক্ষতিসাধন করতে পারে না। আর তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৮৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৮৮

ঘ. সন্ধ্যায় তিনবার পড়া (সকালে পড়লেও সমস্যা নেই)–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

'আমি আল্লাহর পূর্ণ কালেমাসমূহের সাহায্যে তাঁর সকল সৃষ্টির অকল্যাণ-অনিষ্ট থেকে পানাহ গ্রহণ করছি।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০৮

ঙ. সকাল-সন্ধ্যা সাতবার পড়া–

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাঁর ওপরই আমি ভরসা করছি। তিনি মহান আরশের রব।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৮১

চ. যেকোনো সময় যতবার সম্ভব পড়া–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

'আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ পরিহার করা এবং নেক কাজ করার শক্তি নেই। তাঁর আশ্রয় ছাড়া তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই।' –মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৯৬৩৫

ছ. সকাল-সন্ধ্যায় পড়া–

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

'হে চিরঞ্জীব, হে সৃষ্টিকুলের নিয়ন্ত্রক, আপনার রহমতের দোহাই দিয়ে আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, আপনি আমার সকল বিষয় শুদ্ধ করে দিন, এক মুহূর্তের জন্যও আপনি আমাকে আমার ওপর ছেড়ে দেবেন না।' –সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ১০৩৩০; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ২০০০

জ. যেকোনো সময় যতবার সম্ভব পড়া–

وَرَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

'হে আল্লাহ, আপনার রহমতেরই প্রত্যাশী আমি। তাই আপনি আমাকে আমার ওপর ন্যস্ত করবেন না। আপনি আমার সকল বিষয় পরিশুদ্ধ করে দিন। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৪৩০

ঝ. সকাল-সন্ধ্যায় ও আযান-ইকামতের মাঝে পড়া–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اَللّٰهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ.

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ، وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাচ্ছি– আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদে।

হে আল্লাহ, আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন। আমার উদ্বিগ্নতাকে রূপান্তরিত করুন নিরাপত্তায়। আমাকে হেফাজত করুন– সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে, ওপর থেকে এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি– নিচ হতে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে।' –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৮৭১

এটা জরুরি নয় যে, সকলকে সবকটি দুআই পড়তে হবে। বরং যার জন্য যে দুআ সহজ তিনি তা-ই পড়ুন। যার সবগুলো পড়ার তাওফীক হয়, তিনি সবগুলোই পড়ুন। মূলকথা হল আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জেহ হয়ে ও আল্লাহমুখী হয়ে মনের উপলব্ধি জাগরূক রেখে অন্তর থেকে চাওয়া, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা।

এ ছাড়া ইস্তেগফার ও দরূদ শরীফেরও ইহতেমাম করা উচিত। আর সময়-সুযোগ করে দুরাকাত সালাতুল হাজত পড়ে দুআর ইহতেমাম করলে তা অনেক ভালো। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।' –সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

আসমায়ে হুসনা থেকে কিছু নামের ওযিফা বেশি পরিমাণে আদায় করলেও তা অনেক উপকারী। যেমন–

يَا رَحْمٰنُ হে দয়ালু মেহেরবান, يَا رَحِيْمُ হে পরম করুণাময়, يَا سَلَامُ হে সালাম (শান্তির ব্যবস্থাকারী), يَا قَوِيُّ হে শক্তির আধার, يَا مُؤْمِنُ হে নিরাপত্তা দানকারী, يَا مُهَيْمِنُ হে রক্ষাকর্তা, يَا حَفِيْظُ হে হেফাজতকারী, يَا وَدُوْدُ হে প্রেমময়, يَا غَفُوْرُ হে ক্ষমাকারী, يَاذَا الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ হে মহিমাময়, মহানুভব, يَا

مَانِعُ হে প্রতিরোধকারী।

যখন যে নামে আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে চান ডাকুন। আল্লাহ আপনার ডাক কবুল করতে প্রস্তুত। আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى.

'হে নবী আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ নামে ডাক অথবা রহমান নামে ডাক; তোমরা যে নামেই ডাক (একই কথা)। কেননা সমূহ সুন্দর নাম তো তারই।' –সূরা ইসরা (১৭) : ১১০

আরো ইরশাদ হয়েছে–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ۝

'আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো কাছেই। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে তখন তার ডাকে আমি সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক। যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়।' –সূরা বাকারা (২) : ১৮৬

এ আয়াতে দুআ কবুল হওয়ার যেমন সুসংবাদ রয়েছে, পাশাপাশি আমাদের কর্তব্যের বিষয়ও বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ যখনই আল্লাহর ডাক আসবে তখনই সে ডাকে লাব্বাইক বলা এবং তাঁর বিধানের সামনে সমর্পিত হওয়া আমার কর্তব্য।

রোগ-শোক থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যেসব দুআ শেখানো হয়েছে মুনাজাতেও সেগুলো বলুন। পাশাপাশি এ বিষয়গুলোও মুনাজাতে চাইতে থাকুন– (উদাহরণস্বরূপ)

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِيْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَعْمَالِ وَالْأَدْوَاءِ.

'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে মন্দ স্বভাব, মন্দ প্রবৃত্তি, মন্দ কর্ম ও মন্দ রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে রাখুন।' –মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১৯০৭, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯৬০

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُوْنِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে শ্বেতরোগ, পাগল হওয়া, কুষ্ঠ রোগ এবং সকল প্রকার জটিল রোগ থেকে আশ্রয় গ্রহণ করছি।' –সুনানে আবু দাউদ,

হাদীস ১৫৫৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩০০৪

পঞ্চম কাজ : পাক-পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও পরিপাটি থাকা। এগুলো ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো স্বতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। পাশাপাশি সুস্থতা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অপরিসীম। তাই এ বিষয়গুলোর প্রতি সর্বাবস্থায়ই যত্নবান থাকা চাই।

ষষ্ঠ কাজ : স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ইসলাম আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন ও ধর্ম। এই দ্বীন পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণ। এর বিধানগুলোও পরিপূর্ণ এবং সর্বকালীন। এজন্য এর শিক্ষা ও বিধান খুবই যৌক্তিক, খুবই সহজ এবং খুবই স্বভাবজাত হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলাম চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়ার এবং তাদের পরামর্শ ও সেবা গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। তবে দুই শর্তে–

এক. তাদের পরামর্শ শরীয়তের বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়া।

দুই. বৈধ উপকরণ হিসেবে তা গ্রহণ করা।

নতুবা সুস্থতা, সুরক্ষা ও আরোগ্যের ক্ষেত্রে প্রধান কর্তব্য হল, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। তিনিই খালিক, তিনিই মালিক, তিনিই রাব্বুল আলামীন। একমাত্র তিনিই আমাদের মাওলা ও অভিভাবক এবং তিনিই আমাদের সবকিছু।

স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের সতর্কতামূলক কিছু পরামর্শ

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ হতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পাঁচ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। যথা :

এক. ভালোভাবে সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে।

দুই. হাত না ধুয়ে চোখমুখ ও নাক স্পর্শ না করা।

তিন. হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় মুখ ঢেকে রাখা।

চার. অসুস্থ পশু বা পাখির সংস্পর্শে না আসা।

পাঁচ. মাছ-গোশত ভালোভাবে রান্না করে খাওয়া।

এগুলো আসলে শরীয়তের বিধান– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, সচেতনতা ও নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদিরই শামিল, নতুন কিছু নয়। যেমন, হাত ধোয়ার বিষয়টি প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ওযু, কুরআন স্পর্শ করার ওযু,

সর্বাবস্থায় পাক-পবিত্র থাকার জন্য নফল ওযু ইত্যাদিতে আছে। ঘুম থেকে ওঠার পর, খাবারের আগে-পরে হাত ধোয়ার নিয়ম আছে। ফরয গোসল, সুন্নত গোসলেও শুধু হাত ধোয়া নয়, পূর্ণ ওযুই রয়েছে। হাঁচির ক্ষেত্রে তো মুখ ঢাকার কথা হাদীস শরীফে পরিষ্কারভাবে আছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهٗ بِيَدِهٖ أَوْ بِثَوْبِهٖ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ.

'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি হাত দিয়ে বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন এবং আওয়াজ নিচু করতেন।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭৪৫

হাই তোলার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখার এবং সম্ভব না হলে হাত দিয়ে মুখ আবৃত রাখার আদেশ আছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهٗ مَا اسْتَطَاعَ.

'তোমাদের কারো যদি হাই আসতে চায় তাহলে যথাসম্ভব দমন করবে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২৮৯

আরো ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهٗ عَلٰى فِيْهِ.

'তোমাদের কারো যদি হাই আসতে চায় তাহলে সে যেন মুখে (যথাসম্ভব কাপড়সহ) হাত রাখে।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭৪৬

পানি পান করার সময় পাত্রে নিশ্বাস না ফেলার নির্দেশনাও হাদীস শরীফে এসেছে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ.

'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে নিশ্বাস ফেলতে বা ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৮৮৮

ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাহারাত -পবিত্রতা তো অনেক ওপরের বিষয় এবং এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এর বাইরে ইসলামী শরীয়তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতিই অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতারই একটা অংশ হল প্রয়োজন হলে হাত ধোয়ার সময় মাটি বা সাবান ব্যবহার করা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বীন-দুনিয়ার কোনো ফায়েদা ছাড়া অনর্থক ঘোরাঘুরির বিষয়ে

নিম্নোক্ত হাদীসে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ.

'তোমার জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয় আর নিজের গোনাহের জন্য কান্নাকাটি কর।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪০৬

আসলে আমাদের উদাসীনতা এত বেশি বেড়ে গেছে যে, দৈনন্দিন জীবনের অনেক মাসআলা-মাসায়েল, সুন্নত ও আদব সম্পর্কেও আমরা বেখবর!!

এ সময়ে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ

দান-সদকা অনেক বড় নেক আমল। এটি সবসময়েরই আমল। কিন্তু ব্যাপক সংকট-সংকীর্ণতার মুহূর্তে দান-সদকার গুরুত্ব ও ফযীলত আরো বেশি। এতে সওয়াবও বেশি হয় এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে দান-সদকার মাধ্যমে আল্লাহর অসন্তুষ্টি-ক্রোধ নির্বাপিত হয়। বালা-মসিবত দূর হয়।

এই মহামারির সময়ে কাজ হারিয়ে অনেকেই সংকটে পড়বেন। সুতরাং প্রত্যেকেরই উচিত নিজেদের আশেপাশে বা অন্য যে কোনো এলাকায় এ ধরনের মানুষ খোঁজ করে করে নগদ অর্থ বা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী–যেখানে যেটা প্রয়োজন–তাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। এর দ্বারা যেমনিভাবে প্রয়োজনগ্রস্তের প্রয়োজন পুরো হবে, তেমনি ইনশা-আল্লাহ তা এই মহামারি বিদূরিত হওয়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখবে।

একথা প্রমাণিত যে, দান-সদকা দ্বারা বালা-মসিবত দূর হয় এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর হাদীসে এসেছে–

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ.

'নিশ্চয় দান-সদকা আল্লাহর গযব-ক্রোধকে নির্বাপিত করে এবং খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৬৪, শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৩০৮০, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩৩০৯

শেষ কথা

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা চিন্তাশীল ও সুদৃষ্টিসম্পন্নদের উদ্দেশে হুকুম করেছেন–

فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِى الْاَبْصَارِ.

'সুতরাং হে চক্ষুষ্মানেরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।' –সূরা হাশর (৫৯) : ২

বিপদাপদ আসার মধ্যে বড় হেকমত এই থাকে যে, মানুষ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। চলমান মহামারি থেকে শিক্ষা গ্রহণের অনেক কিছু আছে। আমরা শুধু কয়েকটি বিষয় আলোচনা করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এখান থেকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

১. এক ভাইরাসের কারণে পুরো দেশ নয়, বরং পুরো দুনিয়া পেরেশান! আমরা কি কখনো ভেবেছি, একেক কবীরা গোনাহ কত বড় ভাইরাস! আমরা কি তা থেকে বাঁচার সংকল্প করেছি এবং বেঁচে থাকার কর্মপন্থা গ্রহণ করেছি?

২. ভাইরাসের ভয়ে কত মুবাহ (সাধারণ বৈধ) কাজ আমরা কত সহজে ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা কি তা থেকে এই শিক্ষা নিয়েছি যে, যেসব অপরাধ ও অশ্লীল কাজের কারণে এই আযাব এসেছে আমরা সেগুলোও ছেড়ে দেওয়ার ইহতেমাম করব?

৩. ভাইরাসের ভয়ে আমরা আমাদের মনের সব চাহিদা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তো আল্লাহ তাআলার পাকড়াওয়ের ভয়ে, জাহান্নামের আযাবের ভয়ে এবং দোযখের আগুনের ভয়ে কি আমরা হারাম খাহেশাতগুলো ছেড়ে দেওয়ার ফিকির করব না?

৪. এ সময় জনগণের সুস্থতা রক্ষার জন্য আমাদের রাষ্ট্র ও তার অধীনে সকল সংগঠন মাশা-আল্লাহ সবদিক থেকে তৎপর। অতএব জনগণের ঈমান-আমল, শান্তি-নিরাপত্তা, তাদের জীবনাচার ও কর্মকাণ্ডের হেফাজতের জন্য রাষ্ট্র কি তার দায়িত্বগুলো স্মরণ করবে না? এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল, কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের বিপরীত সকল নিয়ম-নীতি বাতিল করে আল্লাহর মাখলুককে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক পরিচালনা করা। আল্লাহ প্রদত্ত রাষ্ট্র-ক্ষমতা আল্লাহর বিধান মোতাবেক পরিচালনা করা। এর জন্য প্রয়োজন শুধু হিম্মত ও দৃঢ় সংকল্প; আর কিছু নয়। আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফীক প্রার্থনা করে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ইনশা-আল্লাহ সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে।#

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[এপ্রিল-মে ২০২০ ঈ.]

প্রসঙ্গ : করোনা ভাইরাস

অমূলক ভীতি ও অস্থিরতার নাম সতর্কতা নয়, বরং বাড়াবাড়ি সতর্কতা কাম্য বাড়াবাড়ি পরিত্যাজ্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، أَمَّا بَعْدُ!

কোনো ভূমিকা ছাড়াই বিষয়টি নিয়ে কিছু জরুরি নিবেদন পেশ করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তাআলাই তাওফীকদাতা।

প্রথম নিবেদন

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি মুসলমানদের মন-মানসে দৃঢ়ভাবে গেঁথে নেওয়া উচিত তা হল– আল্লাহ তাআলা হক আকীদা ও ইসলামী শরীয়তের মাধ্যমে আমাদেরকে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর কাছে আছে শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞান আর আমাদের মুসলমানদের কাছে চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও আল্লাহ প্রদত্ত আরো দুটি তোহ্ফা রয়েছে– ঈমানী আকীদা ও ইসলামী শরীয়ত। সুতরাং মুসলিমগণ মহামারি বা অন্য কোনো ব্যাধির প্রতিকারে বিজ্ঞানের নামে প্রচারিত সব ধরনের কথা এবং যে কোনো ধরনের কর্মপদ্ধতি ঢালাওভাবে গ্রহণ করতে পারে না; বরং এক্ষেত্রে সে তার ইসলামী আকীদা ও শরীয়তকেও সামনে রাখবে।

দ্বিতীয় নিবেদন

ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের মতো নব্য জাহেলিয়াতে আক্রান্ত অনেক মানুষের মাঝেও এ ধ্যান-ধারণা রয়েছে যে, কিছু রোগ এমন যা নিজ শক্তিবলেই সংক্রমিত হতে পারে। যেন আল্লাহ তাআলার কুদরত ও তাকদীরের বাইরে এ রোগ নিজেই কাউকে আক্রান্ত করার শক্তি রাখে। কোনো সন্দেহ নেই, এটা কুফুরি ও শিরকি আকীদা, ঈমান ও তাওহীদ পরিপন্থী আকীদা।

রোগ-ব্যাধি সব আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। ওষুধও সৃষ্টি করেছেন তিনি। শেফাও তাঁর হাতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً، إِلَّا قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ.

'আল্লাহ যে রোগই সৃষ্টি করেছেন তার জন্য শেফারও ব্যবস্থা রেখেছেন। কেউ তা জানতে পেরেছে। আর কেউ জানতে পারেনি।' –মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৩৫৭৮

إِنَّ اللّٰهَ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ، خَلَقَ الدَّوَاءَ، فَتَدَاوَوْا.

'আল্লাহ যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। তাই তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর।' –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২৫৯৬

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

'প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে। তাই মানুষ যদি রোগের (সঠিক) ওষুধ পেয়ে যায় আল্লাহ তাআলার হুকুমে আরোগ্য লাভ হয়।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২০৪

খালিক ও মালিক তো শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোনো কিছুই তাঁর কুদরত ও তাকদীরের বাইরে নয়। জীবন-মরণ, কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-ক্ষতি, উপকার-অপকার সব কিছু তাঁরই হাতে–

لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ.

'সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও তাঁরই।' সুতরাং রোগ-ব্যাধি নিজ শক্তিবলে সংক্রমিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে–এজাতীয় শিরকি আকীদা-বিশ্বাসের ইসলামে কোনো স্থান নেই।

তবে এটি একটি বাস্তবতা যে, কিছু রোগ-ব্যাধি এমন আছে, তাতে আক্রান্ত ব্যক্তির সংশ্রব আল্লাহর হুকুমে কখনো কখনো অন্যের জন্য আক্রান্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ রকম বাহ্যিক কারণপ্রসূত সংক্রমণ, যা আল্লাহর হুকুমে হয়ে থাকে, পূর্ববর্ণিত আকীদায়ে তাওহীদের পরিপন্থী নয়; বরং আল্লাহর সৃষ্ট অন্যান্য বাহ্যিক কারণের মতো এটাকেও ইসলামী শরীয়ত একটি কারণ হিসেবে স্বীকার করে এবং এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে জোর তাগিদ করে যে, এক্ষেত্রে কোনো অমূলক ধারণা ও ওয়াস্‌ওয়াসার পিছে পড়া যাবে না। ইসলামে সতর্কতা কাম্য, কিন্তু অমূলক ধারণা ও ওয়াস্‌ওয়াসার অনুগামী হওয়া নিষেধ।

করোনা-মহামারিটি যদিও নতুন, কিন্তু মহামারি তো নতুন কিছু নয়। তা ছাড়া

আল্লাহ তাআলার হুকুমে নতুন নতুন রোগও মহামারির রূপ ধারণ করতে পারে। মহামারি ও অন্যান্য বিপদ-আপদ-দুর্যোগ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহয় যে হেদায়েত ও বিধিবিধান বিদ্যমান, পূর্বসূরি মনীষীগণ নিজ নিজ যুগে সেগুলোর ওপর যেভাবে আমল করেছেন– কুরআন-সুন্নাহর সে হেদায়েত এবং সালাফের সে কর্মপন্থা আজও সংরক্ষিত আছে, কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে এবং সর্বদা নতুন নতুন সব মহামারি-মসিবতেও পথনির্দেশ করতে থাকবে।

তৃতীয় নিবেদন

যে ভয় ও শঙ্কা মানুষকে হতাশ ও হতোদ্যম করে দেয় তা নিষিদ্ধ। মানুষ ভয় ও শঙ্কায় থাকবে তো কবরের জিন্দেগির ব্যাপারে, হাশরের ভয়াবহ অবস্থার ব্যাপারে। হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা চিন্তা করে। অথচ এখানেই ইসলাম ভারসাম্য রক্ষার হুকুম দিয়েছে। ভয়ের সঙ্গে আশা রাখার তাগিদ দিয়েছে এবং আশার সঙ্গে ভয় রাখার তাগিদ করেছে। যেন ভয়ের নামে নিরাশায় নিপতিত না হয় বা আশার নামে আত্মপ্রবঞ্চনার স্বীকার না হয়।

তো যেহেতু আখেরাতের ভয়ের ব্যাপারেই ইসলামে ভারসাম্য রক্ষা করা কাম্য, তাহলে অন্যান্য বিষয়ের ভয়, যা শুধু স্বভাবজাত বিষয় মাত্র, সেক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন কীভাবে বৈধ হতে পারে?

ইসলামে আল্লাহর ওপর ভরসার এত গুরুত্ব এজন্যই যে, যাতে মুসলমানের ওপর অন্য কোনো কিছুর ভয় এত প্রবল হতে না পারে, যা তাকে নিরাশ করে ফেলে বা নিজ দায়িত্ব ও কর্মে উদাসীন করে দেয়।

ইসলামে অমূলক ধারণা ও ওয়াসওয়াসার পিছে পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার একটা হেকমত এটাও যে, তা মানুষকে অযথা আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলে। যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই মুমিন বান্দার শান।

চতুর্থ নিবেদন

ইসলামী শরীয়তে সতর্কতার বিধান রয়েছে, কিন্তু অমূলক ভীতি ও শঙ্কায় নিপতিত হওয়া নিষেধ। এজন্য সতর্কতামূলক বৈধ উপায়-উপকরণ তো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু নিছক ধারণা ও অমূলক ভীতির স্বীকার হয়ে দ্বীনী বা জাগতিক কোনো দায়-দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামাতের সঙ্গে মসজিদে আদায় হওয়া

ওয়াজিব। জুমার নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করা ফরয। উভয়টি ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিআর (পরিচয়-চিহ্ন)। কিছু কিছু বাস্তব ওজরে জুমা ও জামাতে শরিক না হওয়ার অবকাশ তো শরীয়তে আছে, সে ছাড় অবশ্যই গ্রহণ করা দরকার; কিন্তু অমূলক ধারণাপ্রসূত শঙ্কা ও ভীতির কারণে জুমা ও জামাতের ওপর পাবন্দি লাগানো বা মসজিদ বন্ধ করার চিন্তা করা, এর কোনো অবকাশ নেই।

ধরে নিলাম, এই ভাইরাসটি এমন যে, আক্রান্ত ব্যক্তির সংশ্রব অন্য ব্যক্তির আক্রান্ত হওয়ার একটি কারণ। গোড়াতেই তো এটা একটা সম্ভাবনা মাত্র। অর্থাৎ আক্রান্ত হতেও পারে, নাও পারে। তথাপিও এ সম্ভাবনাকে আমলে নিয়ে, যার মোটামুটিভাবে একটা ভিত্তি আছে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা নিষেধ নয়; বরং একটা পর্যায় পর্যন্ত কাম্যও বটে। এ কারণে এ ধরনের রোগে যিনি আক্রান্ত হয়ে গেছেন বা আক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে, তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হল, সে নিজেও সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং অন্যরাও তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। তার সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব সতর্কতার সঙ্গেই আদায় করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন তো আসে তখন যখন সম্ভাবনার সীমানা পার হয়ে দলিল-প্রমাণবিহীন ধারণার ভিত্তিতে সতর্কতার নামে বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে যায় নতুবা সাবধানতা ও সতর্কতা যতটুকু সম্ভব, গ্রহণ করা কাম্য।

এটা তো সবারই জানা, নামাযের জন্য যাওয়ার সময়ই ওযু অবস্থায় থাকা ভালো। অর্থাৎ নামাযের উদ্দেশে বের হওয়ার আগেই ওযু-তহারাত সেরে নেওয়া এমনিতেই মুস্তাহাব আর এই মুস্তাহাবকে আমলে আনার এটাই উপযুক্ত সময়। আর এটাও সবাই জানে, ফরয নামাযের আগে-পরে যে সুন্নত-নফল রয়েছে সেগুলোতে জামাতের বিধান নেই। একা পড়ার নামায এগুলো। স্বাভাবিক অবস্থায়ও ঘরে পড়লে সমস্যা নেই। একারণে এ বিশেষ পরিস্থিতিতে সুন্নত ও নফল নামায ঘরে পড়ার মশওয়ারা দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে লম্বা দুআ-ওযিফা ও যিকির-আযকার, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল, নিজ নিজ ঘরে বসেও আদায় করা যায়, এগুলো মসজিদেই আদায় করতে হবে, এমন কোনো মাসআলা নেই। তা ছাড়া বিশেষ পরিস্থিতিতে নামায সংক্ষেপ করারও অবকাশ আছে। মাসনূন কেরাতের সবচেয়ে কম পরিমাণের ওপর আমল করার সময়ই এখন। বলার উদ্দেশ্য হল, শরীয়ত যেসব বিষয়ে রুখসত (ছাড়) দিয়ে রেখেছে, তা গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু

যেসব বিষয় ইসলামের শিআরের অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোতে সতর্কতার নামে অমূলক ধারণার ভিত্তিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা বা নিরুৎসাহিত করার সুযোগ নেই। যেমন, সালাম ইসলামের শিআর (পরিচয়-চিহ্ন)। কোনো মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়া সুন্নতে মুআক্কাদা। সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। কেউ যদি সংক্রমণের ভয়ে সালাম থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা হবে অন্যায়। পক্ষান্তরে মুসাফাহা হল একটি ঐচ্ছিক মুস্তাহাব আমল। তাই এ ধরনের বিশেষ অবস্থায় মুসাফাহা থেকে বিরত থাকতে কোনো সমস্যা নেই। তবে মুসাফাহা থেকে বিরত থাকলে এমন নিয়ত করবে না যে, আমি তার কারণে আক্রান্ত হতে পারি, বরং এ নিয়ত করবে, আমি যেন তার ক্ষতি বা বিরক্তির কারণ না হই।

উল্লেখ্য, আক্রান্ত বা আক্রান্ত হওয়ার বিশেষ লক্ষণধারী ব্যক্তিরা নামাযের জামাতে যাবেন না। তেমনি বৃদ্ধব্যক্তি, যার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম, বিশেষত যারা আগে থেকেই জটিল রোগে আক্রান্ত, তাদের জন্য এ ধরনের ক্ষেত্রে মসজিদের জামাতে না যাওয়ার সুযোগ আছে। আর যাদের বাহ্যিক কোনো ওজর নেই এবং যাওয়ার হিম্মতও আছে তারাও সতর্কতা ও সাবধানতার যাবতীয় ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করবেন।

বাড়াবাড়ির আরো কিছু নমুনা

১. নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি এক ব্যক্তি পশ্চিমের কোনো দেশ থেকে দেশে ফিরেছেন। এয়ারপোর্টগুলোতে জায়গায় জায়গায় তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। সকল পরীক্ষায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তার মধ্যে ভাইরাস নেই। এভাবে তিনি ঢাকায় পৌছান।

উন্নত রাষ্ট্রগুলো থেকে ভাইরাসমুক্ত হওয়ার সনদ ধারণ করা সত্ত্বেও তার ভাইয়েরা তাকে ঘরে জায়গা দেয়নি। অবশেষে তাকে কোনো হোটেলে তোলা হয়েছে। হোটেলে উঠতে না উঠতেই হোটেল কর্তৃপক্ষ কীভাবে যেন জানতে পেরেছে, এ লোক বিদেশ থেকে এসেছে। ব্যস, তারা পুলিশকে খবর দিয়ে দেয়। পরিস্থিতি টের পেয়ে এ ব্যক্তি কোনোমতে সেখান থেকে কেটে পড়তে সক্ষম হয়।

এবার বলুন, এটাকে ওয়াসওয়াসা-প্রবণতা না বলা হলে আর কী বলা হবে!!

আরো জানা গেছে যে, এই রোগে আক্রান্ত কোনো মাইয়েতকে সতর্কতা অবলম্বন করে এক কবরস্থানে দাফন করতে নেওয়া হলে এলাকার লোকেরা

বাধা দিয়েছে। ফলে লাশ অন্য কোথাও নিতে হয়েছে। এটা অপ্রয়োজনীয় ভয় এবং নিছক ওয়াস্‌ওয়াসা। এটা হল নিজেদের মওতের ব্যাপারে গাফলত, যেন এদেরকে মরতে হবে না!

২. আমাদের দেশে এখন ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। এ সময় সর্দি, কাশি, ঠাণ্ডা, জ্বর মামুলি বিষয়। ঘটনাচক্রে এগুলোই নাকি করোনা ভাইরাসের প্রাথমিক লক্ষণ। এখন সাধারণ জ্বর-ঠাণ্ডায় আক্রান্ত রোগীদের কত শতাংশের মধ্যে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এর তোয়াক্কা না করে শুধু সর্দি-জ্বর দেখেই যদি ডাক্তারগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসা করতে প্রস্তুত না হন, তাহলে বিষয়টি কেমন হবে? এমনিভাবে যেহেতু যেকোনো রোগীর ব্যাপারেই আশঙ্কা থাকে যে, তার মধ্যে হয়ত ভাইরাস আছে; এ কারণে যদি তাকে হাসপাতালে জায়গা না দেয় এবং ডাক্তাররা তার চিকিৎসা না করে, তাহলে সতর্কতার নামে এসবই বাড়াবাড়ি। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। হাঁ, এক্ষেত্রে সরকারেরও দায়িত্ব– তাঁদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা।

৩. এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের একটি হক হচ্ছে, কোনো মুসলিম অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করা। আরেকটি হক হচ্ছে, তাকে সহায়হীনভাবে নিঃসঙ্গ ছেড়ে না দেওয়া।

এই ভাইরাসে যে আক্রান্ত হয়েছে– এই হক তারও প্রাপ্য। প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে তার এই হক আদায় করাও জরুরি। ভীতি ও শঙ্কার কারণে সংশ্লিষ্ট কেউই তার এই হক আদায় করবে না– এটা জায়েয নেই। আর যদি নিছক ধারণার ভিত্তিতে কোনো মুসলমানের এই হক নষ্ট করা হয়, তাহলে তো তা আরো বড় গোনাহ।

৪. আতঙ্ক ও ভয়ের ছুতোয় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা; এই বাহানায় মূল্যস্ফীতি ঘটানো–সবই না-জায়েয। মুসলমানদের এত আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। আখের রিযিকের মালিক তো আল্লাহই। তা ছাড়া এটাও তো চিন্তার বিষয়, আমি একাই যদি সুখে থাকতে চাই, তো সেটা কেমন সুখ হবে!?

৫. যেসব কার্যকলাপের কারণে মানুষের মাঝে অনর্থক আতঙ্ক বৃদ্ধি পায় সেগুলোও বাড়াবাড়ি। এগুলো পরিত্যাজ্য।

৬. তাউনের (এক প্রকারের মহামারি) ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوْا

فِرَارًا مِنْهُ.

'যখন তোমরা জানতে পারবে কোনো এলাকায় তাউন বিরাজ করছে তখন তোমরা সেখানে যাবে না। আর তোমাদের অবস্থিত অঞ্চলে তাউন আপতিত হলে তোমরা সেখান থেকে পলায়নের নিয়তে বের হবে না।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৩০, সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২১৯

এই হাদীসের ফিতরি ও স্বাভাবিক অর্থ হল, যে নির্দিষ্ট মহল্লা বা এলাকায় বাস্তবেই এ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে ওখান থেকে কেউ যেন বের না হয় এবং বাইর থেকেও কেউ যেন ওখানে না আসে। এটা তো স্পষ্ট যে, হাদীসে 'আরদুন' বলতে উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট এলাকা, যা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা যেন এভাবে করছেন যে, এখানে 'আরদুন' অর্থ দেশ-মহাদেশ। আবার কেউ এমন অর্থও করছেন যে, আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় কেউ ঘর থেকেই বের না হওয়ার কথা বলা হয়েছে এই হাদীসে। এটা হাদীসের মর্ম নয়। বাকি চিকিৎসাবিজ্ঞানের দাবিতে এমন করতে হলে করতে কোনো বাধা নেই, তা তো ভিন্ন প্রসঙ্গ।

৭. অযথা ভয় ও আতঙ্কের একটা প্রকাশ এটাও যে, কিছু লোক এ ধরনের রোগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির গোসল, কাফন-দাফনের ব্যাপারেও দোদুল্যমান হয়ে পড়েছে। মনে রাখতে হবে, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো এবং নিয়মমতো দাফন করা ইত্যাদি বিষয় জীবিতদের ওপর ফরয হক। এ ধরনের রোগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এই হক বলবৎ থাকে। তার বিষয়টি ভিন্ন নয়।

তাদের গোসল দেওয়া ও কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে যদি বাস্তবেই অন্যদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের তো উপায় আছে। এ ধরনের রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও নার্সরা যে ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা গ্রহণ করে গোসল ও কাফন-দাফনের কাজ করতে তো কোনো অসুবিধা নেই।

আল্লাহ না করুন, মুসলিম অধ্যুষিত কোনো এলাকায় যদি মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সতর্কতাসহ মৃতের গোসলের জন্য প্রয়োজন-সংখ্যক আলাদা গোসলখানা স্থাপন করা যেতে পারে।

তবুও যেন কোনো মৃত ব্যক্তিকে গোসল-কাফন ও জানাযা ছাড়া দাফন করা না হয়। মৃত ব্যক্তির হক নষ্ট করে আমাদের জীবিত থাকার কী অধিকার আছে? মানুষ জীবিত হোক বা মৃত আল্লাহর কাছে সম্মানিত। ভাইরাসের

কারণে এ সম্মান খতম হয়ে যায় না। জীবিত মানুষের মধ্যে ভয়-আতঙ্ক এত প্রবল না হওয়া চাই যে, সে এই মানবিক মর্যাদার মূল্যায়ন করতেও অক্ষম হয়ে পড়ে।

স্বাভাবিক অবস্থাতেও মাসনূন তরিকায় মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচ্য যে, গোসল যেন সতর্কতার সঙ্গে দেওয়া হয়, যাতে গোসলের পানির ছিটা থেকে বাঁচা সম্ভব হয়। এটাও আদব যে, মাইয়েতের গোসলের পানি যেন যত্রতত্র প্রবাহিত করা না হয়। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এ যুগে এ সুন্নত ও আদবের ওপর আমল করা কোনো মুশকিল বিষয় নয়। এজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যত প্রয়োজন অবশ্যই গ্রহণ করুন। তবে মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন-দাফনের ফরয আদায়ে যেন কোনো শিথিলতা না হয়। অবশ্য একান্ত ঠেকা হলে এ ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের অবকাশের কথাও বলেছেন কোনো কোনো আলেমে দ্বীন।

শেষ নিবেদন

এই মহামারি থেকে মানবজাতির শেখার মতো বিষয় তো অনেক। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবগুলোর আলোচনা করাও মুশকিল। তবে একটি বিষয় না বললেই নয়, তা হল বনী আদম তথা মানব জাতির উচিত, এ থেকে নিজেদের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের উপলব্ধি লাভ করা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমুনার সামনে দুনিয়ার বড় বড় পরাশক্তিগুলো কত অক্ষম, কত অসহায়!!

কেউ যদি ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়গুলো নিয়ে একটু ভাবে তো নিজ অক্ষমতা, অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে সে তার সব ধরনের অহমিকা-অহংকার ও গরিমার চিকিৎসা করতে পারে। কিন্তু বড়ই আফসোস হয়, যখন বিপরীত দৃশ্য সামনে আসে। এ ঘটনা থেকে বিনয়ের শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে উল্টো কিছু লোকের জবান থেকে এমন এমন কথা বের হয়, যা থেকে অহংকার টপকে পড়ে। এ ধরনের দাবি আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়। এসব দাবির পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। আল্লাহর দেওয়া উপায়-উপকরণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বৈধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ রোগ থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা উচিত। আক্রান্ত হয়ে গেলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে এর চিকিৎসা করানো উচিত এবং সর্বাবস্থায় তওবা-ইস্তেগফার ও যিকির-দুআর বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। তো বিষয়টি হচ্ছে

সতর্কতা অবলম্বন এবং চিকিৎসা গ্রহণের, শত্রুতা এবং যুদ্ধের নয়!
আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে সব ধরনের মহামারি ও বিশৃঙ্খলা থেকে হেফাজত করুন। বিশেষ করে উম্মতে মুসলিমাকে সকল অকল্যাণ ও পেরেশানি থেকে নিরাপদ রাখুন। সব ধরনের বালা-মসিবত ও মহামারি থেকে আপন হেফাজতে রাখুন। উম্মতের মজলুমানকে জুলুম থেকে নাজাত দান করুন, আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন! #

[এপ্রিল-মে '২০২০ ঈ.]

বয়ান

মা ইনদাকুম ইয়ানফাদু...

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ...

হামদ ও সালাতের পর। লাইলাতুল জুমুআ ও ইয়াওমুল জুমুআ গুরুত্বপূর্ণ সময়। বিশেষ কিছু আমলও রয়েছে এদিন। দরূদ শরীফ বেশি বেশি পড়া, সূরা কাহ্ফের তেলাওয়াত করা। আর অন্যান্য আমল তো আছেই। জুমাকেন্দ্রিক হাদীস শরীফে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, শুধু জুমার রাতকে শবগোযারির জন্য খাস করো না। শুধু জুমার দিনকে রোযার জন্য খাস করো না। অন্য কোনো দিন রোযা রাখে না, শুধু জুমার দিন রাখে, অন্য কোনো রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না, শুধু জুমার রাতে পড়ে, এমনটা করো না। হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। এই নিষেধের কী অর্থ? তার মানে অন্যান্য দিন যেহেতু করো না, জুমার দিনও করো না—হাদীসের উদ্দেশ্য কি এটা? উদ্দেশ্য হল, বিশেষ ফযীলত মনে করে শুধু এ রাতেই তাহাজ্জুদ পড়ছ, বিশেষ ফযীলত মনে করে শুধু এই দিনেই রোযা রাখছ—এটা ঠিক না।

কোনো সময়ের গুরুত্ব থাকলে সে গুরুত্বটা আমি কীভাবে অর্জন করব? কোনো সময়ের বিশেষ ফযীলত থাকলে সে ফযীলত হাসিল করব কীভাবে, সেটাও শরীয়তের শেখানো পদ্ধতিতে করতে হবে। শরীয়তের হুকুমের মতো করে নিজের থেকে একটা আমল নির্ধারণ করে নেওয়া, এটা ঠিক নয়। রাতের কিছু অংশ ইবাদত-বন্দেগিতে কাটানো, এটা তো প্রতি রাতের-ই বিধান। তেমনি নফল রোযা যদি সম্ভব হয়, যেকোনো দিনেই হতে পারে। কিন্তু নিজের থেকে শুধু এই রাতকেই খাস করে নেওয়া যে, এই রাতেই তাহাজ্জুদ পড়ব, এই দিনেই শুধু রোযা রাখব, এমনটা ঠিক না।

এই হাদীসে অনেক শিক্ষা আছে। একটি শিক্ষা হল, শুধু ব্যাপক ফযীলতের ভিত্তিতে বিশেষ ইবাদত আবিষ্কার করা যে বেদআত, সে বেদআতের খণ্ডন এই হাদীসে আছে। আরেকটা হল, এই আমলগুলোর প্রতি অন্য সময়ও যত্ন নিতে হবে। অন্যান্য রাতেও যদ্দুর পারা যায় তাহাজ্জুদের প্রতি খেয়াল রাখা। যার দ্বারা সম্ভব নফল রোযা রাখা। সোমবার, বৃহস্পতিবারের রোযা তো আছেই।

যাহোক, আমি 'শবগোযারি' শব্দ বলেছি। হাদীসে আছে 'কিয়াম'। হাদীসের পাঠ–

لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ، وَلَا تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.

'কিয়াম' মানে রাতজাগা। রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগি করা। কিয়াম শব্দ বলে যেসব ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত তার মধ্যে প্রথমেই হল নামায। যদিও অন্যান্য ইবাদতও আছে; কিন্তু নফল নামাযের প্রতি-ই ইঙ্গিত বেশি হয়। যেহেতু এখানে রাত জাগার বিষয়টা রয়েছে, সেজন্য আমি শবগোযারি শব্দ বলেছি। কিন্তু আমাদের ওরফে আবার 'শবগুযারি' শব্দ বিভিন্ন পরিভাষার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাবলীগের কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের শবগোযারি হল সাধারণত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে। বিভিন্ন পয়েন্টে সবাই জড়ো হয়, সেখানে কিছু বয়ান হয়, কিছু ইনফেরাদি আমল হয়, রাতে থাকা হয়।

আবার যারা কোনো বুযুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, কিছু ইসলাহী ফিকির করেন, তাদের ওখানেও শবগোযারি আছে। তাবলীগের শবগোযারিটা সাধারণত সাপ্তাহিক আর ওটা হয় সাধারণত মাসিক। এক রাত বা দু-তিন রাতও হয়। সেটাকে ইসলাহী জোড়ও বলে।

শবগোযারি এটা ফার্সি শব্দ। শব মানে রাত। গুযার্না মানে যাপন করা। শবগোযারি মানে রাতযাপন করা। কিন্তু এগুলো হল একটা ব্যবস্থাপনাগত বিষয়। এটাকে মাসআলার মতো করে পালন করা যায় না এবং এটা শুধু ইবাদতের জন্য নয়, তালীম ও আলোচনাসহ বিভিন্ন মাকসাদে হতে পারে। সঙ্গে কিছু ইবাদত-বন্দেগিও হল। হাদীস শরীফে যে বলা হয়েছে, শুধু এই রাতকে কিয়ামুল লাইলের জন্য খাস করবে না এবং এই দিনকে রোযার জন্য খাস করবে না, ওই নিষেধাজ্ঞার আওতায় মনে হয় এটা পড়ে না। তাবলীগের শবগোযারি বা খানকার দ্বীনী মজলিসগুলো ওই নিষেধাজ্ঞার আওতাতে আসবে না মনে হয়। কারণ এটা ইন্তেযামি বিষয়।[1]

যাহোক, আমরা জড়ো হলাম, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই জড়ো হওয়া এবং বসাকে কবুল করুন। যে ফিকির নিয়ে বসেছি সে ফিকির যাতে

---

১. আলোচনার মাঝে হযরত মুদীর সাহেব হুজুর এই কথা যুক্ত করেন যে, এটা তো জুমার দিন জুমা হিসেবে করা হয় না। এটা করা হয় সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে। এজন্যই তো যখন রবিবারে ছুটি ছিল তখন এই ধরনের ইসলাহী মজলিস সেই হিসেবে হত। বৃহস্পতিবারে হত না।

আমলেও বাস্তবায়ন হয় আল্লাহ তাআলা সেই তাওফীক দান করুন, আমীন।

কুরআন কারীমের সূরা নাহলে একটি আয়াত আছে–

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

'তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা ধৈর্যধারণ করে নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।' –সূরা নাহল (১৬) : ৯৬

আসলে কুরআন কারীমের তালীমের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তার একেকটা তালীম একেকটা সূত্র। এই এক সূত্র ধরে যদি মানুষ চলতে থাকে, তাহলে এটি আল্লাহ তাআলা মানুষকে যত আহকাম ও হেদায়েত দিয়েছেন, যতগুলো তালীম ও শিক্ষা দিয়েছেন সবগুলোর দিকে টেনে নিয়ে যায়। এটি কুরআন কারীমের বড় বৈশিষ্ট্য।

আমি যদি আমার ইসলাহ চাই, আমার ঈমানের তারাক্কি চাই বা আপনি যেই ভাষায়ই বলুন না কেন, দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতকেন্দ্রিক যা-ই চাই, তার জন্য বিভিন্ন ধরনের মুরাকাবা-মুহাসাবা আছে, যা আমার কাজগুলোকে সহজ করে দেয়। কুরআন কারীমে এ রকম অনেকগুলো মুরাকাবা দেওয়া আছে। মানুষ তো নিজের থেকে কত ধরনের মুরাকাবা আবিষ্কার করে। বেদআতীদের কথা বলছি। অথচ কুরআনের মধ্যে অনেক মুরাকাবার সূত্র দেওয়া আছে। এই একটি সূত্র– مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ.

'তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে।' কারণ সেটা ক্ষণস্থায়ী এবং সামান্য সময়ের বিষয়। আর وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ 'আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী।' সবসময় থাকবে। তার কোনো শেষ নেই।

এটি ইসলামী শিক্ষা এবং আল্লাহর দেওয়া হেদায়েতগুলোর মধ্যে মৌলিক একটি হেদায়েত। চিন্তা, মুরাকাবা, মুহাসাবা, নিজের ইসলাহের ফিকির যেভাবেই বলুন আপনি, সবকিছুর জন্য মৌলিক একটি সূত্র হল–

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ.

তোমাদের কাছে যা আছে, ওটা শেষ হয়ে যাবে। কোনোটার-ই কোনো স্থায়িত্ব নেই। আর আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে, তা বাকি থাকবে। এখানে একেবারে সহজভাবেই দুটি কথা এসে যায় :

এক. তোমার কাছে যা আছে তা খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে পাঠাও। যা

আছে মানে শুধু ধন-সম্পদ নয়, বরং তোমার সময় আছে, মেধা আছে, শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, মোটকথা যা আছে দুনিয়াতে তোমার, সব তাড়াতাড়ি আল্লাহ তাআলার কাছে পাঠিয়ে দাও! এমনভাবে পাঠাবে, যাতে তোমার এই ইতমেনান হয় যে, আল্লাহ তাআলার কাছে পৌছেছে; তাহলেই না আল্লাহর কাছে হল। আমার আমানত আল্লাহর কাছে পৌছেছে–এটা নিশ্চিত হতে হবে না?

আল্লাহর কাছে পাঠাও, তাহলে এটা স্থায়ী হবে। এটা এই আয়াতের একেবারে স্পষ্ট একটি শিক্ষা।

দুই. আরেকটি শিক্ষা হল আমরা দ্বীন ও আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে পারি না কেন? আমাদের কাছে যেগুলো আছে সেগুলোর কারণেই তো। আমার খেয়াল-খুশি, এটাও তো একটা জিনিস। مَا عِنْدَكُمْ-এর মধ্যে তো এটাও আছে। এই খেয়াল-খুশির পেছনে পড়ে কারো ইবাদত-বন্দেগিতে ত্রুটি হয়, কারো জন্য গোনাহ থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে যায়। তো এখানে আমাকে চিন্তাগতভাবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে– مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ তুমি যে খাহেশ, মনোবাসনা এবং সাময়িক নফসের ভালোলাগা, যেগুলোর কারণে গোনাহে লিপ্ত হচ্ছ, ইবাদত ছেড়ে দিচ্ছ, এটা তো সাময়িক বিষয়। সামান্য সময়ের বিষয়। এই আনন্দ এই ফুর্তি কতক্ষণের? এই বিনোদন কতক্ষণের? একেবারেই ক্ষণিকের। কাজেই তা বাদ দিয়ে কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির কর, আল্লাহর বন্দেগি কর। গোনাহ করতে যে সাময়িক ভালোলাগা সে ভালোলাগাটা কুরবানী করে দাও। আল্লাহর কাছে পাব এই আশায়। আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর থেকে পাওয়ার আশায় যদি ছেড়ে দাও আল্লাহ তা জমা রাখবেন। কেবল বাকি-ই থাকবে না, বাড়তে থাকবে।

মানুষ অর্থের মহব্বত, ধন-সম্পদের মহব্বত, মান-মর্যাদার মহব্বত বা নিজের নফসের তাড়না এবং খাহেশের দুর্বলতায় পড়েই হয় ইবাদত ছাড়ে, নয়ত গোনাহ করে। সে কথা-ই আল্লাহ পাক বলেছেন– مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ 'তোমাদের কাছে যা আছে সব শেষ হয়ে যাবে।' وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ 'আল্লাহর কাছে যা আছে সব বাকি থাকবে।' কাজেই এগুলোর পেছনে পড়ে আল্লাহর কাছে যা তুমি আশা কর তা ছাড়বে না। বরং সেটিকেই প্রাধান্য দিতে থাক!

এমনিতে স্বাভাবিক বিচারেও যেটা ক্ষণিকের, তারচেয়ে মানুষ স্থায়ী জিনিসকে-ই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এখানে আয়াতের মধ্যে আল্লাহও সেই

সূত্রটিই ধরিয়ে দিয়েছেন। শুধু এতটুকু উপদেশ-ই যথেষ্ট ছিল যে, আমাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ওই জিনিসকে, যা আল্লাহর কাছে বাকি থাকবে। তার পরেও আল্লাহ-ই যেহেতু আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানেন, এই প্রাধান্যটা দিতে বান্দার অনেক কষ্ট হবে। যদিও আমি নীতিগতভাবে এটা বুঝি, দুনিয়ার এসব সাময়িক-ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতেরটা স্থায়ী; এই সাময়িক জিনিসটার গলত ব্যবহার করলে স্থায়ী ক্ষতি, আর তার সঠিক ব্যবহার করলে স্থায়ী ফায়েদা; কাজেই আমার স্থায়ীটাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত, কিন্তু প্রাধান্য দিতে কষ্ট হয়। এই যে কষ্ট হয়, এটা আল্লাহ তাআলা জানেন। কারণ তিনিই তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তিনি আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলেছেন–

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

আল্লাহর কাছে যা আছে তা বাকি থাকবে, তারপরেও সেটিকে যে প্রাধান্য দিতে তোমার কষ্ট হবে, ওই কষ্টটা একটু কর। একটু সবর কর। দেখ না কী হয়! সবর না করলে তো কাজ হবে না। যারা সবর করে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে সেটিকে কষ্ট করে প্রাধান্য দেয়, নিজের নফস ও মনোবাসনার বিরোধিতা করে, এই বিরোধিতা করতে গিয়ে যে কষ্ট ও সবর করল, তার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে আজর ও সওয়াব দান করবেন–

بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

যেটি তাদের আমলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আমল, সেটিকে আসল ধরে আল্লাহ তাআলা আজর দান করবেন। আরেকটা হল, সে যা আমল করেছে এরচেয়ে ভালো ও উত্তম প্রতিদান তাকে আল্লাহ তাআলা দান করবেন। সে আমল করেছে সামান্য, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিদান দেবেন এরচেয়ে বেশি ও উত্তম। দুই তরজমাই হতে পারে।

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ যদি এমনি পড়ে চলে যাই, এর আসল মর্ম ধরা মুশকিল হবে। অথচ এটা প্রথম অংশের সঙ্গে খুব গভীরভাবে জড়িত।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে মূলনীতিও দিয়েছেন আবার এই মূলনীতি যে একশভাগ সত্য, তার ওপর ঈমান ও বিশ্বাসও আছে, বুঝিও, উপলব্ধিও করি, তারপরও বাস্তব ক্ষেত্রে এর ওপর আমল করতে আমার কষ্ট হবে, এটা আল্লাহ তাআলা জানেন। সবর যদি আমি না-করি পারব না, সবর আমাকে করতেই

হবে, সেজন্য আল্লাহ তাআলা পরে সবরের ওপর প্রতিদান দেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছেন। কারণ সবরের কষ্টটুকু বরদাশত করতে হয়, না-হয় তারাক্কি হয় না, মানুষের ইসলাহ ও তারাক্কির জন্য সবরের কষ্টটুকু সহ্য করতেই হবে. সেজন্যই আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন–

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

'যারা ধৈর্যধারণ করে, নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।'

সবরের তো কয়েকটা প্রকার রয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের মধ্যেই এই কথাটা প্রযোজ্য– مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

সবরের যে প্রকারটা আমাদের কাছে বেশি প্রসিদ্ধ এবং প্রথম চিন্তাতেই যেটা আমাদের মাথায় আসে সেটা হল– اَلصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ وَالشَّدَائِدِ আপদ-বিপদ, বলা-মসিবত, কষ্ট-পেরেশানি–এসব হালাত এলে সবর করা। এটা সবরের একটা প্রকার। মসিবত তো মানুষের কত প্রকারের! এর কি কোনো শেষ আছে? একটা প্রকারের মসিবত হল, কোনো সন্তানের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এই মসিবত ও কষ্টের সময় স্মরণ করা–

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

যে সন্তানটা আমার এখনো হায়াতে আছে তারও তো সময় আসবে; আরে, এমনকি আমারও তো সময় এসে যাবে। তাহলে ওর সময় এসে গেছে তাতে কী? তাকে আল্লাহ তাআলা নিয়ে গেছেন, এতে আমার কী? তা ছাড়া সে তো থাকার জন্য আসেওনি। এসেছেই যাওয়ার জন্য। আমি যদি এটাকে এভাবে নিই যে, আল্লাহর নেয়ামত আল্লাহ নিয়ে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন! তাহলে এটা আল্লাহর কাছে জমা হয়ে যাবে। আর وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ আল্লাহর কাছে যেটা আছে সেটা বাকি থাকবে।

সবর করলে শুধু আমার সবরটা আল্লাহর কাছে জমা থাকবে, তা কিন্তু নয়; বরং সন্তানসহ জমা থাকবে। আর সে আখেরাতে আমার জন্য যখীরা হবে। আখেরাতে যখন আমার আর কোনো ব্যবস্থা হবে না তখন এ-ই আমার কাজে আসবে। সন্তানটাই আল্লাহর কাছে আমার আমানত থাকবে। আর যদি এই সবর না করতে পারি তো সন্তান হারিয়েছি তো হারিয়েছিই; সবই হারিয়েছি। কারণ বে-সবরি করলেই যে সন্তান চলে আসবে এমন তো না, তখন দুনিয়ার

জন্যও হারালাম, আখেরাতের জন্যও হারালাম। আর যদি সবর করি, তাহলে এখন যদিও হারিয়েছি, কিন্তু وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ পরকালের জন্য বাকি থাকবে এবং–

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ আর আমি সবরকারীদেরকে তাদের প্রতিদান অবশ্যই দান করব, সেসব সৎকর্মের জন্য, যা তারা করত।

তো এই যে সবর, যেমন ব্যবসায় লস হয়ে গেছে তো সবর। কারণ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ। আরে, লস না হলেও আর কত দিন-ই বা এ সম্পদ থাকত তোমার কাছে? কিন্তু সবর যদি করি তো– وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

সবর যদি করি, তো যেটা হারিয়েছি সেটাসহ জমা থাকবে। তার বিকল্প ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও দেবেন, আখেরাতেও দেবেন। বিকল্প মানে উত্তম বিকল্প। এজন্যই তো মসিবতের সময় দুআ শেখানো হয়েছে–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اؤْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا.

আল্লাহ, এই যে মসিবত এল, তার বিনিময়ে আপনি আমাকে উত্তম আজর ও প্রতিদান দান করুন এবং এর পরিবর্তে আমি যেন এরচেয়ে ভালো কিছু আপনার কাছে পাই। সেটা দুনিয়াতেও হতে পারে, আখেরাতেও হতে পারে বা উভয় জায়গায় হতে পারে। ভালো তো অবশ্যই। দুনিয়ার ভালোটা তো বাহ্যিকভাবে আসবে, কিন্তু আখেরাতের ভালোটা তো এমনিতেই স্পষ্ট। দুনিয়ার ভালোটা বাহ্যিকভাবে ভালো হলে বুঝবে যে ভালো। কিন্তু যদি অন্য কোনো দিক থেকে ভালো হয়, তাহলে নজরে পড়বে না, ভালো কি ভালো না? কিন্তু আখেরাতেরটা যে ভালো তা তো একেবারে স্পষ্ট।

সবরের আরেক প্রকার হল– اَلصَّبْرُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ 'আসসবরু আনিল মা'সিয়াহ'– গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য সবর। নফস, শয়তান ও পরিবেশ– সবাই টানছে গোনাহের দিকে (নফস আর শয়তানের সঙ্গে আরেকটা বাড়ালাম পরিবেশ। পরিবেশ বলতে আমার চারপাশও লাগে না এখন। আজকাল পরিবেশ একা একাও হতে পারে; বরং একা থাকলে গোনাহের পরিবেশ আরো বেশি জমে)। তো সব আমাকে টানছে গোনাহের দিকে, কিন্তু আমাকে সবর করতে হবে। যতই আমাকে টানুক, আমি চেষ্টা করব আল্লাহর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকতে। এই হল সবর। এটা সবরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকার এবং ফরয। ওই

সবরের চেয়ে এই সবর বড় ফরয। ওটাও ফরয, কিন্তু এটা বড় ফরয।

তো গোনাহের মধ্যেও যে একটা আনন্দ-ফুর্তি, একটা মজা ও ভালোলাগা থাকে, এটা يَنْفَدُ সাময়িক এবং সামান্য সময়ের বিষয়। কিছুক্ষণ পরে এই মজা আর থাকবে না। কিন্তু যদি এই গোনাহ থেকে বেঁচে থাক, তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা যে সওয়াব ও ফায়েদা দান করবেন, তা বাকি থাকবে। দুনিয়াতেও এর পরিবর্তে যে ভালো দিকগুলো দান করবেন, সেটিও স্থায়ী। যেহেতু সেটি নিজের ঈমান ও আমলের কাজে লাগছে এজন্য এটিও وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ-এর আওতায় চলে যাবে। আল্লাহ তাআলার কাছে জমা হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য এটিও স্থায়ী হয়ে যাবে।

সবরের আরেকটা প্রকার– اَلصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ 'আসসবরু আলাত তাআহ'- নেক আমলের জন্য সবর করা। যদিও নেক আমল করতে মন তৈরি হয় না, কিন্তু আমাকে সবর করতে হবে। ফরয নামায ছাড়া যাবে না। তেমনি নফল নামায যদিও নফল, কিন্তু আমি যেহেতু এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি বা চেষ্টা করছি কাজেই এটিও আমি ছাড়ব না। এজন্য নয় যে এটি ফরয, বরং এজন্য যে, নফলের অভ্যাস করে নেওয়া আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। পরিমাণে কম হলেও যদি তা সর্বদা করা হয়, আল্লাহ তাআলা খুব পছন্দ করেন। কাজেই একে স্থায়ী করে নেওয়ার চেষ্টা করা। চেষ্টা করা– এটি যাতে না ছোটে। তেলাওয়াত না ছোটে, তাসবীহ না ছোটে, দরূদ শরীফ না ছোটে। এই 'না-ছোটা'-এর জন্যও একটা সবরের দরকার হয়। সেটাও 'আসসাবরু আলাত তাআত'-এর মধ্যে শামিল।

যে আমল যত গুরুত্বপূর্ণ সে আমলের জন্য সবর তত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি এখানে আমি বে-সবরি করি, আজকের তেলাওয়াত ছেড়ে দিলাম বা অন্য কোনো আমল ছেড়ে দিলাম, তো কেন ছাড়লাম? দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্যই তো ছাড়লাম বা এমনিই আজকে বেকার থাকতে মন চেয়েছে, এটাও দুনিয়া। কোনো খারাপ কাজে সময় দিচ্ছি সেটা তো স্পষ্ট। গল্প-গুজব ও অহেতুক সময় নষ্ট করছি সেটাও দুনিয়া। মানে, আমি যে আজকের নেক আমলটা ছেড়ে দিলাম, যে জন্যই ছেড়েছি, তা অবশ্যই দুনিয়া এবং مَا عِنْدَكُمْ 'তোমাদের কাছে যা আছে'-এর অংশ। কাজেই এটা يَنْفَدُ শেষ হয়ে যাবে। কারণ বাকি থাকার যেটা, সেটা কেবলই আমল। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমলের নাম দিয়েছেন– اَلْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ

পুরো আয়াত হল–

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

'ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।' –সূরা কাহ্‌ফ (১৮) : ৪৬

আরেক জায়গাতেও আছে– وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

'এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং তার (সামগ্রিক) পরিণামও শ্রেষ্ঠতর।' –সূরা মারইয়াম (১৯) : ৭৬

এখানে একথাও মনে রাখা দরকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে যদি শরীয়তের শিক্ষার প্রতি লক্ষ রাখা হয়, সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর বিধানের প্রতি লক্ষ রাখা হয়, সন্তানকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে তার দ্বীনী তরবিয়তের প্রতি খেয়াল রাখা হয় এবং তার হক আদায় করা হয়, তখন এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি শুধু দুনিয়ার যীনত ও সৌন্দর্য থাকবে না, বরং আখেরাতের যখীরা ও ভাণ্ডার হয়ে যাবে এবং عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ-এর মধ্যে শামিল হয়ে اَلْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

সুব্‌হানাল্লাহ! নেক আমলের নাম দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা 'আলবাকিয়াতুস সালিহাত'। بَاقِيَاتٌ এটা بَاقِيَةٌ শব্দের বহুবচন। ওই সমস্ত নেক আমল, যা সবসময় বাকি থাকবে। মানে সব নেক আমল, যা সবসময় বাকি থাকবে। এজন্য হাদীস শরীফে اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ-এর ব্যাখ্যার মধ্যে একেবারে সহজ আমল যেটা সেটা এসেছে। সুব্‌হানাল্লাহ, ওয়াল-হাম্‌দু লিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। একেবারে সবচেয়ে সহজ আমল যেটা, সেটা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে– আলবাকিয়াতুস সালিহাত-এর। তার মানে সব নেক আমল। সমস্ত নেক আমল এমন যে, আল্লাহ তাআলা তার উপাধিই দিয়ে দিয়েছেন 'আলবাকিয়াত'। কাজেই তুমি যদি দুনিয়ার জন্য নেক আমল ছেড়ে দাও তো আল্লাহর কাছে যা, তা হারাবে। আর যদি একটু কষ্ট ও সবর করে নেক আমল না ছেড়ে দুনিয়াটা ছেড়ে দিলে, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

'যারা ধৈর্যধারণ করে, নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

পুরস্কার দান করব।'

সবরের গুরুত্বপূর্ণ যে তিন প্রকার, তিন প্রকারের ক্ষেত্রেই এই কথা। বরং আরেকটা প্রকারও আছে সবরের। সেটা আরো সূক্ষ্ম এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ। নেক আমলের ক্ষেত্রে যে সবর তার দুটো দিক। এক হল, আমলটা যেন না ছোটে। আরেকটা হল, আমলটা যেন যথাযথ আদায় হয়। নামাযে দাঁড়ালাম, শুরু হয়ে গেল তাড়া, কখন শেষ হবে! একটা হল জরুরত বা ঠেকার কারণে নামায সংক্ষিপ্ত করা, এতে দোষ নেই। সে সংক্ষিপ্ত করার মধ্যেও আমি নিয়ত রাখব, এটা শরীয়তের হুকুম। আমার এখন যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে শরীয়তের হুকুম হল নামায সংক্ষিপ্ত করা। এজন্য আমি সংক্ষিপ্ত করছি। এটাও একটা নেক আমল। আসলে সংক্ষিপ্ত করা তো সমস্যা নয়, সমস্যা হল ত্রুটিযুক্ত করা। এটাই সমস্যা। সংক্ষিপ্ত হলেই ত্রুটিযুক্ত হয় না। সংক্ষিপ্ত হলেই যে ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, এমন কোনো কথা নেই। লম্বা নামায হয়েও ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। নামাযকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা, এর জন্য সবরের প্রয়োজন হয়। কেবল নামায কেন, যেকোনো নেক আমল, এটা যেন যথাযথ হয় এবং ত্রুটিমুক্ত হয় সে চেষ্টা করা। এই যথাযথ হওয়ার জন্য যে সবর, সেটাও সবরের একটা প্রকার। ওই সবরের মধ্যেও এই কথা–

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

আমরা যদি আগামী এক মাস এই সূত্রে মুরাকাবা ও মুহাসাবা করি–

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ.

যখনই আমার আমলের মধ্যে শৈথিল্য, অলসতা বা উদাসীনতা আসতে দেখব, তখনই বলব–

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ.

আর এ রকম ছোট্ট ছোট্ট বাক্যগুলো তো মুখস্থ হয়ে যাওয়া দরকার। মানে সূত্রটা যদি কুরআনের ভাষায় মুখস্থ হয়ে যায় এবং দিলে বসে যায় এটা অনেক ভালো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক নসীব করুন, আমীন।#

[মারকাযুদ দাওয়াহ মসজিদ, হযরতপুর প্রাঙ্গণ-এ প্রদত্ত বয়ান
০৩ সফর ১৪৪১ হি./০৩-১০-২০১৯ ঈ. বৃহস্পতিবার
[সেপ্টেম্বর ২০২০ ঈ.]

ওজর শেষ হয়ে যাওয়ার পর সাধারণ হুকুম অনুযায়ী আমল করা জরুরি মসজিদে জামাতের সঙ্গে ফরয নামায আদায় করার গুরুত্ব ও ফযীলত

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

'এর পর যখন তোমরা নিরাপত্তা বোধ করবে তখন সালাত যথারীতি আদায় করবে। নিশ্চয়ই সালাত নির্ধারিত সময়ে মুমিনদের এক অবশ্যপালনীয় কাজ।' –সূরা নিসা (৪) : ১০৩

এই ইরশাদে রব্বানী সূরা নিসার ১০৩ নম্বর আয়াতের শেষাংশ। আয়াতটি সালাতুল খাওফের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে আয়াতের এই অংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, যখন আপতিত পরিস্থিতি এবং ওজরের হালাত শেষ হয়ে যায় তখন নামায স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী যথাযথভাবে আদায় করা জরুরি। কেননা নামায হচ্ছে মুমিনের ওপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয বিধান। যার সময়ও নির্দিষ্ট এবং পদ্ধতিও নির্ধারিত।

ফরয নামাযের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য শরীয়তের বিধান হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করা। কোনো শরয়ী ওজর ছাড়া মসজিদের জামাত তরক করা জায়েয নেই। কাছাকাছি কোনো মসজিদ না থাকলে চেষ্টা করবে যেন একাকী নামায আদায় করতে না হয়, বরং দু-চারজন মিলে জামাত করে নেবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ.

'আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, নামায (-এর জামাত) থেকে পিছিয়ে থাকত

কেবল এমন মুনাফিক, যার নেফাক স্পষ্ট ছিল অথবা অসুস্থ ব্যক্তি। তবে আমরা অসুস্থদেরকেও দেখতাম, দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে তারা নামাযের জন্য চলে আসত।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৮৫

হযরত ইবনে মাসউদ রা. আরো বলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ.

'নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হেদায়েতের তরিকাগুলো শিখিয়েছেন। হেদায়েতের এই তরিকাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যেখানে আযান হয় সেখানে নামায আদায় করা।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৮৫

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এ-ও ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কাল (হাশরের ময়দানে) 'মুসলিম' অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে চায়, তার উচিত এই নামাযগুলো মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে আদায় করা–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ.

তারপর তিনি বলেন–

فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدٰى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ.

'কেননা আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের পথ সুনির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর এই নামাযগুলো মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করা এই হেদায়েতের পথসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা ঘরে নামায পড়তে থাক যেভাবে পিছিয়ে থাকা লোক (মুনাফিক) ঘরে নামায আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর পথ ছেড়ে দিলে। আর নবীর পথ ছেড়ে দিলে তো তোমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৮৬

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

অর্থাৎ একাকী নামায পড়া অপেক্ষা জামাতে নামায আদায় করা সাতাশ গুণ

বেশি ফযীলতপূর্ণ। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৭৫
হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বর্ণনা করেন-

صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ، فَقَالَ: أَ شَاهِدٌ فُلَانٌ، قَالُوْا: لَا، قَالَ: أَ شَاهِدٌ فُلَانٌ، قَالُوْا: لَا، قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَيْتُمُوْهُمَا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهٗ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ، وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهٖ وَحْدَهٗ، وَصَلَاتُهٗ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهٖ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالٰى.

'একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। এর পর বললেন, অমুক কি এসেছে? সাহাবীগণ বললেন, না। জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি এসেছে? সাহাবীগণ বললেন, না। নবীজী বললেন, নিঃসন্দেহে ফজর ও ইশা এই দুই নামায মুনাফিকদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। যদি তোমরা জানতে এতে কী (পুণ্য ও কল্যাণ) রয়েছে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এর জামাতে উপস্থিত হতে।

আর প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের মর্যাদাতুল্য। যদি এর ফযীলতের ব্যাপারে তোমরা জানতে তাহলে তাতে জায়গা গ্রহণের জন্য আগেভাগে চলে আসতে।

একাকী নামায পড়া অপেক্ষা দুই ব্যক্তির নামায অধিক উত্তম। দুই ব্যক্তি অপেক্ষা তিন ব্যক্তির নামায অধিক উত্তম। জামাতে উপস্থিতির সংখ্যা যত বাড়তে থাকে আল্লাহ তাআলার কাছে তা তত প্রিয়।' -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫৫৪, সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৮৪৩

অনেক সহীহ হাদীসে এই ফযীলতও এসেছে, 'কোনো ব্যক্তি যদি ঘর থেকে উত্তমরূপে ওযু করে মসজিদের উদ্দেশে রওনা হয়, তাহলে প্রত্যেক কদমে তার একটি মরতবা বুলন্দ হয় এবং একটি গোনাহ মাফ হয়। মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ তা নামাযে গণ্য হতে থাকে। আর নামায শেষ করার পর যতক্ষণ সে ওযু অবস্থায় ওই স্থানে বসে থাকে, ফেরেশতাগণ তার জন্য দুআ করতে থাকে- হে আল্লাহ, আপনি তাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ, আপনি তার ওপর রহম করুন। হে আল্লাহ, আপনি তার তওবা কবুল করুন।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭৭, সহীহ

মুসলিম, হাদীস ১৫০৪, ১৫১৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩৬২৩

কোনো ওজর ছাড়া জামাত তরক করা যে কত বড় অন্যায় শুধু এই হাদীস থেকেই তা অনুমিত হতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ-এ সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. উভয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে ইরশাদ করতে শুনেছেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

অর্থাৎ যারা জামাতে উপস্থিত হচ্ছে না তারা যেন এ কর্ম থেকে অবশ্যই নিবৃত্ত হয়। নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর সেঁটে দেবেন। এরপর তারা এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে, যারা (দ্বীন ঈমানের ব্যাপারে) উদাসীন। –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৭৯৪

মসজিদে জামাতে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ওজর হল শঙ্কা-ভীতি ও অসুস্থতা। এই দুই ওজরের বিবেচনায় বিগত দিনগুলোতে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এমন অনেকেই ঘরে নামায পড়তে শুরু করেছেন, যারা মাশা-আল্লাহ মসজিদে নিয়মিত নামায পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। যতদিন ওজর ছিল ততদিন এতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু যখন ভয়ের সেই পরিস্থিতি নেই এখন সুস্থ ব্যক্তি এবং বড় কোনো বিশেষ রোগে আক্রান্ত নন এমন ব্যক্তির জন্য মসজিদে জামাতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য মসজিদে উপস্থিতির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরও মসজিদে মুসল্লিগণের উপস্থিতি আগের অবস্থায় দেখা যাচ্ছে না। নিঃসন্দেহে এ অবস্থা সংশোধনযোগ্য।

বাস্তব কথা তো এই, মসজিদগুলোতে শুধু আগের চিত্র ফিরে আসাই যথেষ্ট নয়; বরং আগে যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সঙ্গে মসজিদে আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাদেরও এখন এর ইহতেমাম করা উচিত। কোনো যৌক্তিক ওজর ছাড়া মসজিদের জামাত থেকে পিছিয়ে থাকার অভ্যাস করে নেওয়া কবীরা গোনাহের শামিল। এজন্য আমাদের কর্তব্য হল, জামাতে নামায আদায় করার খুব বেশি ইহতেমাম করা এবং অন্যদেরকেও মসজিদে উপস্থিত হওয়ার দাওয়াত দেওয়া।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, মুআযযিন সাহেব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে

আহ্বানকারী। আর আযান হচ্ছে সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি মসজিদের জামাতে হাজির হওয়ার দাওয়াত। অতএব যিনি মসজিদে উপস্থিত হন তিনি আল্লাহ তাআলার এই দাওয়াতে লাব্বাইক বলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই সৌভাগ্য নসীব করুন, আমীন।

কাতারে কীভাবে দাঁড়াবেন?

জামাতের নামাযে কাতারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীয়তের সাধারণ বিধান হচ্ছে কাতার সম্পূর্ণ সোজা হবে। দুই কাতারের মাঝে এক কাতার ফাঁকা রাখা তো দূরের কথা, প্রতি কাতারে দুইজনের মাঝে ফাঁকা জায়গা রাখাও নিষেধ। এক মুসল্লি অপর মুসল্লির সঙ্গে মিলে মিলে দাঁড়ানো এবং মাঝে কোনো ফাঁকা না রাখাই হচ্ছে মূল বিধান। এটা সুন্নতে মুআক্কাদা।

কিন্তু আল্লাহ পাক রাহমানুর রাহীম এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন বানিয়ে। ওজরের বিবেচনায় বিভিন্ন বিধানে তারা রুখসত তথা ছাড় দিয়ে রেখেছেন। রুখসতের সেই মূলনীতির আলোকে উলামা-মাশায়েখ প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেননি, যা স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জারি করা হয়েছে।

কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ, অবস্থা যখন ভালো হতে থাকল, দেখা গেল, অনেক মসজিদে মুসল্লিগণ প্রায় আগের মতোই মিলে মিলে দাঁড়াচ্ছেন। পক্ষান্তরে কোনো কোনো মসজিদে এখন পর্যন্ত পরিস্থিতির ওই শুরুর দিককার মতো অবস্থা বহাল রাখা হয়েছে। অথচ অধিকাংশ মানুষই দেখা যাচ্ছে, জীবনের অন্যসব ক্ষেত্রে এখন আর শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার কোনো প্রয়োজন অনুভব করছে না।

সঠিকভাবে কাতারবদ্ধ হওয়া এবং কাতারের মাঝে কোনো ফাঁকা না রাখার ব্যাপারে খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস স্মরণ করিয়ে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে :

১. হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাশরীফ আনেন এবং বলেন–

أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ.

'তোমরা কি সেভাবে কাতারবদ্ধ হবে না, যেভাবে ফেরেশতাগণ তাদের রবের

সামনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ফেরেশতাগণ তাদের রবের সামনে কীভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? বললেন, তারা প্রথম কাতারগুলো পূর্ণ করে এবং কাতারে পরস্পর খুব মিলে মিলে দাঁড়ায়।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৬৭

২. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. وَفِيْ لَفْظٍ: مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

'তোমরা কাতার সোজা করে নাও। কেননা কাতার সোজা করা নামাযের অংশ।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৭২৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৭৪

৩. হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

رُصُّوا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.

'তোমরা কাতারে খুব মিলে মিলে দাঁড়াও। কাতারগুলোকে নিকবর্তী করে করে প্রস্তুত কর। (অর্থাৎ দুই কাতারের মাঝে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফাঁক রেখো না।) পরস্পরে ঘাড়ে ঘাড় মিলিয়ে দাঁড়াও। আল্লাহর কসম, আমি দেখি, কাতারের (ফাঁকা জায়গাগুলোর) মাঝে শয়তান ছোট বকরির মতো প্রবেশ করে।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৬৬৭, সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৮১৪

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوا بِأَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ.

'তোমরা কাতার সোজা করে নাও এবং নিজেদের কাঁধগুলো মিলিয়ে নাও। ফাঁকা স্থানগুলো পূর্ণ করে নাও। (কাতার পূর্ণ অথবা সোজা করার জন্য) নিজের ভাইয়ের হাতে নরম হয়ে যাও। শয়তানের জন্য মাঝে কোনো ফাঁকা রেখো না।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৬৬৬

'নিজের ভাইয়ের হাতে নরম হয়ে যাও'-এর অর্থ হল, কাতার সোজা করার জন্য বা পূর্ণ করার জন্য মুসল্লিদের পক্ষ থেকে বা ইমাম-মুআযযিনের পক্ষ

থেকে যে নির্দেশনা আসে তা সহজে গ্রহণ করে নেওয়া।

আশা করি, মাসআলার হাকীকত ও গুরুত্ব বোঝার জন্য এ কয়টি হাদীসই যথেষ্ট হবে ইনশা-আল্লাহ।

هٰذَا، وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْأَطْهَارِ، وَرَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْ صَحَابَتِهِ الْأَخْيَارِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

২৩ মুহাররম, ১৪৪২ হিজরী, শনিবার

[অক্টোবর ২০২০ ঈ.]

করোনা থেকে পরিত্রাণের প্রকৃত উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، أَمَّا بَعْدُ :

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দাদের ওপর যেসব আমল ফরয করেছেন, এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হল তওবা। তওবা অর্থ তাঁর দিকে ফিরে আসা। এটা আল্লাহর সকল বান্দার ওপর ফরয। মুসলিম-অমুসলিম সবার ওপরে ফরয। অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেনি, ঈমান আনেনি; তার ওপরও ফরয– কুফর থেকে, শির্ক থেকে তওবা করে মুসলিম হয়ে যাওয়া, ঈমান গ্রহণ করা। যে ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাআলা মুসলিম হওয়ার তাওফীক দান করেছেন, তার ওপর ফরয তাকওয়ার জিন্দেগি অবলম্বন করা। অর্থাৎ যতকিছু আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন, যত পাপ, যত গোনাহ সবকিছু থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহর ফরযগুলো আদায় করা, এটা হল তাকওয়া। সকল মুমিন-মুসলিমের ওপর তাকওয়ার জিন্দেগি অবলম্বন করা ফরয। ন্যূনতম তাকওয়ার স্তর হল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা আর আল্লাহর ফরয আদায় করা। আল্লাহর হক আদায় করা, বান্দার হক আদায় করা। এই ফরয অনেক সময় লঙ্ঘিত হয়ে যায়। আমরা খেয়াল করি না, ভুল হয়ে যায়, গোনাহ হয়ে যায় এবং ফরয-ওয়াজিব কোনো আমল ছুটে যায় এবং অজান্তে, অনিচ্ছায় বা সম্পূর্ণ বেখেয়ালিতেও অনেক সময় জরুরি আমল ছুটে যায় এবং কোনো গোনাহ হয়ে যায়। এজন্য সর্বাবস্থায় তওবা করা উচিত। গোনাহ হয়ে গেলে তো বটেই। আমার খবর নেই, আমার ধারণা যে, কোনো গোনাহ হয়নি তবুও তওবা করা। কেন? কারণ আমি তো মানুষ! শুধু মানুষ না, আমি একজন সাধারণ মুমিন। রাসূলুল্লাহ্র উম্মত।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তো মানুষ। কিন্তু তিনি রাসূল, নবী, মাসুম, নিষ্পাপ। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যীন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী আসবে না। নতুন করে কোনো নবী হতে পারে না, আসতে পারে না।

কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ মুসলিম হবে, মুমিন হবে সবাই কার উম্মত? হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। উম্মত তো আর মাসুম না। ভুলের ঊর্ধ্বে না। তার ভুল হয়ে যায়, গোনাহ হয়ে যায়। খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আগের নবীগণ মাসুম। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁরাও তওবা করতেন। ইস্তেগফার করতেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন এবং তওবা করতেন। তাহলে উম্মতের আরো বেশি করে তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। এটা হল সাধারণ কথা। যে কোনো সময়, সুখ-শান্তিতে আছি, কোনো অশান্তি নেই, কোনো মহামারি নেই, বিপদ নেই, মসিবত নেই, নিরাপদে আছি, শান্তিতে আছি তখনো বিধান হল তওবা-ইস্তেগফার করা।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত ইস্তেগফার করতেন, তওবা করতেন। কোনো মজলিসে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে বসে আছেন, দেখা যায়, মজলিসের মধ্যে ৭০ বার বা ১০০ বারের মতো ইস্তেগফার পড়া হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর নিম্নোক্ত হাদীসে এই কথাটিই বলা হয়েছে–

إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩৪

প্রত্যেক ইস্তেগফারের সঙ্গেই তওবা আছে। তওবাবিহীন ইস্তেগফারের মূল্য নেই। আর ইস্তেগফারবিহীন তওবা সম্ভবই না। ইস্তেগফার এবং তওবা।

ইস্তেগফার মানে কী? আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। আয় আল্লাহ! আমার ভুল হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ আমি গোনাহ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আমার ওপর অনেক জুলুম করেছি। গোনাহের কারণে, গোনাহের মাধ্যমে মানুষ শুধু নিজের ওপরই জুলুম করে না–

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد

বেয়াদব শুধু নিজেকেই বরবাদ করছে– তা না।

بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

বরং পুরো পৃথিবীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

কে বেয়াদব? বেয়াদবি কী জানেন? সবচেয়ে বড় বেয়াদব হল গোনাহগার। আর যেটাকে আমরা বেয়াদবি মনে করি, যেমন বলি যে, ছেলেটা বেয়াদব; কেমন বেয়াদবি করছে– সেটাও গোনাহ। সে বেয়াদবিও গোনাহ।

যে গোনাহের কাজ করে সে শুধু নিজের ওপর জুলুম করে তা না। আমরা বলি–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

আমি আমার ওপর অনেক অত্যাচার করেছি, গোনাহ করে নিজের ওপর অনেক অত্যাচার করেছি।

নিজের ওপর অত্যাচার মানে কী? সাহাবায়ে কেরাম বুঝতেন বিষয়টা। 'হালাকতু ওয়া আহলাকতু'– আমি নিজেও বরবাদ হয়েছি, অন্যকেও বরবাদ করেছি। অন্যকে বরবাদ করার অর্থ কী? আমার গোনাহের কারণে মসিবত নাযিল হয়। আসমান থেকে বালা নামতে থাকে। জমিন থেকে বালা ওঠে। আমার গোনাহের কারণে। বালা যে আসে সেটার কষ্ট কি শুধু আমার একার, না সবার কষ্ট? সবার কষ্ট।

গোনাহ করার কারণে শুধু নিজের ওপর বালা আসে তা না। গোনাহ করে একে তো নিজেকে বরবাদ করেছি। আবার আরো দশজনকে বরবাদ করেছি। সকলের ক্ষতির কারণ হয়েছি আমি। এজন্য তওবা করা সব সময় জরুরি কাজ।

এখন যে মহামারি, যে বালা-মসিবতে আমরা আছি, শুধু এ দেশ নয়, পুরো মুসলিম বিশ্ব, পুরো পৃথিবী যে মসিবতে আক্রান্ত। এ সময় কাজ কী? একা একা তো সবাই তওবা করবেই। সবসময় করবে; কিন্তু এ ধরনের বালা-মসিবত দূর হওয়ার জন্য সকলকে তওবা করতে হবে–

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা সবাই তওবা কর। তবে সবাইকে একসঙ্গে, এক ময়দানে এসে তওবা করতে হবে, এটা বলা হয়নি। এটাও হতে পারে, নিষেধ নেই। কিন্তু 'جَمِيْعًا জামিয়ান' মানে সবাই। সকলকে তওবা করতে হবে। সবাই তওবা কর। কারণ সমস্যা তো সবার।

কতজনের পাপের বা গোনাহের কারণে এই সমস্যা এসেছে সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। কার কার পাপের কারণে এসেছে সেটা আল্লাহই জানেন।

কিন্তু করতে হবে তওবা সবাইকে। কারণ, যে ধারণা করবে যে এটা আমার পাপের কারণে আসেনি, তার এ ধারণাটাই পাপ। তার এই ধারণাটাই অন্যায় যে, অন্যদের পাপের কারণে এসেছে। কারো যদি এমন ধারণা মাথায় আসে, তাহলে তার এই ধারণা কঠিন অহংকার এবং মহা পাপ। সুতরাং সকলকেই তওবা করতে হবে।

তো অমুসলিম যারা, তারা তো আল্লাহকে চেনে না। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার তাওফীক হয়নি। তো সকল মুমিন যদি তওবা করে, আল্লাহ মসিবত উঠিয়ে নেবেন ইনশা-আল্লাহ। কিন্তু সবাইকে তওবা করতে হবে। সকল শ্রেণির মানুষকে তওবা করতে হবে। সকল সদস্যকে তওবা করতে হবে।

সকল বাবা তওবা করবে যে, আমরা সন্তানদের হক নষ্ট করেছি। সকল সন্তান তওবা করবে যে, আমরা মা-বাবার হক নষ্ট করেছি। সকল যুবক তওবা করবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে যৌবন দান করেছেন, এই যৌবন কোন পথে ব্যয় করেছি। এটা কি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিতে ব্যয় করেছি, নাকি নাফরমানি করেছি? বৃদ্ধ তওবা করবে যে, আল্লাহ আমাকে এত দীর্ঘ হায়াত দান করেছেন, কিন্তু আমি আল্লাহর কী এমন ইবাদত-বন্দেগি করেছি, কী হক আদায় করেছি! পুরুষরা তওবা করবে। নারীরা তওবা করবে; কে আল্লাহর কী হক নষ্ট করেছে এবং কে আল্লাহর বান্দাদের ও মাখলুকের কী হক নষ্ট করেছে? শাসক শ্রেণি তওবা করবে যে, আল্লাহ আমাকে শাসক বানিয়েছেন, আমার অধীনদের হক আদায় করেছি কি না। তাদের ওপর কত জুলুম করেছি, আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে সেইসব জুলুমের কাফফারা করতে হবে। শাসক বানিয়েছেন আল্লাহ তাআলা, কিন্তু শাসন করছ নিজের ইচ্ছামতো, আল্লাহর বিধানমতো করছ না। হারাম! এটা থেকে তওবা করতে হবে আর আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতে হবে।

এই যে পুরো বিশ্বে যত বুদ্ধিজীবী সমাজ আছে, যত শাসক আছে, দেশের কথা বলছি না শুধু, পুরো পৃথিবীর কথা বলছি, সবার কথা বলছি, মুসলিম-অমুসলিম সবাই, যত লিডার আছে, যত শাসক আছে সবাই সমাধান খুঁজছে এই মসিবতের! কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করছে না। সমাধান খুঁজছে লকডাউন দিয়ে। সমাধান খুঁজছে মাদরাসা-মকতব বন্ধ দিয়ে। সমাধান খুঁজছে জাগতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে। লকডাউন দিয়ে কি আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচতে পারবে! লকডাউন দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচা যাবে! স্বচক্ষে দেখছ, বাঁচতে পারছ না। সবাই বোঝে এটা তামাশা। তারপরও তামাশা

করে।

এটা শুধু এই সরকারই করছে না। পুরো দুনিয়ার সবাই করছে। সবাই তামাশা করছে। শুধু লকডাউন দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচতে হলে তওবা করতে হবে। আল্লাহর দিকে ফিরে এস। নিজের ওপর কী জুলুম করেছ, নিজের অধীনদের ওপর কী জুলুম করেছ। সে জুলুমের কাফফারা কর। আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহর দিকে ফিরে এস।

ইটালিতে কী করেছে জানেন না! ওরা আল্লাহকে চেনার মতো চেনে না। কুরআন যেভাবে বলেছে, ওভাবে চেনে না আল্লাহকে। কিন্তু যেহেতু খ্রিষ্টান, বিকৃত ধর্মের অনুসারী, তো এতটুকু জানে যে, মাবুদ আছেন, আল্লাহ আছেন। এ কথা বোঝে না যে, আমাকে ঈমান এনে তওবা করতে হবে। আল্লাহর কাছে ঈমান ছাড়া তওবা কবুল হবে না। এতটুকু জ্ঞান নেই। কিন্তু একেবারে মাঠে নেমে গেছে সবাই। একসঙ্গে কান্নাকাটি শুরু করেছে।

এটা করোনার প্রথম ধাপে ঘটেছে। তো এই যে হাত উঠিয়ে দুআ করা, কান্নাকাটি করা, এটা হল আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ছোট স্তর। এটা হল তওবার ছোট স্তর। আসল তওবা হল, যে কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আল্লাহর নাফরমানি করে আমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছি, ওটা থেকে তওবা করতে হবে। সকল গোনাহ থেকে তওবা করতে হবে। আল্লাহর বান্দাদের যে হক নষ্ট করেছি, ওটার জন্য তওবা করতে হবে এবং সে হক আদায় করতে হবে। আল্লাহর হক নষ্ট করেছি, সেটার জন্য তওবা করতে হবে এবং হক আদায় করতে হবে। এটাকেই বলে তওবা।

আল্লাহ আমি ক্ষমা চাই, আপনি ক্ষমা করুন, আপনি মাফ করুন, কান্নাকাটি করা। এটা হল তওবার দ্বিতীয় রুকন। তওবার দ্বিতীয় স্তম্ভ হল ইস্তেগফার এবং কান্নাকাটি করা। প্রথম স্তম্ভ, যা ছাড়া তওবা হবেই না, সেটা হল ফিরে আসা। তুমি ফিরে আস। অন্যায় থেকে ফিরে আস। সঠিক রাস্তা অবলম্বন কর। আল্লাহকে বল, আল্লাহ আমি ফিরে এসেছি। পেছনের জন্য আমি লজ্জিত। এটার নাম তওবা।

وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٣١

'হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।' –সূরা নূর (২৪) : ৩১

তো মুমিনরা যদি সবাই তওবা করে, আল্লাহ মুমিনদের তওবার মাধ্যমে

কাফের-মুশরিকদেরও বালা-মসিবত থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তাদেরও এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। উপদেশ গ্রহণ করা দরকার। সেই উপদেশ গ্রহণ করা তখনই সাব্যস্ত হবে, যদি ঈমানের তাওফীক হয়ে যায় এবং ঈমান এনে মুসলিম হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে খালেস অন্তরে 'তাওবাতান নাসূহা' করার তাওফীক দান করেন। ইনশা-আল্লাহ যদি আমরা তওবা ও ইস্তেগফারের প্রতি যত্নবান হই এবং দুআ, যিকির-আযকারের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণভাবে রুজু করি, ইনশা-আল্লাহ এই মসিবত উঠে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[জুমাপূর্ব বয়ান
মারকাযদু দাওয়াহ, হযরতপুর প্রাঙ্গণ
১৯-১২-১৪৪২ হি./৩০-০৭-২০২১ ঈ.
[সেপ্টেম্বর ২০২১ ঈ.]

মিরাস বণ্টন
এক আরবের ঘটনা এবং শিক্ষণীয় কিছু বিষয়

মাকতাবাতুল ইমাম শাফেঈ রিয়াদ-এর স্বত্বাধিকারী শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আ-লুর রশীদ আমার মুহসিন দোস্ত। হযরত শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর খেদমতে যাওয়ার তাওফীক হলে কিছু দিন তার ঘরে থাকা হয়েছিল। তার পিতার সঙ্গেও এক ধরনের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মাস পরেই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আবদুল্লাহ আ-লুর রশীদের ইন্তেকাল হয়ে যায়। গোসল, কাফন-দাফনে অধমও শরিক ছিলাম। তার বাড়ি মাশা-আল্লাহ বেশ বড় ছিল। পাশেই ছিল তার বড় ছেলে মুহাম্মাদ আররশীদের বাড়ি। সেই বাড়িরই কিতাবঘরে অধম কিছু দিন অবস্থান করেছিলাম।

তার পিতা ইন্তেকালের সম্ভবত সাড়ে চার মাস পর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, আমার আম্মাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব।

আমি বললাম, তার ঘর তো পাশেই!

বললেন, এখন তিনি এখানে থাকেন না। ইদ্দত পূর্ণ হতেই নিজের জায়গায় চলে গেছেন।

বললাম, কেন?

উত্তরে বললেন, এটা আব্বাজানের বাড়ি ছিল। তার ইন্তেকালের পর এখন এটা ওয়ারিসদের হয়ে গেছে। তাই মিরাস বণ্টনের আগে তিনি এখানে কীভাবে থাকবেন? গোনাহ হবে না![১]

এই ঘটনা দ্বারা আমার বলা উদ্দেশ্য হল, তাদের অনুভূতি কত সজীব এবং হক ও লেনদেনের বিষয়ে তারা কত সজাগ ও সচেতন। অথচ আমাদের উপমহাদেশে মিরাস বণ্টনের বিষয়ে উদাসীনতা ব্যাপক। মিরাস বণ্টন শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান; এতে বিলম্ব করা যে গোনাহ– হয়ত এ ব্যাপারে আমাদের কোনো ধারণাই নেই!!

---

১. সম্ভবত এই বাড়ি ছাড়া মিরাসের অন্যান্য সম্পত্তি বণ্টন হয়ে গিয়েছিল, এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য তখন বিষয়টি জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি।

কেউ চাইলে শুধু এই ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। আসলে আমাদের মধ্যে কম মানুষই এমন আছেন, যারা এ বিষয়ে যথাযথ চিন্তা-ভাবনা করেন। আমরা এটা ভাবিই না যে, মিরাস বন্টনে বিলম্ব করা কত বড় গোনাহ এবং কত গোনাহের জন্ম দেয়।

শরীয়তের বিধান হল, কারো ওফাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মিরাস তথা রেখে যাওয়া সম্পত্তির সবকিছুর সঙ্গে সকল ওয়ারিসের হক যুক্ত হয়ে যায়। সেজন্য জরুরি হল, মৃতব্যক্তির দাফনকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর খুব দ্রুত সময়-সুযোগ বের করে শরীয়ত-নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী ওয়ারিসদের মাঝে মিরাস বন্টন করে দেওয়া। অবশ্য মিরাস-বন্টনের আগে তিনটি বিষয় লক্ষ রাখা জরুরি–

এক. মৃতব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী– তার কাফন-দাফনের খরচ কেউ খুশি মনে বহন করলে ভালো কথা নতুবা কাফন-দাফনের জন্য তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে মধ্যম পর্যায়ের খরচ করা হবে।

দুই. মৃতব্যক্তির জিম্মায় ঋণ থাকলে বন্টনের আগে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে। ঋণের মধ্যে স্ত্রীর মোহরও অন্তর্ভুক্ত। যদি মোহর বা মোহরের কিছু অংশ বাকি রয়ে যায়, সেটাও রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আদায় করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, স্বামী যদি স্ত্রী থেকে জোরপূর্বক বা সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মোহর মাফ করিয়ে নেয়, সেটা ধর্তব্য হবে না। এক্ষেত্রে মোহর অনাদায়ি রয়ে গেছে বলে গণ্য হবে এবং তা ঋণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনিভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য ওয়ারিসরা যদি তার থেকে জোরপূর্বক বা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মোহর মাফ করিয়ে নেয়, সেটাও ধর্তব্য নয়।

স্ত্রী যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো ধরনের চাপের সম্মুখীন না হয়ে খুশি মনে পুরো মোহর বা তার অংশবিশেষ ছেড়ে দেয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে মনে রাখতে হবে, কোনো চাপের সম্মুখীন হয়ে মোহরের হক ছেড়ে দিলে তা ধর্তব্য হবে না।

চাপ বহু ধরনের হতে পারে। যেমন, ভয় দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করা; লজ্জায় ফেলে চাপ সৃষ্টি করা বা তার কোনো হক আটকে রেখে চাপ সৃষ্টি করা কিংবা সামাজিক প্রচলনের ভয়ে মনে না চাওয়া সত্ত্বেও মাফ করে দেওয়া। এসবকিছুই চাপের মুখে মাফ করা। এগুলো স্বতঃস্ফূর্ত মাফের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মৃতব্যক্তির ঋণসমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঋণ এটাও যে, তার পিতার

মিরাস বণ্টনের সময় যদি তার বোনদেরকে প্রাপ্য অংশ না দেওয়া হয় কিংবা তার দাদার মিরাস বণ্টনের সময় যদি ফুফুদের অংশ না দেওয়া হয়, তাহলে মৃতব্যক্তির ভাগে তার ফুফু ও বোনদের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ থেকে যতটুকু অংশ দাখিল হয়েছে সেটা মৃতব্যক্তির জিম্মায় ঋণ হয়ে আছে। অতএব মিরাসের সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টনের আগে এই ঋণও আদায় করা ফরয।

সারকথা হল মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ অবশিষ্ট থাকাবস্থায় তার কোনো ঋণ যেন অনাদায়ি না থাকে। মিরাস ওয়ারিসদের মাঝে তখনই বণ্টন হবে যখন তার সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে এবং সামনে উল্লেখ্য তিন নম্বরের বিষয়টিও সমাধা হয়ে যাবে।

তিন. মাইয়েত (মরহুম/মরহুমা) কোনো জায়েয ওসিয়ত করে গেলে সেটা তার মিরাসের এক-তৃতীয়াংশ থেকে পূরণ করা হবে। এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করলে সেটা ধর্তব্য হবে না।

মিরাসের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এক ও দুই নম্বরে উল্লিখিত হক (যদি থাকে) আদায় করার পর যে সম্পদ বাকি থাকবে সেটার এক-তৃতীয়াংশ।

কোন ওসিয়ত জায়েয আর কোন ওসিয়ত না-জায়েয সেটা ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবে আছে। কারো প্রয়োজন হলে আলেমদের থেকে জেনে নেবেন।

এই তিনটি হক আদায়ের পর মিরাসের যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, কম হোক বা বেশি, সেটা ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা ফরয।

মৃতব্যক্তি যা কিছু রেখে গেছে সবই মিরাসের অন্তর্ভুক্ত

মিরাসের মধ্যে শুধু টাকা-পয়সা ও জমি-জমাই অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং যা কিছু মৃতব্যক্তি রেখে গেছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। সেগুলোর সাধারণ কোনো জিনিসও মিরাসসংশ্লিষ্ট হক ও বণ্টন থেকে পৃথক রাখা জায়েয নয়। যেমন–

১. ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র

কাপড়, জুতা, বাসন, ঘড়ি, সাইকেল, মোটর সাইকেল, গাড়ি (যেমন গাড়িই হোক) ফার্নিচার, কিতাবাদিসহ ব্যবহার্য অন্য সব জিনিসপত্র।

আশ্চর্যের বিষয় হল, মানুষ মৃতব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্রকে মিরাসের অংশই মনে করে না। যার যেটা পছন্দ, অন্য শরিকদের সন্তুষ্টি ছাড়াই দখল করে নেয়। মনে রাখবেন, এ ধরনের কাজ একদম নাজায়েয। আমাদের উস্তাযে

মুহতারাম হযরত শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর এক বয়ানে বলেন, 'আমার আব্বাজান রহ.-এর ইন্তেকাল হয়ে গেলে আমার শায়েখ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী সাহেব রহ. সমবেদনা জানাতে এলেন। তখনো দাফনের কাজ শেষ হয়নি। হযরত রহ.-এর স্বাস্থ্য তখন তেমন ভালো ছিল না। আব্বাজানের ইন্তেকালও তাঁর জন্য অনেক বড় আঘাত ছিল। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। আব্বাজান যে শক্তিবর্ধক হালুয়া খেতেন তার খানিকটা ঘরে ছিল। আমরা সেটা তাঁর সামনে পেশ করে বললাম, হযরত খেয়ে নিন, দুর্বলতা কাটবে। হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী সাহেব রহ. বললেন, ভাই এই হালুয়া খাওয়া এখন আমার জন্য জায়েয নয়। এখন ওয়ারিসগণ এর মালিক। সমস্ত ওয়ারিসের অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত এটা খাওয়া আমার জন্য হালাল নয়। আমরা বললাম, ওয়ারিসদের প্রত্যেকেই বালেগ এবং সকলেই এখানে উপস্থিত। সবাই খুশিমনে অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং আপনি খেতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। অবশেষে তিনি খেলেন।' –ইসলাহী খুতুবাত ১১/২৭১-২৭২

২. ঘরের আসবাবপত্র

ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে যেসব জিনিস মাইয়েতের মালিকানাধীন ছিল সব মিরাসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. হেবা বা দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত যেসব জিনিস ইন্তেকালের আগে মাইয়েতের কব্জায় এসেছে।

৪. উপার্জনের সরঞ্জাম

মাইয়েতের উপার্জনের সকল সরঞ্জাম, যেগুলো তার মালিকানাধীন ছিল।

৫. স্ত্রীর মোহর

মাইয়েত মহিলা হলে তার প্রাপ্য মোহর তার মিরাসের অংশ হবে। চাই সেটা অনাদায়ি হোক কিংবা এমন আদায়কৃত, যেটা আরেকজনের কব্জায় রয়েছে।

৬. জমি-জমা ও ঘর-বাড়ি

এটা তো সবারই জানা যে, মৃতব্যক্তির সমস্ত জমি-জমা (চাষের জমি হোক বা ভিটেমাটি, আবাদি হোক বা অনাবাদি) এবং সমস্ত ঘর-বাড়ি, প্লট-ফ্ল্যাট সবকিছু মিরাসের অন্তর্ভুক্ত। যেটা নিজের নামে ক্রয় করেছে আর যেটা কোনো কারণবশত অন্যের নামে ক্রয় করেছে সব এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো কারণবশত কাগজে অন্য কারো নাম লেখার দ্বারা সেই জিনিস তার হয়ে যায় না।

মৃতব্যক্তি জীবদ্দশায় কোনো জমি বা বাড়ি কাউকে হেবা বা দান করেছিল; তবে ওফাতের আগে দখল বুঝিয়ে দিয়ে যায়নি এবং সেও বুঝে নেয়নি; তাহলে এটাও মিরাসের অন্তর্ভুক্ত হবে। কব্জা বা দখল হস্তান্তর করা ছাড়া শুধু হেবা দ্বারা ওই জিনিসের মালিক হয়ে যায় না।

৭. জমানো অর্থ-কড়ি

ব্যাংকে জমানো টাকা-পয়সা এবং কোম্পানি বা ব্যবসায় লাগানো পুঁজি সবকিছু মিরাসের অংশ।

৮. মাইয়েতের পাওনাসমূহ

মানুষের কাছে মৃতব্যক্তির যত পাওনা আছে সব মিরাসের অংশ। যখন যেটুকু উসূল হবে সেটা ওয়ারিসদের মধ্যে হিস্যা অনুযায়ী বণ্টন হতে থাকবে।

৯. ধার বা ভাড়া দেওয়া জিনিসপত্র

মাইয়েত নিজের কোনো জিনিস কাউকে ভাড়া বা ধার দিয়ে থাকলে সেটাও মিরাসের মধ্যে গণ্য হবে।

১০. কপিরাইট

কোনো বইয়ের রচনা ও প্রকাশনা স্বত্ব, তেমনিভাবে কোনো কিছুর উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের স্বত্ব এবং এ ধরনের আরো যেসব অধিকার শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পদ হিসেবে বিবেচিত সেগুলোর সবই মিরাসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১১. মৃত আত্মীয়দের থেকে পাওয়া মিরাসের অংশ

মাইয়েত তার জীবদ্দশায় যেসব আত্মীয়ের ওয়ারিস হয়েছিল, যদি তার জীবদ্দশায় তাদের মিরাস থেকে আপন হিস্যা নাও পায় তবু সেটা তার হক। যখনই উসূল হবে, সেটা মাইয়েতের মিরাসের অংশ হয়ে যাবে এবং তাতে ওয়ারিসদের হক সাব্যস্ত হবে।

১২. সরকার বা কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত ফান্ড

চাকরিজীবীদেরকে রিটায়ারমেন্ট বা ওফাতের পর যে অর্থ প্রদান করা হয়, প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসেবে কিংবা অন্য কোনো ফান্ড হিসেবে, সেটাও মিরাসের অংশ। অবশ্য যে অর্থ নিয়ম অনুযায়ী চাকরিজীবীর কোনো আত্মীয়কে নির্দিষ্ট করে প্রদান করা হয় সেটা ওই আত্মীয়ের ব্যক্তিগত মালিকানা; সেটা মিরাসের অংশ হবে না। উদাহরণস্বরূপ মরহুমের স্ত্রীর জন্য জারিকৃত পেনশন, সন্তানদের শিক্ষাভাতা, ঘর বা চিকিৎসা-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি।

মোটকথা, মাইয়েত যা কিছু রেখে গেছে তার সবই মিরাসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নোট : অবশ্য লক্ষ রাখা জরুরি, মৃতব্যক্তির কাছে কারো আমানত রাখা আছে কি না কিংবা মৃতব্যক্তি কারো কোনো জিনিস ধার এনেছিল কি না অথবা কারো কোনো জিনিস অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছিল কি না, তা খেয়াল রাখতে হবে। এগুলো কোনোভাবেই মিরাসের অংশ নয়। এগুলোকে মিরাস ভেবে বণ্টন করা হারাম। বণ্টন করে দিলেও ওয়ারিসরা এসবের মালিক হবে না।

ইসলামী শরীয়তের অকাট্য বিধান হল– অবৈধভাবে দখলকৃত জিনিস হাত বদলের কারণে পরবর্তী ব্যক্তি তার মালিক হয়ে যায় না।

এমনিভাবে মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি ও ঘর-বাড়ির মধ্যে কোনো জিনিস যদি এমন হয়, যার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, এটা হারামভাবে উপার্জন করা হয়েছে, তাহলে সেটাও মিরাসের অংশ হবে না। সেটার মালিকের পরিচয় জানা গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে। মালিকের পরিচয় না-জানা গেলে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সদকা করে দিতে হবে। এমন হারাম জিনিস বণ্টন হয়ে গেলে যার ভাগে যেটুকু পড়েছে (মালিক জানা থাকলে) সেটা মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবে নতুবা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দেবে।

ইসলামী শরীয়তের অকাট্য বিধান হল– শুধু হাত বদলের দ্বারা হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায় না।

মিরাস বণ্টন না করার ক্ষতিসমূহ

মিরাস বণ্টন না করা বা বণ্টনে বিলম্ব করার মাঝে অনেক ক্ষতি। এই এক গোনাহ অনেক গোনাহের জন্ম দেয়। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করুন–

এক. বণ্টনের আগে মিরাসের সম্পদ মুশা' (مُشَاع)-এর অন্তর্ভুক্ত

মুশা' শরীকী সম্পত্তির একটি প্রকার। যে সম্পদে একাধিক ব্যক্তি শরিক, তবে প্রত্যেকের অংশ আলাদাভাবে চিহ্নিত নয়, এরূপ সম্পদকে মুশা' (مُشَاع) বলে।

ব্যক্তির ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে তার সকল সহায়-সম্পত্তি, আসবাবপত্র ও জমিজমা সবকিছু থেকে তার মালিকানা শেষ হয়ে যায়। এখন এর সঙ্গে তার সমস্ত ওয়ারিসের হক যুক্ত হয়ে গেছে। সেজন্য যতক্ষণ শরীয়তের বিধানমতো

এর বণ্টন না হবে, সেটা মুশা'-এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর মুশা'-এর বৈশিষ্ট্য হল, এর প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক মালিকের হিস্যা রয়েছে। সেজন্য মুশা' সম্পত্তি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য শর্ত হল, সেটা বণ্টন করে প্রত্যেকের হক ও হিস্যা নির্ধারিত হয়ে যাওয়া বা সব শরিকের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি লাভ করা। অন্যথায় যদি কেউ তা থেকে নিজের অংশ অনুপাতেও ফায়েদা গ্রহণ করে, তবু সেটা নাজায়েয হবে। কারণ প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এই সম্পদ বা জায়গার প্রত্যেক অংশে প্রত্যেকের হিস্যা রয়েছে।

শরীয়তের এই বিধান জেনে গেলে ওই অজ্ঞতাও ইনশা-আল্লাহ দূর হয়ে যাবে, যেটা মানুষের মধ্যে ব্যাপক হয়ে আছে। ওয়ারিসদের মধ্যে যার দখলে মাইয়েতের যে জিনিস থাকে সে সেটাকে এই বাহানায় ব্যবহার করতে থাকে যে, মিরাসে তার অংশ রয়েছে।

মনে রাখবেন, এই অজুহাতে মিরাসের কোনো অংশ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত হয়ে যায় না। সেজন্য সবার অংশ ঠিক না করে শুধু ছুতো বের করে এক-দুই ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ মিরাস বা তার কোনো অংশ ব্যবহার করা বা দখলে রাখা জায়েয নয়। এই গোনাহ থেকে বাঁচার আসল পন্থা হল, অনতিবিলম্বে মিরাস বণ্টন করে ফেলবে। মিরাস বণ্টনে বিলম্ব করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।[১]

---

১. অবশ্য কখনো এমন হয়, সকল ওয়ারিস বালেগ। তারা সকলে খুশিমনে এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, বণ্টনের আগ পর্যন্ত মিরাসের জিম্মাদার হবেন অমুক। তিনি এই দায়িত্ব নির্ধারিত জায়েয নিয়ম অনুযায়ী পালন করবেন। তিনি তার দেখভাল করবেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত সমস্ত আয় শরীয়তের বিধান মোতাবেক বণ্টন করবেন। এক্ষেত্রে যদি সকল ওয়ারিসের হকের প্রতি যথাযথ লক্ষ রাখা হয় তাহলে ইনশা-আল্লাহ মিরাস বণ্টনে বিলম্ব করার গোনাহ হবে না। তবে শর্ত হল, এই পন্থা সকল ওয়ারিসের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনো ধরনের চাপ ছাড়া খুশিমনে নির্ধারিত হতে হবে।

ওয়ারিসদের কেউ নাবালেগ হলে এই পন্থা তো শুরুতেই অকার্যকর। নাবালেগ অনুমতি দিলেও ওই পন্থা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তৎক্ষণাৎ বণ্টন করে তার হিস্যা আলাদা করতে হবে।

এমনিভাবে সকল ওয়ারিসের সন্তুষ্টি ও ঐকমত্য ছাড়া কোনো ওয়ারিস যদি এই পন্থা গ্রহণ করে, সেটা একদম নাজায়েয হবে। এর দ্বারা মিরাস বণ্টনে বিলম্ব করার গোনাহ থেকে বাঁচা যাবে না। সঙ্গে খেয়ানত, আত্মসাৎ ও জুলুমের গোনাহ তো আছেই।

তেমনিভাবে এ ধরনের পন্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য যদি হয় বণ্টন না করে কাউকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা বা কাউকে তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে কম দেওয়া তাহলে এটাও হারাম।

দুই. এই সম্পদ যাকাত থেকে দূরে রাখা হচ্ছে কেন?

অনেক সময় ওয়ারিসদের সবাই বা তাদের কেউ কেউ নেসাবের মালিক হয়ে থাকে। মিরাস ভাগ হবার পর তার হিস্যায় যা কিছু আসবে সে সেটারও যাকাত আদায় করবে। কখনো এমন হয় যে, মিরাসের অংশই এত অধিক হয় যে, শুধু সেটাই নেসাব পরিমাণ হয়ে যায়। মিরাস বণ্টন হয়ে হিস্যা হকদারের কাছে পৌঁছালেই তো সে তার যাকাত আদায় করবে; কিন্তু বণ্টনের বিলম্বের কারণে এ ধরনের শরীকী সম্পদের যাকাতের ব্যাপারে কম মানুষই ভাবেন।

তিন. মিরাস সম্পর্কিত বিষয়গুলো কে সামলাবে?

যতদিন মরহুম/মরহুমা জীবিত ছিলেন ততদিন তো তিনি নিজেই নিজের বিষয়গুলো দেখাশোনা করতেন। তার ইন্তেকালে এখন এগুলো কে দেখাশোনা করবে? শুধু একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই ইনশা-আল্লাহ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। মনে করুন, মরহুমের এক বা একাধিক বাড়ি ভাড়া দেওয়া আছে। তার ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাড়া-চুক্তি শেষ হয়ে গেছে। এখন ওয়ারিসরা এই বিষয়টি দেখাশোনা করবে। বণ্টন হয়ে গেলে প্রত্যেকে নিজের অংশ ভাড়া দেবে; আগের ব্যক্তির কাছেও দিতে পারে কিংবা অন্য কারো কাছে। আবার চাইলে অন্য কোনোভাবেও সেটা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু বণ্টন না হওয়া অবস্থায় ওয়ারিসদের কোনো একজন যদি নিজের পক্ষ থেকে আগের ভাড়া চুক্তি বহাল রাখে কিংবা নতুন কারো কাছে ভাড়া দেয়, তাহলে এটা কীসের ভিত্তিতে করা হল? এই ঘর/ঘরগুলোর মধ্যে তো অনেক মানুষের হক রয়েছে। সে একা কীভাবে এটাকে ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে এবং ভাড়া উসূল করছে? এখন যদি সে ভাড়ার অর্থ খরচ না করে সংরক্ষণই করে রাখে তবু শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা 'ফুযূলীর কাজ'।[১] আর ফুযূলীর কাজটা মৌলিকভাবে আপত্তিকর। তা যথা নিয়মে অনুমোদন না পেলে মওকুফ হিসেবে গণ্য হবে। যদি সে ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং ভাড়ার অর্থের মাঝে কোনো খেয়ানত করে তাহলে তো সেটা স্পষ্ট খেয়ানত, আত্মসাৎ ও জুলুম।

একইভাবে যদি এই পন্থা এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় যে, এর দ্বারা মিরাস-সংশ্লিষ্ট আরো যেসব হক রয়েছে (যেমন কারো ঋণ বা জায়েয ওসিয়ত) সেগুলোকে এড়ানো, তাহলে সেটাও হারাম।

১. ফুযূলী বলা হয়, যে অন্যের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া বা যৌথ মালিকানায় শরিকের অনুমতি ছাড়া তাদের উপকার ভেবে কোনো হস্তক্ষেপ করে। নিজের স্বার্থে এমন করে থাকলে সে সরাসরি গাসিব তথা আত্মসাৎকারী গণ্য হবে।

মোটকথা, সকল শরিকের শরয়ী অনুমতি ছাড়া তাদের এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি মিরাসের মধ্যে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করে তাহলে সেটা 'ফুযূলী'র কাজ বা আত্মসাৎ। আর এটা মিরাস বণ্টনে বিলম্ব করার অতি সাধারণ একটি ক্ষতি।

কেউ এখানে এই অজুহাত বের করতে পারে যে, ওয়ারিসদের মধ্যে যে ব্যক্তি মরহুম বা মরহুমার জীবদ্দশায় তার প্রতিনিধি হিসেবে এসব বিষয় আঞ্জাম দিতেন তিনি এখনো এসব বিষয় আঞ্জাম দেবেন। একথা এজন্য সঠিক নয়, মরহুম বা মরহুমার ইন্তেকালের পর তার প্রতিনিধিত্বও শেষ হয়ে গেছে। অতএব এখন যতক্ষণ পর্যন্ত মিরাস বণ্টন না হবে কিংবা কমপক্ষে সবার ঐকমত্যে ও সন্তুষ্টিতে শরীয়তের বিধান মোতাবেক বিষয়গুলো দেখাশোনার জিম্মাদার নির্ধারণ না হবে কিংবা জিম্মাদারি বণ্টন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মিরাসের কোনো অংশে কেউ হস্তক্ষেপ করলে সেটা হয়ত ফুযূলীর হস্তক্ষেপ হবে নতুবা সরাসরি আত্মসাৎ, খেয়ানত ও জুলুম হবে।

চার. মিরাসের সম্পদে ব্যবসা বা চাষাবাদের মাধ্যমে যা যুক্ত হচ্ছে সেটাকে অপবিত্র কেন বানানো হচ্ছে?

সম্পূর্ণ মিরাস বা তার কোনো অংশে যদি কোনো ওয়ারিস আত্মসাৎমূলক হস্তক্ষেপ করে এবং সেটাকে ব্যবসা বা চাষাবাদে লাগিয়ে কিংবা অন্য কোনো পন্থায় ব্যবহার করে উপার্জন করে, তাহলে এই উপার্জন নিঃসন্দেহে হারামভাবে হয়েছে। সেটা তার জন্য একেবারে হারাম। সে যদি পরবর্তী সময়ে তা মিরাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেয় তাহলে সেই বর্ধিত সম্পদের বিধান কী হবে–সেটা শরিকরা গ্রহণ করতে পারবে, নাকি সদকা করে দিতে হবে–এই মাসআলা মুফতিয়ানে কেরাম থেকে জেনে নেবেন। আমার উদ্দেশ্য একথা বলা যে, মৌরসী সম্পদ এভাবে ফেলে রাখলে ক্ষতি। আর কেউ আত্মসাৎমূলক হস্তক্ষেপ করলে সেটা হারাম। এই পন্থায় বর্ধিত সম্পদ ভুলভাবে উপার্জিত হওয়ায় তাতে অপবিত্রতা অবশ্যই যুক্ত হয়েছে। এমনকি আত্মসাৎমূলক হস্তক্ষেপ যদি না-ও করে, ভালো উদ্দেশ্যে করে এবং বর্ধিত সম্পত্তি মিরাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার ইচ্ছাও থাকে তবু সেটা শরীয়তের বিধান মোতাবেক অন্য শরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন অনুযায়ী না হওয়ায় তা ফুযূলীর হস্তক্ষেপ বলে ধর্তব্য হবে; ফলে বর্ধিত অংশে কিছু না কিছু অপবিত্রতা এই অবস্থাতেও যুক্ত হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হল, এই অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে মিরাসের কোনো অংশ

নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায় কার ওপর বর্তাবে? কোনো সন্দেহ নেই, যার অন্যায় হস্তক্ষেপে এমনটা হয়েছে, দায়টা তার ওপরই বর্তাবে এবং সে সমস্ত শরিকের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকবে। সম্পূর্ণ বা আংশিক যতটুকু নষ্ট হবে তার ভর্তুকি দেওয়া তার ওপর ফরয।

পাঁচ. হকদারদের বঞ্চিত রাখার দায় কার ওপর বর্তাবে?

বণ্টনে যত বিলম্ব হবে, হকদারকে তার প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত রাখার গোনাহ তত বাড়তে থাকবে। কাউকে তার হক থেকে বঞ্চিত রাখলে কত যে অনিষ্ট, সে বিষয়ে যথাযথভাবে আমরা কমই ভাবি। চিন্তা করুন−

ক. প্রথম কথা হল, হকদারদের কাছে তাদের হক পৌছাতে বিলম্ব করা বা বিলম্বের কারণ হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই।

খ. বিনা কারণে হকদারের কাছে তার হক পৌছাতে বিলম্ব করলে তার জন্য কষ্টের কারণ হয়। অথচ কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া কবীরা গোনাহ।

গ. কাউকে তার হক থেকে বঞ্চিত রাখার অর্থ হল, সে সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকবে। চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত থাকবে। বিয়ে করা বা বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয় খরচাদি থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তার ওপর অর্পিত অন্যদের হক আদায় করা থেকে বঞ্চিত থাকবে। এছাড়া আরো অনেক জরুরি ও প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে বঞ্চিত হবে। এই সবকিছুর দায় তাদের ওপর বার্তাবে, যারা মিরাস বণ্টনে বিলম্বের কারণ হবে।

ঘ. কেউ নিজের হিস্যায় প্রাপ্ত সম্পদের মাধ্যমে কোনো নেক কাজ (দান-সদকা, ওয়াক্‌ফ বা অন্য কোনো নেক কাজ) করতে চায়। কিন্তু বণ্টনের বিলম্বের কারণে ওই নেক কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।

ঙ. মিরাসের অংশীদারদের মধ্যে যদি মাইয়েতের ইন্তেকালের সময় থেকেই কোনো এতিম থাকে কিংবা তার ওফাতের কিছুদিন পর তাদের সঙ্গে কোনো এতিম যুক্ত হয় (যেমন মাইয়েতের পর তার কোনো ছেলে মারা গেল, তাহলে তার নাবালেগ সন্তানরা সবাই এতিম, যারা তাদের দাদার মিরাসে অংশীদার হবে।) তাহলে বণ্টনে বিলম্ব করার অর্থ হল, এতিমকে তার হক থেকে বঞ্চিত রাখা। আর সম্পূর্ণ মিরাস বা তার কোনো অংশ যদি কারো ব্যবহারে থাকে, সে এতিমের সম্পদ ব্যবহার করছে। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেন−

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۖ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

'যারা এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।' –সূরা নিসা (৪) : ১০

ছয়. কয়েক প্রজন্মের মিরাস অন্যায়ভাবে ব্যবহার কীভাবে মেনে নেওয়া যায়? মিরাস বণ্টনে অলসতা বা উদাসীনতা করতে করতে কখনো কখনো এমন হয়, কয়েক প্রজন্মের মিরাস অবণ্টিত রয়ে যায় কিংবা বণ্টন হলে সেটা হয় জুলুমপূর্ণ। **কোনো হকদারকে (যেমন বোন) একেবারে বঞ্চিত করা হয় অথবা কম দেওয়া হয়, তাহলে হাতবদল হয়ে যার বা যাদের কাছে এই মিরাস পৌঁছেছে চিন্তা করলে দেখা যাবে, কত প্রজন্মের এবং কত মানুষের অংশ তাদের কাঁধের ওপর বোঝা হয়ে আছে অথচ তারা এই ভেবে খুশি যে, তারা সচ্ছল ও ভালো অবস্থায় আছে!!**

সাত. খেয়ানত, আত্মসাৎ ও জুলুম

শেষকথা, এই বণ্টনে বিলম্ব করার উদ্দেশ্য যদি হয় এক বা একাধিক অংশীদার সবসময়ের জন্য বা কয়েক বছরের জন্য কিংবা কয়েক মাসের জন্য অথবা কয়েক দিনের জন্য মিরাস থেকে ফায়েদা ওঠাতে থাকুক; অন্যরা বঞ্চিত হলে হোক, বিশেষত তাদের মানসিকতা যদি এই হয় যে, কয়েক বছর বা কয়েক মাস বঞ্চিত থাকলে কী সমস্যা (নাউযু বিল্লাহ) তাহলে তা অনেক ভয়ানক ব্যাপার। এতে সরাসরি তিনটা কাবীরা গোনাহ রয়েছে–

ক. আমানতের খেয়ানত।

খ. অন্যের হক আত্মসাৎ।

গ. জুলুম।

এগুলোর প্রত্যেকটিরই ক্ষতি শুধু আখেরাতেই নয়, বরং দুনিয়াতেও বর্ণনাতীত কঠিন।

বণ্টনে বিলম্ব করার বাহানাসমূহ

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মিরাস বণ্টন না করা বা বণ্টনে বিলম্ব করা কত বড় গোনাহ। এরপরও অনেক হিলা-বাহানা করে মানুষ বণ্টনে বিলম্ব করতে থাকে। মনে রাখবেন, কোনো ছুতোর আড়ালে এই কাজ জায়েয হয়ে যাবে না; গোনাহ গোনাহই থাকবে। আল্লাহ তাআলা আলিমুল গাইব। তাঁর সকল হুকুম ও সকল ফয়সালা ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে হিলা-বাহানার দ্বারা ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য

আমাদের কর্তব্য, সব ধরনের হিলা-বাহানা ছেড়ে শরীয়তের বিধান মোতাবেক যত দ্রুত সম্ভব মিরাস-সংশ্লিষ্ট হকগুলো আদায় করা এবং ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার প্রতি পরিপূর্ণ গুরুত্বারোপ করা।

এখানে কিছু বিষয় আলোচনা করা মুনাসিব মনে হচ্ছে, যেগুলোকে সাধারণত হিলা-বাহানা বানিয়ে মিরাস বণ্টনে বিলম্ব করা হয়। এগুলো একদম অনুচিত।

১. মা জীবিত আছেন!

কেউ বলে, মা জীবিত আছেন, এখন কীভাবে আমরা মিরাস বণ্টন করব? অথচ মায়ের অস্তিত্ব আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। তিনি থাকা অবস্থায়ই মিরাস বণ্টনের বরকতপূর্ণ কাজ অতি দ্রুত সমাধা করে ফেলা উচিত। অথচ উল্টো এটাকে বণ্টন বিলম্ব করার বাহানা বানায়। শরীয়ত তো যত দ্রুত সম্ভব বণ্টনের হুকুম করে আর আমরা মায়ের ইন্তেকাল পর্যন্ত মুলতবি করি; এর কী বৈধতা আছে? এই অজুহাতে টালবাহানা করলে বা বিলম্ব করলে বণ্টনে বিলম্ব করার গোনাহসহ আরো যত গোনাহের জন্ম হয়– এগুলোর মধ্যে কি কোনো কমতি হবে? নিজের মনমতো কোনো কারণ দেখিয়ে কাকে ধোঁকা দিতে চায়?

২. মা বাধা দেন বা বড় ভাই সম্মত নয়!

কেউ বলে, আমরা তো বণ্টন করতে চাই, কিন্তু মা বাধা দেন কিংবা আমাদের বড় ভাই বা অমুক ভাই সম্মত নয়! সবাই বোঝে, এটা কোনো ওজর নয়। শরীয়তের অকাট্য বিধান–

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

'আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য করা হারাম।'

৩. জায়গা-জমি বণ্টনযোগ্য নয়

কখনো বলে, মিরাস এত ছোট একটা ঘর যে, সেটা শরিকদের মধ্যে ভাগ করে দিলে আর কাজে লাগবে না। এটাও ধোঁকা। কারণ শরীয়ত বাহ্যিকভাবে বণ্টনযোগ্য নয়, এমন জিনিস কীভাবে বণ্টন করবে, তার বিধানও দিয়েছে, যা ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবসমূহে কিসমা অধ্যায় (كتاب القسمة) ও তাখারুজ পরিচ্ছেদ (فصل في التخارج)-এর অধীনে শরীয়তের দলিলসহ উল্লেখ আছে। এসব বিধান জেনে সে অনুযায়ী আমল করা ফরয। পুরো মিরাস বা মিরাসের কোনো অংশ অবণ্টনযোগ্য হওয়াকে বণ্টন না করা বা বিলম্ব করার ছুতো বানানো ঠিক নয়। এটুকু তো সবাই বোঝে যে, অবণ্টনীয় জিনিসের ন্যায্য

দাম নির্ধারণ করে তার মূল্য সবার মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনাও দেখার সুযোগ হয়েছিল। পিতার ইন্তেকালের পর ভাইয়েরা নিজেদের অংশ তো বণ্টন করেছে, কিন্তু বোনদেরকে হিস্যা বুঝিয়ে দেয়নি। এক বোন বলল, আমার অংশ মসজিদের (বাড়ির সামনে অবস্থিত মসজিদ) জন্য ওয়াকফ করে দিলাম। তখন এক ভাই বলল, তোমার অংশ তো পুকুরেও আছে, হাম্মামেও আছে; এখন সেটা মসজিদের জন্য কীভাবে দেবে!! চিন্তা করুন, মানুষ অন্যের হক আদায় না করার জন্য কত আশ্চর্যজনক বাতিল ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। সেই বেচারির অংশ অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে, এতে কোনো সমস্যা নেই। মসজিদের জন্য দেওয়ার কথা উঠেছে; তাই এখন যত হিলা-বাহানা!

৪. জায়গা-জমি নিয়ে মামলা চলছে

এটাও বাহানা। কারণ জমিতে বাস্তবেই যদি অন্যের হক থাকে, সেটা আদায় করা ফরয। আর মোকদ্দমা যদি জুলুমের কারণে হয় এবং বাস্তবেই তা বণ্টনে প্রতিবন্ধক হয় তাহলে সবাই মিলে এ ব্যাপারে পরামর্শ করে ও চিন্তা-ভাবনা করে মোকদ্দমার ফয়সালা করাতে হবে; চুপচাপ বসে থাকার কী অর্থ?

এটাও অবাক করা বিষয় যে, মিরাসের জায়গা-জমি এক বা একাধিক ওয়ারিসের দখলে বা ব্যবহারে থাকবে, এক্ষেত্রে মোকদ্দমা প্রতিবন্ধক নয়; কিন্তু কোনো হকদার যখন নিজের অংশ চায় তখন মোকদ্দমা প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। এটা তামাশা নয় তো কী?

৫. সকল অংশীদার বণ্টন করতে চায় না

এটাও মিথ্যা অজুহাত। কারণ কেউ বণ্টনের দাবি না করলেও বণ্টন করা জরুরি। আর একজনও যদি দাবি করে তখন বণ্টন করা তো আরো বেশি জরুরি হয়ে যায়; কারো না চাওয়ার কারণে বণ্টনে বিলম্ব করা জায়েয নয়।

৬. আরো কিছু বাহানা

কখনো বলে, 'কোনো কোনো ওয়ারিস ছোট; সেজন্য এখন বণ্টন করা মুনাসিব নয়। তারা বড় হোক, শিক্ষা-দীক্ষা পূর্ণ হোক এরপর বণ্টন করব।'
'কোনো কোনো ভাই-বোনের বিয়ে হয়নি। তাদের বিয়ে হলে পরে বণ্টন করব।' এটাও নিছক বাহানা। এ কারণে মিরাস বণ্টনে বিলম্ব করা জায়েয নয়।

কেউ বলে, 'কী জিনিসই বা রেখে গেছে। এগুলো ভাগ করে দিলে প্রত্যেকের অংশে কতটুকুইবা পড়বে'। মনে রাখবেন, এটাও নিছক বাহানা। যদি প্রত্যেক

শরিক এক টাকা বা আট আনা করে পায় তাহলে সেটাও তাদের হক। ভাগ করে প্রত্যেককে তাদের অংশ দিয়ে দেওয়া জরুরি।

কিছু লোক তো এমন, যাদের কাছে মিথ্যা অজুহাতও নেই। তখন তারা এই বলে যে, ওয়ারিসরা সবাই সচ্ছল কিংবা অমুক অমুক সচ্ছল। তাদেরকে মিরাসের অংশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই অথবা বলে, এই মাত্র বাবার/মায়ের/ভাইয়ের/চাচার ইন্তেকাল হল। এখনই মিরাস বন্টনে বসে গেলে মানুষ কী বলবে?

কে না বোঝে, এগুলো–

عذر گناہ بدتر از گناہ

(গোনাহের অজুহাত দাঁড় করানো গোনাহের চেয়েও জঘন্য)-এর অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তের হুকুম জানার পর এ ধরনের অজুহাতের আশ্রয় নেওয়া স্পষ্ট হারাম। 'লোকে মন্দ বলবে' এ কারণে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নে বিলম্ব করা জায়েয নয়। তেমনিভাবে 'সে তো সচ্ছল' একথা বলে শরীয়ত-নির্ধারিত হক থেকে কাউকে বঞ্চিত রাখাও জায়েয নয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মিরাস বন্টনে বিলম্ব করার সুযোগ যে নেই এর একটি স্পষ্ট প্রমাণ হল, বিলম্বের যে দু-একটি কারণ বাহ্যিকভাবে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় সেগুলোর জন্যও শরীয়ত বন্টনে বিলম্ব করার ব্যাপক অনুমতি দেয়নি। উদাহরণস্বরূপ একটি ওজর এই হতে পারে, মরহুম ইন্তেকালের সময় তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান রেখে গেছেন। মিরাসের মধ্যে এই বাচ্চারও অংশ রয়েছে। সে জীবিত প্রসব হলে মিরাসের অংশ পাবে। এখন প্রশ্ন হল, এই বাচ্চা জীবিত প্রসব হবে, নাকি মৃত? ছেলে হবে নাকি মেয়ে? এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার আগে অংশীদারদের হিস্যা নির্ধারণ করা কঠিন। এই অবস্থায় বাহ্যিকভাবে বন্টনে বিলম্ব করার পরামর্শ দেওয়া উচিত মনে হয়। অথচ মাসআলা কিন্তু ঢালাওভাবে এমন নয়। এই মাসআলারও বিভিন্ন সুরতে বন্টনে বিলম্ব না করারই হুকুম। তবে তার পদ্ধতি কী হবে সেটি মুফতিয়ানে কেরাম থেকে জেনে নিতে হবে। ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবে এ-সংক্রান্ত মাসআলাগুলো ফাসলুন ফিল হামলি এবং কিতাবুল কিসমাতে বর্ণিত আছে।

এমনিভাবে একটি ওজর এই হতে পারে, মরহুমের স্ত্রীর ইদ্দত তো ওই বাড়িতেই পালন করতে হবে, যেখানে তিনি স্বামীর জীবদ্দশায় থাকতেন। সেই ঘর যদি স্বামীর মালিকানাধীন হয় তাহলে ওই ঘরও তো মিরাসের অংশ। অতএব অন্তত ওই ঘরের বন্টন তো নিঃসন্দেহে ইদ্দত পুরো না হওয়া পর্যন্ত

বিলম্ব করতে হবে। আসলে আমরা জরুরি মাসআলাগুলো জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, এই অবস্থাতেও বিধান হল, সেই ঘরে স্ত্রীর যেটুকু অংশ আছে (কোনো অবস্থায় এক-চতুর্থাংশ আর কোনো অবস্থায় এক-অষ্টমাংশ) সেটা যদি তার অবস্থানের জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে ওই ঘরেই ইদ্দত পুরো করবে। স্পষ্ট কথা, এ হালতে তার অবস্থানের নিমিত্তে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বণ্টনে বিলম্ব করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঘরের মাঝে তার অংশটুকু যদি তার অবস্থানের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে সবার সন্তুষ্টিক্রমেই সে সেখানে ইদ্দত পালন করবে। যদি হকদাররা আপত্তি জানায় তাহলে মহিলার উচিত অন্যত্র গিয়ে ইদ্দত পূর্ণ করা। কিতাবুল আছলে আছে–

وَلَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ لِزَوْجِهَا فَكَانَ نَصِيبُهَا مِنْهُ لَا يَكْفِيهَا، وَأَخْرَجَهَا أَهْلُ الْمَنْزِلِ، فَهِيَ فِيْ سَعَةٍ مِنَ الْخُرُوْجِ.

–কিতাবুল আছল খ. ৪ পৃ. ৪০৭

ইমাম সারাখসী রহ. মাবসূতে লেখেন–

وَإِنْ كَانَتْ فِيْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا فَمَاتَ الزَّوْجُ إِنْ كَانَ نَصِيبُهَا مِنْ ذٰلِكَ يَكْفِيهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْكُنَ فِيْ نَصِيبِهَا فِي الْعِدَّةِ ... وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهَا لَا يَكْفِيهَا فَإِنْ رَضِيَ وَرَثَةُ الزَّوْجِ أَنْ تَسْكُنَ فِيْهِ سَكَنَتْ وَإِنْ أَبَوْا كَانَتْ فِيْ سَعَةٍ مِنْ التَّحَوُّلِ لِلْعُذْرِ.

–মাবসূত, শামসুল আইম্মা সারাখসী খ. ৬ পৃ. ৩৪

আমাদের সমাজে মিরাস বণ্টন-সংক্রান্ত আরো অনেক অপরাধ, নাজায়েয চিন্তা ও প্রথা প্রচলিত আছে। এগুলোর সংশোধন করা ফরয। আলহামদু লিল্লাহ, উলামায়ে কেরাম এসব বিষয়ে কমবেশি সতর্কও করছেন। হায়াতে থাকলে আরেক সংখ্যায় আরো কিছু বিষয় পেশ করার ইচ্ছা আছে। অবশ্য এখানে উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী আবদুর রউফ সাখখারবী দামাত বারাকাতুহুমের পুস্তিকা থেকে দুটি ঘটনা উদ্ধৃত করছি। এর দ্বারা মিরাস বণ্টনের বিষয়ে আমাদের বুযুর্গগণ কত গুরুত্ব দিতেন সেটাও সামনে আসবে।

মুফতী সাহেব 'তাকসীমে ওয়ারাসাত কী আহাম্মিয়াত' পুস্তিকায় লেখেন– 'আমার দাদা মুহতারাম হযরত মাওলানা আবদুল আযীয সাহেব রহ. হযরত থানভী রহ.-এর হাতে বাইআত ছিলেন এবং হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ সাহেব রহ.-এর খলীফায়ে মুজায ছিলেন। হযরত থানভী রহ.-এর তালীম-তরবিয়তের একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই ছিল, তাঁর কাছে বান্দার হক আদায়

করা ও করানোর প্রতি অনেক গুরুত্ব ছিল। এ বিষয়ে তিনি অনেক তাগিদ করতেন।...

যেহেতু মিরাস বণ্টনও বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু হযরত থানভী রহ.-এর মুরীদগণের মধ্যে এ বিষয়টিরও অনেক গুরুত্ব ছিল। সেজন্যই আমাদের দাদা হযরত মাওলানা আবদুল আযীয সাহেব রহ.-এর মাঝেও মিরাস বণ্টনের বিষয়ে অনেক চিন্তা-ফিকির দেখা যেত। (এটা মূলত শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী সকল বুযুর্গ ও তাঁদের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে এর গুরুত্ব থাকবে না, সে কীভাবে অনুসরণীয় হতে পারে?) আমার দাদা রহ.-এর কাছে যে মিরাস পৌঁছেছিল সেটা ওপরের কয়েক ধাপ পর্যন্ত বণ্টিত হয়নি। এ বিষয়ে তাঁর অনেক দুশ্চিন্তা হল– এই মালের হকদার ও ওয়ারিস তো অনেক। কারণ এটা কয়েক প্রজন্ম ধরে অবণ্টিত রয়ে গেছে। সেজন্য দূর-দূরান্তের ওয়ারিসদের খুঁজে বের করেন এবং তাদের প্রত্যেকের অংশ আলাদা করেন। সবার নামে খাম বানিয়ে সেগুলোতে তাদের অংশ রাখেন। সময়ের বিবেচনায় কোনো খামে দুই আনা, কোনোটাতে চার আনা, কোনোটাতে আট আনা। আবার কোনোটাতে এক রুপি ও কোনোটাতে দুই রুপি। এরপর ওয়ারিসদের খোঁজ করে তাদের কাছে তাদের অংশ পৌঁছে দেন।

স্পষ্ট, দুই আনা, চার আনা পৌঁছানো কত কঠিন কাজ। কিন্তু এটা সেই মানুষই করতে পারেন, যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় আছে। এদিকে আমরা লাখ লাখ রুপি অন্যায়ভাবে খেয়ে বসে আছি, কোনো পারোয়া নেই অথচ ওদিকে দুই দুই আনা পৌঁছানোর জন্য ফিকির হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার ভয় থাকলে দুই আনা পৌঁছানো সহজ নতুবা লাখ লাখ রুপি খেয়ে ফেললেও কোনো পরোয়া হয় না।

আমার দাদা রহ.-এর আরেকটি অভ্যাস ছিল। বংশের কেউ ইন্তেকাল করলে দাফনের পর কবরস্থান থেকে সোজা মাইয়েতের ঘরে চলে যেতেন এবং দরজার বাইরে বসে পড়তেন। তখন মানুষের কাছে খুব বেশি অর্থ-সম্পদ থাকত না। তিনি ঘরের লোকদের বলতেন, মাইয়েত যা কিছু রেখে গেছেন বাইরে নিয়ে আস, আমি সেগুলো ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করে দেব। ঘরের লোকেরা মাইয়েতের যা কিছু থাকত সেগুলো বাইরে পাঠিয়ে দিত। হযরত দাদাজান মরহুম তখনই সেখানে বসে মিরাস বণ্টন করে তারপর ঘরে যেতেন। আসল পদ্ধতি এটাই– কাফন-দাফনের পর প্রথম কাজ হল, যত দ্রুত সম্ভব মৃতব্যক্তির মিরাস বণ্টন করে ফেলা এবং এতে বিলম্ব না করা।'

–তাকসীমে ওয়ারাসাত কী আহাম্মিয়াত ১৮৫-১৮৭

هٰذَا، وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَبَارَكَ وَسَلَّمَ، عَلٰى نَبِيِّنَا خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَرَحْمَة لِلْعَالَمِيْنَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

০৭-০৪-১৪৪৩ হিজরী
শনিবার
[ডিসেম্বর ২০২১ ঈ.]

বয়ান

শোকর, সবর ও তাকওয়া
মুহসিন মুমিনের তিনটি বড় গুণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا. أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ۝ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.
أَمَّا بَعْدُ :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানিতে এক মাস পর আবার আমরা মাসিক দ্বীনী মাহফিলে একত্র হতে পেরেছি আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যত শোকর আমরা আদায় করব, তত তিনি আমাদেরকে তাঁর নেয়ামত বাড়িয়ে দেবেন।

শোকর কীভাবে আদায় করব

শোকর আদায় করতে হয় দিলে দিলে, জবানে এবং আমলের মাধ্যমে। এ ছাড়াও নেয়ামতের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শোকর আদায় করতে হয়। নেয়ামতের গলত ব্যবহার থেকে বিরত থেকে শোকর আদায় করতে হয়। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর শোকর আদায় করা জরুরি।

জবানের মাধ্যমে শোকর আদায় করার কিছু পদ্ধতি; যেমন, মুখে আলহামদু লিল্লাহ বলা। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর শোকর আদায় করতে পারি। প্রতি নামাযের পর, প্রতিটি নেক আমলের পর আল্লাহর শোকর আদায় করতে পারি। যখনই আল্লাহর কোনো নেয়ামতের কথা স্মরণ হবে তখনই বলব আলহামদু লিল্লাহ।

অন্তরের শোকর হল, অন্তরে এ কথার বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ আমাকে যত

নেয়ামত দান করেছেন, সব আল্লাহরই মেহেরবানি। আমার কোনো প্রাপ্য ছিল না আল্লাহর কাছে। যা পেয়েছি, সবই প্রাপ্তি। আল্লাহর কাছে আমার কোনো পাওনা নেই, তিনি মেহরবানি করে আমাকে দান করেছেন। আল্লাহ যদি মেহরবানি করেন তাহলে এই নেয়ামত আমি ব্যবহার করতে পারব, না হয় আমি এটা থেকে কোনো উপকৃত হতে পারব না। এই নেয়ামত পাওয়াও আল্লাহর রহমত, এটি কাজে লাগানোও আল্লাহর রহমত। এই বিশ্বাস রাখা হল দিলের মাধ্যমে শোকর।

নতুবা জবানে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললাম, কিন্তু মনে মনে যদি থাকে যে, এটা আমার যোগ্যতাবলে হয়েছে, এটা আমার অধিকার, তাই পেয়েছি, নাউযু বিল্লাহ! তাহলে এটা হবে অনেক বড় নাশোকরি।

আচ্ছা, আল্লাহর কাছে কি কারো কোনো অধিকার হতে পারে? কেউ কি নিজের যোগ্যতাবলে আল্লাহ থেকে কিছু নিতে পারে? কাজেই অন্তরে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এটা আল্লাহর দান, আল্লাহর মেহরবানি।

আমলের শোকর হল, আল্লাহ তাআলা মেহরবানি করে আমাকে এই নেয়ামত দান করেছেন, আমি কীভাবে তাঁর নাফরমানি করি! এই অনুভূতি থেকে তাঁর নাফরমানি থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাকে এত নেয়ামত দান করেছেন, এখন যদি আমি এই নেয়ামত দিয়ে তাঁরই নাফরমানি করি, তো এটা হবে তার না-শোকরি।

আল্লাহ তাআলার দেওয়া ফরয-ওয়াজিব বিধানগুলো ছাড়ব না আর তিনি যেসব কাজকে গোনাহ সাব্যস্ত করেছেন, বেঁচে থাকতে বলেছেন, সেগুলো আমি করব না। এটা হল আমলের মাধ্যমে শোকর। সকল ফরয-ওয়াজিব বিধান যথাযথ আদায় করা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

তিন ধরনের শোকর গেল– জবানের মাধ্যমে শোকর, দিলের মাধ্যমে শোকর এবং আমলের মাধ্যমে শোকর।

চতুর্থ হল, যে নেয়ামত আল্লাহ দান করেছেন তার সদ্ব্যবহার। নেয়ামতের যদি অপব্যবহার হয় তাহলে নাশোকরি হবে। সহীহ ব্যবহার হলে শোকর আদায় হবে। আমি যদি চোখের গোনাহ করি, তবে চোখের নেয়ামতের নাশোকরি হবে। চিন্তা করুন, যারা চোখে দেখে না, জন্মান্ধ বা আগে ভালো ছিল, এখন কোনো কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তারা কত মসিবত ও অশান্তিতে আছে! কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে চোখের নেয়ামত দান করেছেন। এখন যদি এই নেয়ামতকে ভুল পথে ব্যবহার করি, গোনাহের কাজে ব্যবহার করি,

নজরের হেফাজত না করি, তাহলে একদিকে গোনাহ যেমন হবে আবার চোখের নেয়ামতের নাশোকরিও হবে। চোখের নেয়ামতের শোকর হল, চোখ দিয়ে কুরআন দেখব। চোখ দিয়ে মা-বাবার চেহারার দিকে তাকাব। চোখের সাহায্যে আমি হেঁটে যাব; গোনাহের পথে, না নেকির পথে? নেকির পথে। মোটকথা আল্লাহ তাআলার দেওয়া এই চোখ দিয়ে আমি হয় দুনিয়ার কোনো ভালো কাজ করব, নয়ত আখেরাতের কোনো নেক কাজ করব।

দুনিয়ার নেক কাজ যেমন খেত-খামারে কাজ করছি, এটা দুনিয়ার নেক কাজ। বৈধ চাকরিতে আছি, দায়িত্ব আদায় করছি, দুনিয়ার নেক কাজে আছি।

আল্লাহ তাআলা আমাকে হাঁটার শক্তি দান করেছেন, ধরার শক্তি দান করেছেন, তার কদর করব। কত মানুষ আছে, যাদের হাত অচল অকেজো হয়ে গেছে! কখনো এক্সিডেন্টের কারণে শেষ হয়ে যায়। কখনো ভুল চিকিৎসার কারণেও নষ্ট হয়ে যায়। আমাকে যে আল্লাহ তাআলা হাত দান করলেন, হাত আমার ভালো ও সুস্থ রাখলেন, এই হাত কি গোনাহের কাজে ব্যবহার হবে, না নেকির কাজে? এই যে আল্লাহ তাআলা আমাকে শ্রবণশক্তি দান করলেন, এর দ্বারা কি আমি গোনাহের কথা শুনব, না নেকির কথা? নেকির কথা। কুরআন তেলাওয়াত শুনব, নাকি গান শুনব? কুরআন তেলাওয়াত শুনব।

আল্লাহ তাআলা আমাকে মস্তিষ্ক দান করেছেন; এর দ্বারা কি আমি ভালো বিষয় চিন্তা করব, না গোনাহের বিষয় চিন্তা করব? বাকশক্তি দান করেছেন; আমি কি ভালো কথা বলব, না খারাপ কথা বলব? হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

যার আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আছে অর্থাৎ যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং আখেরাতকে বিশ্বাস করে, বললে সে যেন ভালো কথা বলে, আর না হয় চুপ থাকে।

ছোট্ট এই জবান আল্লাহ তাআলার দান। অঙ্গটা যদিও আকারে অনেক ছোট, কিন্তু এর কাজ অনেক। কাজেই কথা বলতে একটু চিন্তা করা। যা-ই মুখে আসে তা-ই বলে দেওয়া যাবে না। যা-ই মুখে আসে তাই যদি বলে দেওয়া হয়, তাহলে মুখে গোনাহের কথা এসে যাবে। ভেজালের কথা এসে যাবে। মুখে এমন কথাও এসে যেতে পারে, যার এক কথায়ই সংসার শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! কাজেই জবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বললে ভালো কথা

বলব, আর না হয় চুপ থাকব। চা দোকানে বসে কে কত বেশি বলতে পারে, পুরো দুনিয়ার খবর কে কত বেশি জানে সেই প্রতিযোগিতা। এমনভাবে মন্তব্য করতে থাকে, যেন তিনি সবকিছু জানেন এবং বোঝেন! ভুল হোক আর ঠিক হোক সেটার কোনো তোয়াক্কা নেই।

আচ্ছা বলুন তো, শুধু মন্তব্য করার মধ্যে কী কোনো ফায়েদা আছে? অহেতুক গল্প, এর দ্বারা কি শুধু সময় নষ্ট হয়, নাকি আল্লাহ তাআলা জবানের যে নেয়ামত দিয়েছেন এর গলত ব্যবহারও হয়? অহেতুক গল্প শুরু হলে গোনাহের কথা না এসে কি পারে? একপর্যায়ে গীবত, পরনিন্দার দিকে চলে যায়। কাজেই অহেতুক কথা বলতে নেই। হাদীসে এসেছে–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

'একজন মুসলিমের ইসলামের সৌন্দর্য হল, সে অহেতুক-অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩১৭

যে কথায় কোনো লাভ নেই, ফায়েদা নেই, না দুনিয়ার ফায়েদা, না আখেরাতের ফায়েদা, এমন কথা থেকে বিরত থাকব। যে কথা বললে আমার ফায়েদা আছে–হোক দুনিয়াবি ফায়েদা বা আখেরাতের–সেটা বলব। যেমন মিস্ত্রিকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি, সেখানে কথা বললে ফায়েদা আছে। আমি জমির মালিক, শ্রমিককে কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কথা বলতে হচ্ছে, এটা বলব। কারণ এতে আমার দুনিয়াবি ফায়েদা আছে। আখেরাত-বিষয়ক, যেমন কোনো আলেমকে একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম, ফায়েদা আছে। অনর্থক কথা যত কম বলে পারা যায় ততই লাভ। যে কথায় কোনো ফায়েদা নেই, এমন কথা বলতে গেলে অবচেতনভাবেই গোনাহের কথা এসে যাবে, আপনি টেরও পাবেন না।

এভাবে চোখের নেয়ামত, কানের নেয়ামত, জবানের নেয়ামত, দিলের নেয়ামত, মাথার নেয়ামত, হাত-পায়ের নেয়ামতসহ যত নেয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন, সব নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করতে হবে। অপাত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা ধন-দৌলত দান করেছেন, এখন তা গোনাহের কাজে খরচ করব, নাকি জরুরি প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করব? আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দান করা যেমন জরুরি কাজ, সংসারে খরচ করাও জরুরি কাজ। কিন্তু গোনাহের কাজে খরচ করলে সেটা হবে জাহান্নামের কাজ। আল্লাহ তাআলা যাকে যে যোগ্যতা দিয়েছেন, সেটাকে শুধু নেক কাজেই ব্যবহার করতে হবে।

দুনিয়ার নেক কাজ হোক বা আখেরাতের।

যাহোক, আমরা পাঁচভাবে শোকর আদায় করতে পারি :

১. জবানের মাধ্যমে শোকর।

২. দিলের মাধ্যমে শোকর।

৩. আমলের মাধ্যমে শোকর।

৪. নেয়ামতের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শোকর।

৫. নেয়ামতের অন্যায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে শোকর।

যদি এভাবে শোকরের জিন্দেগি গড়তে পারি, তবে আমরা সফল।

কাকে বলে তাকওয়া

আমি সূরা ইউসুফের ৯০ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি–

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং সবর করবে আল্লাহ তার সওয়াব ও প্রতিদান কখনো নষ্ট করবেন না। কারণ, যার মধ্যে তাকওয়া আর সবর আছে সে ভালো মানুষ। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতেও প্রতিদান দেবেন আখেরাতেও প্রতিদান দেবেন। কাজেই আমাদের মধ্যে শোকরের সঙ্গে তাকওয়া ও সবরও থাকতে হবে।

কাকে বলে তাকওয়া? আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ কি ভয় করে ঘরে বসে থাকা, না কাজ করা? এত ভয় পাচ্ছে যে, এখন নড়তেই পারছে না, একে কি তাকওয়া বলে? তাকওয়ার অর্থ হল, আল্লাহ তাআলার সামনে যে আমাকে হাজিরা দিতে হবে, দাঁড়াতে হবে, তখন কীভাবে তাঁকে মুখ দেখাব, সেটা চিন্তা করে তিনি যা ফরয করেছেন তা করা, যা হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকা।

তাকওয়া কাকে বলে, তার অনেক ব্যাখ্যা আছে। সূরা ক্বাফের একটি আয়াত লক্ষ করুন–

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝

হাশরের মাঠে একপর্যায়ে জান্নাত কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে মুত্তাকীদেরকে দেখানোর জন্য। অর্থাৎ এতদিন তো শুধু জান্নাতের কথা শুনেছ, এখন দেখ!

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۝

দুনিয়াতে শুধু তোমাদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হত এই বলে যে, হারাম ও গোনাহ পাপাচার ছাড়লে জান্নাত পাবে। নেক কাজ করলে জান্নাত পাবে। এখন স্বচক্ষে দেখ।

لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ.

জান্নাত দেখানো হবে ওই ব্যক্তিকে, যে গোনাহ থেকে বেঁচে ছিল। ভুলে কখনো গোনাহ হয়ে গেলে তওবা করত। এক গোনাহের জন্য দশবার তওবা করত। শত বার আল্লাহ তাআলার দরবারে কাঁদত।

শয়তানের ওয়াসওয়াসায়, নফসের ধোঁকায় কখনো গোনাহ হয়ে গেলে বসে থাকে না। গোনাহ করতেই থাকে, এমন না; বরং ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তওবা করে। বারবার করে। একে বলে 'আওয়াব'।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে না দেখেও ভয় করে। দয়াময় আল্লাহ কত নেয়ামত আমাকে দান করেছেন, তারপরও কি আমি তাঁর নাফরমানি করব? আল্লাহর রহমত ও নেয়ামতের কথা স্মরণ করে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ.

আল্লাহর দরবারে হাজির হয় এমন দিল নিয়ে যে দিল আল্লাহমুখী। যে দিলের মধ্যে দুনিয়াবি লোভ ও শয়তানি ফিকির নেই। কোনো মুনাফেকি ও শিরক নেই। কোনো অন্যায় বাসনা ও পাপাচার নেই। আল্লাহমুখী পরিষ্কার দিল নিয়ে সে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়। দুনিয়াতেও নামায-দুআ ইত্যাদির মাধ্যমে সে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়। আখেরাতেও যখন হাজির হবে, তখনো তার দিল থাকবে সাফ ও পরিষ্কার। যেখানে কোনো মুনাফেকি, কোনো পাপাচার নেই; বরং তার দিলটা আল্লাহর মহব্বতে পরিপূর্ণ।

শুধু তাই নয়, আল্লাহর মহব্বত যেসব কাজের মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যায়, তাই সুন্নতকে মহব্বত করে। নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যায়, তাই নেক আমলকে মহব্বত করে। মসজিদ-মাদরাসার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যায়, মসজিদ-মাদরাসাকে মহব্বত করে। দ্বীনের আলেমের

মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যায়, আলেমকে মহব্বত করে। তালেবে ইলমের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যায়, তালেবে ইলমকে মহব্বত করে। মা-বাবার খেদমতের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যায়, মা-বাবাকে মহব্বত করে। অর্থাৎ তার সবকিছু আল্লাহকেন্দ্রিক এবং আল্লাহমুখী। যাকে ভালোবাসলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে সে তাকে ভালোবাসে। যাকে ভালোবাসলে আল্লাহ নারাজ হবেন, আমি তাকে ভালোবাসব না।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۝

আমি আল্লাহমুখী। আমার চেহারা আল্লাহর দিকে। এই যে নামাযে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালাম, কেবল চেহারা আল্লাহর দিকে, নাকি আমার দিলও আল্লাহর দিকে? কাজেই এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে, নফল নামাযে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিয়ে আমার দিলটাকে প্রস্তুত করি, যাতে আমার দিলটাও আল্লাহমুখী হয়ে যায়! কোনোভাবেই যেন আল্লাহর নাফরমানির দিকে না যায়। কারণ আল্লাহর নাফরমানির দিকে যাওয়ার অর্থই হল, আমার দিল আল্লাহ থেকে সরে অন্য দিকে চলে গেছে! এজন্য আমাদের তওবা করা ফরয।

তওবা করার অর্থ কী

তওবা অর্থ ফিরে আসা। কোন দিকে ফিরে আসবেন? আপনি তো নিজ জায়গায়ই আছেন, আবার ফিরে আসবেন কীভাবে? অর্থাৎ এই যে গোনাহ করা হল, গোনাহ করা মানেই হল আল্লাহর দিক থেকে সরে যাওয়া। আল্লাহমুখী আর থাকা হল না। তাই তওবা করা ফরয। তওবা করে আবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে–

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ.

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ.

যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। সত্য মাবুদ একমাত্র আল্লাহ।

কাজেই আমার জবান, দিল ও দেহ সবকিছু একমাত্র আল্লাহমুখী হয়ে যাওয়া উচিত। আমি যদি গোনাহ করে ফেলি, আল্লাহর নাফরমানি করে ফেলি, তাহলে তো আমি উল্টো পথ ধরলাম। জাহান্নামের পথে হাঁটা ধরলাম। আমার

বাড়ি তো জান্নাত। কেন আমি জাহান্নামের পথে হাঁটছি? পাপ করা মানেই আমি উল্টো দিকে ফিরলাম। পাপ করা মানেই আমি জাহান্নামের রাস্তার দিকে হাঁটা ধরলাম। এজন্য তওবা করা ফরয।

মনে রাখবেন, কোনো পাপকে দীর্ঘ করা যায় না। ভুল মানুষের হয়, কিন্তু ভুলের ওপর বসে থাকা যায় না। ভুলে গোনাহ হয়ে যায়, কিন্তু মুমিন গোনাহ করতে থাকে না, তওবা করে। তওবা করা ফরয। তাই মুমিন গোনাহ করে বসে থাকে না।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

আমি ক্ষমা চাচ্ছি আল্লাহর কাছে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই...

আমি কোন দিকে হাঁটছি? কোথায় যাচ্ছি আমি?

وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

আল্লাহ! আমি ফিরে আসছি। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। আমাকে দয়া করে আপনার রহমতের কোলে টেনে নিন! আমি অন্য দিকে ফিরব না। অন্য দিকে যাব না।

আরেকটি দুআ–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

আপনি যে দুআ পারেন, যেই ভাষায় পারেন, আল্লাহর কাছে বলতে থাকুন। ইস্তেগফারের কালেমা, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কালেমার অভাব নেই। আপনি যেটা পারেন, যেই ভাষায় পারেন চাইতে থাকুন। সকল ভাষাই তো আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই আরবীতে না পারলে নিজের ভাষায় আল্লাহকে বলুন। আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন। আল্লাহ, আমার ভুল হয়ে গেছে, আপনি ক্ষমা করে দিন! আমি বাঁচতে চাই, আপনি আমাকে রক্ষা করুন! আমি শয়তান ও নফসের ধোঁকায় বা লোভে পড়ে যত পাপের পথে পা বাড়াব, আপনি আপনার রহমত দিয়ে আমাকে টেনে ধরে রাখবেন, যাতে আমি পাপের পথে না যেতে পারি!

এভাবে যদি আমি দিল থেকে বারবার বলি, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই শুনবেন। এরপর যদি আমি পাপের পথে ধাবিত হই, সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মরণ

হবে– আরে, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এতবার ক্ষমা চাইলাম, এখন কী করে আবার পাপে লিপ্ত হই! এভাবে যখন স্মরণ হতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা বাঁচার তাওফীক দেবেন ইনশা-আল্লাহ। এর নামই হল তাকওয়া।

لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ.

'হাফীয'-এর একটা অর্থ হল গোনাহ থেকে বাঁচা। হালাল-হারাম বেছে চলা। হালাল গ্রহণ করা, হারাম থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহর হক ও বান্দার হক যথাযথভাবে আদায় করা। কোনো মাখলুকের কোনো হক নষ্ট করবে না।

'হাফীয'-এর আরেক অর্থ আছে। সেটা হল, আল্লাহ যে আমাকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন– পবিত্র বের করেছেন, নাকি অপবিত্র? পবিত্র বের করেছেন। শুধু পবিত্র নয়, বরং নিষ্পাপ। অর্থাৎ দেহটা যেমন পাক, কোনো ময়লা নেই, তেমনি মন ও আমলনামাটাও পাক-পবিত্র। কাজেই তুমি সেটাকে গোনাহের ময়লা দ্বারা গান্দা ও কলুষিত করো না।

ভুলে কখনো নাপাক হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পাক করার ব্যবস্থা কর। যেমন শরীরে কোনো নাপাক লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলি। শরীরে নাপাক লাগলে ধোয়া হয় পানি দিয়ে। গোনাহের ময়লা ধুতে হয় তওবা ও ইস্তেগফার দিয়ে। এর নাম হল 'হাফীয'।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ۝

যার দিলে আল্লাহর ভয় আছে, যে বেশি বেশি তওবা করে, হালাল-হারাম বেছে চলে, সে দিলকে গোনাহের ময়লা দিয়ে অপবিত্র করে না। গোনাহ হয়ে গেলে তওবা করে পাক-সাফ করে ফেলে। এর নাম হল মুত্তাকী। এই ধরনের মুত্তাকীদের সামনে হাশরের মাঠে জান্নাত পেশ করা হবে। এটা হল সেই জান্নাত, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দুনিয়াতে করা হয়েছে।

ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ

জান্নাতে প্রবেশ কর নিশ্চিন্তে, নিরাপদে। সেখানে কোনো কষ্ট নেই। কোনো পেরেশানি নেই। আর সেখানে তোমাকে এই চিন্তাও করতে হবে না যে, কত দিন থাকতে পারব এই সুখের জান্নাতে? কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ.

এখানে প্রবেশ করার পর আর তোমাকে বের করা হবে না। কোনো মুমিন–আল্লাহ মাফ করুন–তার পাপাচারের কারণে যদি জাহান্নামে চলেও

যায়, একসময় সেখান থেকে বের হয়ে জান্নাতে চলে আসবে। কিন্তু জান্নাতে গিয়ে কেউ কখনো আর সেখান থেকে বের হবে না। সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ۝

আর সেখানে যাওয়ার পর যা চাওয়া হবে তাই পাওয়া যাবে। মানুষের চাওয়ার শেষ হতে পারে, আল্লাহ তাআলার দেওয়ার শেষ হবে না। কত চাইবে তুমি, চাইতে থাক। তোমার চাওয়ার শেষ আছে, আল্লাহর দেওয়ার কোনো শেষ নেই।

اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ۝

যার মধ্যে তাকওয়া আর সবর আছে সে ভালো মানুষ। আল্লাহ তার সওয়াব নষ্ট করবেন না।

সবরের অর্থ ও তার প্রকার

বিপদ-আপদ এলে ধৈর্যহারা না হয়ে ধৈর্যধারণ করা হল সবরের চার প্রকারের এক প্রকার। বিপদাপদ এলে ধৈর্যহারা হব না। কারণ বিপদাপদ যা আসছে, সব আল্লাহর হুকুমেই আসছে। হয় আমার গোনাহের কারণে আসছে, নয়ত আমার পরীক্ষার জন্য আসছে বা মর্তবা বুলন্দ করার জন্য আসছে। এজন্য তখন কাজ হল আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। হতে পারে, এই বিপদাপদের কারণে আল্লাহ আমার অনেক গোনাহ মাফ করে দেবেন।

যাহোক, বিপদাপদ এলে ধৈর্যধারণ করা সবরের এক প্রকার। এ ছাড়াও আরো সবর আছে।

সবরের দ্বিতীয় প্রকার

সবরের আরেক প্রকার হল, নেক কাজে সবর করা। আচ্ছা, নেক কাজ করতে সবর লাগে কি না? লাগে। শীতের ঠাণ্ডায় ফজরের নামাযের জন্য আরামের বিছানাটা ছেড়ে ওঠা, উঠে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওযু করে মসজিদে যেতে কষ্ট হয় কি না? অনেকসময় এমনিতেও মন চায় না। গতকাল ইশার নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করলাম, কিন্তু আজকে আর মন চাচ্ছে না। তো এই যে কষ্ট বা মন না চাওয়া, সেটার ওপর নিজে জয়ী হওয়া এবং আজকের ইশার নামাযও মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে আদায় করা। মোটকথা, জোর করে যে নেক

আমলটা করা হয়, কষ্টের পরেও করা হয়, এটার নামও সবর।

যে নেককাজ আমার ওপর ফরয ও অবশ্যপালনীয়, সেই নেক কাজ করতে গিয়ে ধৈর্যহারা হলে চলবে না; আমাকে আমলটা করতেই হবে। বিশেষত ফরয-ওয়াজিব কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না। সুন্নতে মুআক্কাদা, যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক তাগিদ করেছেন, সেটাও আদায় করব। হাঁ, মুস্তাহাব-নফলের মাঝে ছাড় আছে। কিন্তু কথা হল, কোনো নেককাজের মহব্বত যদি একবার অন্তরে বসে সেটা কি আর কখনো ছোটে? আমাদের যেসব সাথীরা তিন দিনের, দশ দিনের মজা পেয়ে গেছেন, তাদেরকে কি কেউ নাম লেখানোর জন্য হাতে-পায়ে ধরতে হয়, নাকি নিজের থেকেই নাম লেখায়?

সবরের তৃতীয় প্রকার

আরেক সবর হল গোনাহ থেকে বাঁচা। গোনাহ করতে মন চাইলেও ধৈর্য ধরে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। ভুলে একবার হয়ে গেলে বারবার তওবা করতে থাকব। এতে শয়তান ভয় পাবে। শয়তান ভাববে, এই লোককে গোনাহ করিয়ে লাভ কী? একবার গোনাহ করালে সে তো শত বার তওবা করে! হিসাব-নিকাশ করে শয়তান দেখবে, তার লস ও ক্ষতি হচ্ছে। তাই পরে দেখবেন, সে আর বেশি আসছে না।

তাহলে সবরের তিন প্রকার গেল। বালা-মসিবতে সবর করা। ধৈর্য ধরে নেক কাজ করতে থাকা। ধৈর্য ধরে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

সবরের চতুর্থ প্রকার

সবরের আরেক প্রকার হল, যে কোনো নেককাজকে ভালো থেকে ভালো করার চেষ্টা করা। অনেক ভাই আছেন, নামাযে রুকু-সেজদা ঠিকমতো আদায় করেন না। রুকুতে এই যেতে না যেতেই উঠে যান। রুকু তো এমন জিনিসের নাম নয়।

দেখুন, নামাযে যত আমল রয়েছে, এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কাজ। আপনি হয়ত মনে করছেন, কোনোটা মূল কাজ আর কোনোটা ভায়া। যেমন আসল হল দুই রাকাত পড়া আর দাঁড়ানো ওঠানামা হল ভায়া। সেজদা হল আসল, **রুকুতে যাওয়া-আসা হল তার জন্য ভায়া।** না, বিষয়টা এমন নয় ভাই! বরং **রুকু স্বতন্ত্র আমল এবং নামাযের ফরয আমল।** রুকুতে গিয়ে উভয়

হাত ও হাঁটু সোজা রাখতে হবে। কোমর, পিঠ ও মাথা এক বরাবর রাখতে হবে। সামনে-পিছে কোনো দিকে ঝুঁকানো যাবে না। কারো যদি কোমরে বা পায়ে ব্যথা থাকে সেটা ভিন্ন কথা।

তা ছাড়া রুকুতে গিয়ে আমাকে স্থির থাকতে হবে। রুকুতে গিয়ে যদি এমন ভাব হয় যে, কখন যে উঠব, কখন যে উঠব, ইমাম মাথা ওঠাচ্ছে না কেন? তাহলে এতে রুকুর হক আদায় হবে না। রুকুতে গিয়ে ধীরস্থিরভাবে কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়ুন। রুকুতে স্থির হয়ে থাকা ওয়াজিব। মনে রাখা উচিত, রুকু নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আমি রুকুর সেই ফরযটা আদায় করছি।

আর যদি বলেন– হুজুর, আমি যতই চেষ্টা করি, তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পড়তে আমার বেশি সময় লাগে না, তাহলে আপনাকে আমি বলব, আপনি পাঁচবার পড়ুন, সাতবার পড়ুন! তারপরও আপনি স্থির হয়ে থাকুন। কারণ রুকু নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আমি সেটা আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে যেভাবে তাঁর সামনে ঝুঁকতে বলেছেন সেভাবে ঝুঁকে আছি আমি।

রুকু থেকে ওঠার পর কওমা করতে হবে শান্তশিষ্টভাবে। কওমা স্বতন্ত্র একটি কাজ এবং নামাযের একটি অংশ। কওমার সময় দাঁড়িয়ে বলুন– 'রাব্বানা লাকাল হামদ'। কোনোভাবেই তাড়াতাড়ি করা যাবে না। যদি এমন হয় যে, দুআটা পড়তে আপনার সময় লাগে না, তাহলেও আপনি সেজদার দিকে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবেন না, বরং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। কারণ এই 'কওমা'ও একটি স্বতন্ত্র আমল এবং নামাযের একটি আমল। তাই তাড়াহুড়ো না করে আমাকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে।

'রাব্বানা লাকাল হামদ'-এর চেয়ে আরো লম্বা দুআও পড়তে পারি–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

বা পড়তে পারি–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

এর চেয়েও লম্বা একটি দুআ আছে। আমরা বলছি না যে, আপনাকে পুরোটাই পড়তে হবে; ছোটটাই পড়ুন 'রাব্বানা লাকাল হামদ' অথবা একটা 'ওয়াও'সহ যে দুআটা আছে তা পড়ুন। একটা 'ওয়াও'-এর কারণে সওয়াব অনেক বেড়ে যাবে।

অনেকে রুকু থেকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে এই দুআ পড়ে। এমনটি করব না। পুরো সোজা হয়ে দাঁড়াব, একদম স্থির হয়ে তারপর দুআ পড়ব।

আবার অনেককে দেখা যায়, সেজদায় যেতে না যেতেই উঠে যায়। অথচ সেজদার নিয়ম হল, সেজদার সময় সাতটি অঙ্গ জমিনে লাগতে হবে। বিশেষ করে কপাল আর নাক তো জমিনে লাগতেই হবে। যদি এই দুটো অঙ্গ জমিনে না লাগে, তাহলে সেজদাই সহীহ হবে না। দুই পায়ের পাতা, দুই হাঁটু, দুই হাতের পাঞ্জা এবং নাক-কপাল জমিনে লেগে থাকতে হবে স্থিরভাবে।

অনেকে আবার সেজদার সময় কপাল জমিনে লাগায় ঠিকই, কিন্তু নাক জমিন থেকে আলাদা রাখে। আবার কিছু মানুষ সেজদায় এক পা আরেক পায়ের ওপর উঠিয়ে খেলা করে, যেন তিনি চেয়ারে বসেছেন! অথচ উভয় পায়ের পাতা জমিনের সঙ্গে লেগে থাকা উচিত। চেষ্টা করা– যেন উভয় পায়ের পাঁচ আঙুলই জমিনে লেগে থাকে। তা যদি না পারি, কমপক্ষে দুই আঙুল বা তিন আঙুল যা পারি সেটাই করি।

আচ্ছা, পুরুষ আর মহিলার নামাযের মধ্যে পার্থক্য আছে না? আছে। কিন্তু আমরা অনেক সময় এমনভাবে সেজদায় যাই যে, রান আর পেট একসঙ্গে মিলে থাকে। হাতের বাহুগুলোকে শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে রাখি। অথচ পুরুষের সেজদার ব্যাপারে বলা হয়, এমনভাবে সেজদা করবে, যাতে হাতের নিচ দিয়ে বকরির বাচ্চা স্বাভাবিকভাবে চলে যেতে পারে। হাঁ, কারো ওজর থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু অনেকের হাবভাবে মনে হয়, নামায বুঝি বিশ্রাম করার জন্য!

তারপর সেজদায় গিয়ে আমাকে কমপক্ষে তিনবার সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়তে হবে– 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'। আর সেজদাতেও ধীরস্থির ও শান্তভাবে থাকা ওয়াজিব। এরপর দুই সেজদার মাঝখানে বসতে হয়। কিন্তু অনেককে দেখে মনে হয়, তিনি বসতেই রাজি নয়। এক সেজদা থেকে না উঠতেই আরেক সেজদায় রওনা হয়ে যান! এটা করলে ওয়াজিব লঙ্ঘন করা হয়। এখানেও দুআ আছে। আপনি পড়তে পারেন– 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী' বা 'রাব্বিগ ফিরলী'। কয়েকবারও পড়তে পারি।

কিন্তু আমাদের ধারণা হল, নামাযের মধ্যে যেখানে যেটা পড়তে হয়, সেটা যদি আমি একবার পড়ে ফেলি, তাহলে সেখানে আর কাজ নেই। আরে, দুই সেজদার মাঝে বসে থাকাটাই একটা কাজ। আপনি যদি 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী' বা 'রাব্বিগ ফিরলী' নাও পড়েন, শুধু স্থির হয়ে বসে থাকেন, সেটাও একটা

আমল। কারণ এর দ্বারা জলসার ওয়াজিব আদায় হবে। এর কারণেও আপনি সওয়াব পাবেন। যারা দুই সেজদার মাঝখানে ঠিকমতো বসেন না, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন– তারা কি দুই সেজদা করছে, নাকি এক সেজদা?

এজন্য বললাম, সবরের চার নম্বর প্রকার হল, সকল ইবাদত সুন্দরভাবে এবং যথাযথভাবে করা। কিন্তু আমরা অনেকে ইবাদত করি বটে, কিন্তু মনোযোগটা ঠিকমতো থাকে না। ইমাম সাহেব যখন কেরাত পড়েন, তখন অপেক্ষায় থাকি– কখন যে রুকুতে যাবে! আর যখন একা একা নামায পড়ি তখন তো কথাই নেই। সব নিজের ইচ্ছা! যত ছোট্ট থেকে ছোট্ট সূরা পড়ে শেষ করা যায়। আর রুকুতে গিয়ে কখনো তিনবারের বেশি পড়ি না। অথচ পাঁচবার, সাতবারও পড়া যায়। আরে ভাই, মাঝে মাঝে সাতবার, নয়বার পড়ুন না! কে আপনাকে নিষেধ করবে?

এর পরের কথা হল, নামাযে যা পড়া হয়, সেগুলো সহীহ-শুদ্ধ হওয়াও জরুরি। তার জন্য আমাদেরকে মশক করতে হবে। এরপর আমরা যে দুআয়ে মা'সূরা পড়ি, এরকম দুআয়ে মা'সূরা কয়টা? দুআয়ে মা'সূরা অর্থ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দুআ। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দুআ এক-দুইটা নয়; শত শত। কিন্তু আমরা যেহেতু এত শত দুআ মুখস্থ করতে পারব না, তাই আমাদের মা-বাবা আমাদেরকে ছোটবেলায় একটা মুখস্থ করিয়ে দিয়েছেন। সেটা হল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

কিন্তু আমরা মনে করি, দুআয়ে মা'সূরা কেবল একটাই!

আমার কথা হল, আপনাকে সব পড়তে হবে না, একটাই পড়ুন, কিন্তু যেটাই পড়ুন, সহীহ-শুদ্ধ ও ধীরস্থিরভাবে পড়তে হবে। সহীহ-শুদ্ধ পড়ার জন্য আগে মাখরাজ ও উচ্চারণ শিখতে হবে। শুধু উচ্চারণ শিখলেই হবে, নাকি অর্থ ও মর্মও শিখতে হবে?

দুআয়ে মা'সূরার অর্থ

নামাযের শেষে আমরা যে দুআয়ে মা'সূরা পড়ি, তার কী অর্থ? اَللّٰهُمَّ হে আল্লাহ! إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا। আমি তো নিজের প্রতি অনেক জুলুম-অবিচার করে ফেলেছি।

কত গোনাহ, কত পাপ করেছি! কারণ একটা ফরয লঙ্ঘন করা এক জুলুম

নয়, অনেকগুলো জুলুম। একটা গোনাহে জড়িত হওয়া একটা জুলুম নয়, অনেক জুলুম।

وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

ক্ষমা একমাত্র আপনিই করতে পারেন। আপনি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না।

নাফরমানি করা হয়েছে আপনার, ক্ষমাও একমাত্র আপনিই করতে পারেন। আপনি ছাড়া আর কেউ পারে না ক্ষমা করতে। তা ছাড়া আপনিই যেহেতু একমাত্র মাবুদ ও মালিক, তাই আপনিই পারেন ক্ষমা করতে। আর কেউ পারে না।

فَاغْفِرْ لِيْ.

আল্লাহ! কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ.

আপনার কাছে যে ক্ষমা চাচ্ছি, এটা আমার প্রাপ্য বা অধিকার নয়, এটা আপনার পক্ষ থেকে দয়া ও মেহেরবানি। কারণ আমি তো পাপ করে আপনার আরো দূরে সরে গিয়েছি। তাই আপনার কাছে আমার কোনো পাওনা বা দাবি-দাওয়া নেই; বরং আপনার দয়া আর মেহেরবানিতে আপনার পক্ষ থেকে আপনি আমাকে মাগফেরাত দান করুন। আপনার দানের ভাণ্ডার থেকে আমাকে দান করুন মাওলা!

দেখুন, কেমন মর্মস্পর্শী দুআ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন!

আল্লাহ তাআলার কাছে এভাবে বল, এভাবে কাঁদ! নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজিরা দিয়েছ, এতক্ষণ আল্লাহর বিশেষ দরবারে ছিলে। এখন দরবারের আলাপ-সালাপ, কথাবার্তা শেষ। তোমার হাজিরা যদি কবুল হয়ে থাকে, তাহলে এখন হাজিরা শেষে আল্লাহর কাছে কী চাইবে, চাও! কেমন যেন আল্লাহ বলছেন, আমার দরবারে তো এসেছ, আচ্ছা, এখন যা চাওয়ার চেয়ে নাও! ফলে ওই সময় কত সুন্দর করে আল্লাহর কাছে আমরা চাইতে পারি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। কত **সুন্দর দুআ আমাদের শিখিয়েছেন–**

فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ.

আল্লাহ, ক্ষমা আপনার দান, আপনি মেহেরবানি করে ক্ষমা করে দিন!

وَارْحَمْنِيْ.

শুধু মাগফেরাত নয়, আমার প্রতি আপনি রহমতও বর্ষণ করুন। আমার প্রতি দয়া করুন।

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

আপনি গফুর! আপনার 'গফুর' নামের বরকতে আমাকে মাগফেরাত দান করুন। আপনি রাহীম! আপনার 'রাহীম' নামের বরকতে আপনি আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

এসব বলার পর এবার বলুন– 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহ!'

এটা হল এক ধরনের নামায। আর যদি এমন হয় যে, নামায শুরু করলাম, শেষ করলাম, কোন দিকে মন, কোথায় আমার খেয়াল, সেটার কোনো গুরুত্ব নেই, তাহলে কেমন হবে?

নামাযের সওয়াবে পার্থক্য হয় কীভাবে

একই কাতারে নামায পড়ছি, কার নামাযের কী অবস্থা, আল্লাহ তাআলার কাছে তো সবকিছুরই হিসাব আছে। যদি মার্ক বা নম্বর দেওয়া হয়, যদি মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে অনেক পার্থক্য হয়ে যাবে। পার্থক্য হয় কীভাবে?

পার্থক্য হয় খুশু-খুযুর মাধ্যমে। পার্থক্য হয় সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমে। নামাযটা কতটুকু খুশু-খুযুর মানে উত্তীর্ণ, নামাযের মধ্যে আমার দিলটা কী পরিমাণ হাজির ছিল, সেই হিসাবে মূল্যায়ন ও পার্থক্য হবে। আর এই খুশু-খুযুর জন্য নামাযে যা পড়া হয়, সেগুলোর সহীহ-শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে হবে এবং মর্মও ঠিকভাবে বুঝতে হবে এবং পুরো নামায সুন্নত মোতাবেক হতে হবে।

এই দুটি বিষয় যদি আজকের মজলিস থেকে আমরা নিতে পারি, তাহলে ইনশা-আল্লাহ আমরা সফল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভরপুর তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[মাসিক দ্বীনী মাহফিল
১ নভেম্বর ২০২১ ঈ.
[জানুয়ারি ২০২২ ঈ.]

ব
য়া
ন

ঈমানী শক্তি ও নিয়তের শক্তি কাজে লাগিয়ে মুজাহাদার পথে অগ্রসর হই

মাসনূন খুতবার পর। প্রথমে একটা কথা বলি, যে কোনো দ্বীনী কাজ নিয়মিত করার অনেক গুরুত্ব। এটি কোনো ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে খাস বা নির্ধারিত নয়। ঢাকা আজিমপুরের ১৩৬ নম্বর বাড়িতে সাপ্তাহিক একটা মাহফিল হত। আমি সেখানে নিয়মিত যেতাম। রমযান ছাড়া অন্য সময় মাহফিল হত প্রতি শনিবারে আর রমযানে হত জুমাবার সকালে জুমার আগে। কোনো ওজরের কারণে রমযানের এক জুমায় আমি যেতে পারিনি। সেদিন ঘোষণা হয়েছিল, আগামী জুমার দিন যেহেতু (৩০ রমযান) সম্ভাব্য ঈদের দিন, সেদিন মাহফিল হবে না। কিন্তু আমি এটা জানতাম না, আমি চলে গিয়েছি। গিয়ে তো কাউকে পাচ্ছি না। সব বন্ধ। বেশ সময় ধরে অপেক্ষা করেছি। আমার মতো আরো এক-দুজনও এসেছেন। আমরা সেখানে অপেক্ষা করছিলাম। তখন সেই মুরুব্বী, যার উদ্দেশ্যে আমরা যেতাম, হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব (প্রফেসর হলেও তিনি আলেম-উলামা ও বুযুর্গদের সোহবতপ্রাপ্ত মুরুব্বী) বললেন, তোমরা যে কয়জন এসেছ, একজন কিতাব থেকে পড়, অন্যরা শোন! শুধু একজন থাকলে সে নিজে একা একাই পড়বে। কিছুক্ষণ পড়ে মুনাজাত করে চলে যাবে। ব্যস, হয়ে গেছে।

প্রতি সোমবারে মাহফিলের জন্য বড় আয়োজন হয়, অনেক লোকজন আসে, অনেক হুজুর বয়ান করেন। কিন্তু এসব না হলে যে মাহফিল হবে না, এমন কথা নয়। তাই আমরা যে কয়জনই এখানে আসি, বসে যেতে পারি। ওই মসজিদে বসি আর এই মসজিদে বসি, মাঠে বসি আর বারান্দায়, এক জায়গায় বসে আমল শুরু করলেই হয়ে যায়। দু-চার কথা আলোচনা হল। যেগুলোর তালীম এখানে হয়, সেগুলো না পারলেও ফাযায়েলে আমলের তালীম করি! আর যদি এমন হয়, তালীমের জন্য কোনো কিতাবও খুঁজে পাওয়া গেল না, তাহলে নিজেরা বসে দুআ-যিকির করি, দরূদ শরীফ পড়ি। হুজুরদের কাছে যা শুনেছি, শিখেছি, সেগুলো থেকে কিছু নিজেরা আলোচনা করি। মাদরাসা ছুটি চলছে মনে করে চলে যাওয়া– এটা কোনোভাবেই উচিত নয়। অন্তত জিজ্ঞেস করে তো যেতে হবে। জিজ্ঞেস করা ছাড়া চলে যাওয়া বা

জিজ্ঞেস করে উত্তর পাওয়ার আগে চলে যাওয়া বা জিজ্ঞেস করেছি এবং বুঝেছি, আজকের মাহফিল তেমন জমবে না, ফলে চলে গেলাম– এটা ঠিক নয়। কারণ মাহফিলের জন্য অনেক বড় মজলিস হতে হয় না, অনেক বক্তা হতে হয় না এবং অনেকক্ষণ বয়ান করতেও হয় না।

এই যে, আজকের মজলিস তো হয়ে গেল। আমরা বসলাম, কিছু কথা হল, এটাও দ্বীনের কথা। এমন যেন আমাদের কখনো না হয়, মাহফিলের তারিখে এলাম না কিংবা এলাম, কিন্তু আয়োজন না দেখে চলে গেলাম। না, মাহফিলের জন্য আয়োজন শর্ত নয়। প্যান্ডেল লাগানো, মাইক লাগানো, অনেক শ্রোতা হওয়া, অনেক বক্তা হওয়া– কিছুই শর্ত নয়। মাহফিল মানে দ্বীনী মুযাকারা। এমনকি একজনও যদি আসে এবং মাহফিল শোনার জন্য নিয়ত করে আসে, এসে কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করে, যিকির করে, এরপর চলে যায়, ব্যস, এটাও মাহফিল।

এই মাহফিলের নেযাম কী? আসরের পরে তালীম হয়। মাগরিবের পরে মশক হয়। তারপর বয়ান হয়। প্রশ্নোত্তর হয় এবং দুআ হয়। মাহফিলের এ পাঁচটা পর্ব। এই সবই আজকে হবে ইনশা-আল্লাহ।

('ইসলাহী মাজালিস' থেকে তালীম হয়েছে এবং হুজুর ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। বলেছেন–)

মাথায় বিভিন্ন চিন্তা, বিক্ষিপ্ত দুশ্চিন্তা ও খারাপ চিন্তা আসে। চিন্তা আসামাত্রই আমাদের উচিত, কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া। চিন্তা দূর করার জন্য পেরেশান হওয়া বেকার ও বেহুদা কাজ। এর কোনো ফায়েদা নেই। উচিত হল, সঙ্গে সঙ্গে কোনো আমলে লেগে যাওয়া। ওযু করে দুই রাকাত নামায পড়া বা কুরআম মাজীদ তেলাওয়াত শুরু করা বা কোনো মুরুব্বী, যেমন নিজের আম্মা-আব্বার কাছে গিয়ে বসে থাকা! উস্তাযের কাছে গিয়ে বসে থাকা! ব্যস। অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ হোক আর দ্বীনের কাজ হোক, কোনো না কোনো কাজে লেগে যাওয়া। এভাবে নিজেকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখলে দুশ্চিন্তা, ওয়াসওয়াসা, কুমন্ত্রণা, খারাপ চিন্তা, সবই দূর হতে থাকবে ইনশা-আল্লাহ। বেকার থাকলেই ক্ষতি। ব্যস, আজকের তালীম হয়ে গেল!

(তারপর কিছুক্ষণ কুরআনে কারীমের **মশক হয়েছে। এরপর বয়ানে হুজুর** বলেন–) কুরআন মাজীদে আল্লাহ **তাআলা বলেন–**

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহাদা করে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ পথে পরিচালিত করেন। –সূরা আনকাবুত (২৯) : ৬৯

মুজাহাদা করলে অনেক ফায়েদা। দ্বীনের ওপর চলাও সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ধরে ধরে দ্বীনের ওপর চালান।

কাকে বলে মুজাহাদা?

মুজাহাদা হল নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে চলা। নফস ও শয়তানের কথা না শোনা। নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে দূরে থাকা।

প্রত্যেক বদ-অভ্যাস দূর করার জন্যই মুজাহাদার প্রয়োজন। একজনের বদ-অভ্যাস শুধু মোবাইল টেপে। বেহুদা ও অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করতে থাকে। কারো বদ-অভ্যাস গীবত করা। এভাবে একেকজনের একেক বদ-অভ্যাস। যতজনের যত বদ-অভ্যাস, সব দূর করার জন্য মুজাহাদার প্রয়োজন হয়।

কীভাবে বদ-অভ্যাস দূর হবে?

বদ-অভ্যাস দূর করার জন্য নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। ঈমানী শক্তি ও প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে হবে। প্রতিরোধ বলতে নফস ও শয়তানের আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি। আরেক লাগবে নিয়তের শক্তি। আসলে ঈমানী শক্তি আর নিয়তের শক্তির সমন্বয়েই তৈরি হয় প্রতিরোধ-শক্তি। বদ-অভ্যাস দূর করার জন্য যে প্রতিরোধ-শক্তি দরকার, নফস ও শয়তানের বিরোধিতার জন্য যে প্রতিরোধ-শক্তির প্রয়োজন, সেটি অর্জিত হয় ঈমানী শক্তি এবং নিয়তের শক্তির মাধ্যমে। এই দুই শক্তির যত ব্যবহার হবে, ততই বদ-অভ্যাস দূর করা সহজ হবে, ততই নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সহজ হবে। কিন্তু যদি এই দুই শক্তিকে ব্যবহার না করি, বরং নিজে হার মানতে থাকি, তাহলে কখনোই নফসের বিরোধিতা করা সম্ভব হবে না। শয়তানের বিরোধিতা করা সম্ভব হবে না। হালকা থেকে হালকা কোনো বদ-অভ্যাসও দূর করা সম্ভব হবে না। কথার কথা, একজন জর্দা খায়, জর্দা ছাড়া তার পান চলে না। ডাক্তার কাউকে ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং এড়িয়ে যেতে বলেছেন। তার মিষ্টি খাওয়ার আদত। ডাক্তার বলেছেন, মিষ্টি খেতে পারবে না। তাহলে কীভাবে সে মিষ্টি খাওয়া ছাড়বে? কীভাবে জর্দা ছাড়বে? এগুলোর কোনো কোনোটি সরাসরি বদ-অভ্যাস নয়, বরং ডাক্তারের পরামর্শে সাময়িক বিরত থাকতে হবে। আর

জর্দার তো এমনিতেই ক্ষতি আছে। তা ছাড়া জর্দা একেবারে কোনো ধরনের মাকরূহ বা অনুত্তম পর্যায়েও যে যায় না–এমনটা বলা মুশকিল।

যাহোক, ডাক্তার যখন নিষেধ করেছেন, ছাড়তে হবে আপনাকে অথবা পানের পাতা খেতে পারবেন, চুন-সুপারি খেতে পারবেন না। কী করবেন তখন? এগুলো ছাড়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই মুজাহাদা করতে হবে। সহজে ছাড়া যাবে না।

একজন বলেছিল, পান ছাড়া অনেক কঠিন! পান ছাড়া যায় না! আরেকজন বলে উঠল, 'কে বলেছে ছাড়া কঠিন? আমি ত্রিশবার ছেড়েছি'!

কত সহজ যে, তিনি ছাড়েন আবার শুরু করেন। এমনকি ত্রিশবার ছেড়েছেন!

তো ত্রিশবার ছাড়লেন অথচ ছাড়তে পারলেন না! কিন্তু যেদিন আপনি নিয়তের শক্তি প্রয়োগ করবেন, পাকা নিয়ত করবেন যে 'আমি খাব না! খাব না বলেছি, খাব না, ইনশা-আল্লাহ! যা হওয়ার হোক, আমি আর খাবই না; সেদিন থেকে আপনার এই অভ্যাস দূর হতে থাকবে ইনশা-আল্লাহ। এভাবে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হয়। এটা হল নিয়তের শক্তি। এটাকে আরবীতে বলা হয় আয্‌ম বিল জায্‌ম (عزم بالجزم) পাকাপোক্ত ইচ্ছা, আবার সঙ্গে দৃঢ় মনোবল। এমন পাকা নিয়ত এবং এমন মজবুত হিম্মত খুব দরকার। আল্লাহর এক ওলী নিজ মুনাজাতে এই সিফাতটিই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন–

تلون مزاجی مری ختم کر

مرے عزم کو تو عطا جزم کر

এটি মূলত হাদীস শরীফে শেখানো দুআ থেকে নেওয়া–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ.

–জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪০৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯৩৫

যাহোক, যে কোনো বদ-অভ্যাস ছাড়ার জন্য নিয়তের শক্তি আর ঈমানী শক্তি ব্যবহার করে মানুষকে মুজাহাদা করতে হয় নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে। আর যে কোনো অভ্যাস পরিবর্তন করার জন্যই মানুষকে প্রথমে যেটা করতে হয় সেটা হল নিয়ত বা ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগানো। বদ-অভ্যাসের জন্য তো লাগেই, বৈধ কোনো অভ্যাস পরিবর্তনের জন্যও নিয়তের শক্তির প্রয়োজন। মানুষের জিন্দেগি চলার জন্য অভ্যাসের দাস হয়ে থাকা ভালো লক্ষণ নয়। আপনি যদি শান্তির জিন্দেগি চান, তবে নিজেকে কখনোই অভ্যাসের দাস বানাবেন না। অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণে না রেখে বরং যদি অভ্যাসের দাস বনে

যান, তাহলে বিপদ আছে। বৈধ অভ্যাসের কথা বলছি! সেক্ষেত্রেও নিজেকে কখনো ওই বৈধ অভ্যাসের দাস বানানো যাবে না। যেমন দৈনিক নাস্তা খাওয়ার অভ্যাস। এটা একটা বৈধ অভ্যাস। একদিক থেকে ভালোও। কিন্তু এমন হওয়া যাবে না যে, কোনোদিন হঠাৎ বাসায় নাস্তার ব্যবস্থা হল না, আপনিও জানেন না। আবার আপনি নিজের নাস্তা নিজে ব্যবস্থা করতেও পারেন না। তাহলে কী উপায় হবে? ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছেন। না অফিসে যেতে পারলেন, না কাজ করতে পারলেন। ভেতরে গিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, নাস্তা কই! জবাব আসল, সন্তানরা সবাই অসুস্থ, নাস্তা বানাতে পারেনি। আর আপনি নিজেও পারেন না ঘরের নাস্তা বানাতে বা নিজের নাস্তা বানাতে! কিন্তু আপনার যদি অভ্যাসই এমন হয় যে, নাস্তা করলে 'আলহামদু লিল্লাহ', না করলেও খুব মসিবত বা ঝামেলার কিছু নয়, তাহলে আপনার জন্য চলা সহজ হবে। কাজেই নিজেকে কখনো অভ্যাসের দাস বানাতে নেই।

আপনার যদি এই অভ্যাস হয় যে, প্রতিদিন একেবারে শ্যাম্পু মাথায় দিয়ে গোসল করেন, তাহলে একদিন কোথাও সফর করেছেন, পথে যানজটের কারণে ঠিক সময় বাড়িতে পৌঁছাতে পারেননি, গোসলও করতে পারেননি বা দৈনিক দুইবার গোসল করার অভ্যাস, আজকে একবারও পারলেন না। সাবান দিয়ে গোসল করতেন, আজকে সাবান নেই, এমনকি পানিও নেই, তাহলে কী অবস্থা হবে আপনার! জ্যামের মসিবত ও গরম, সঙ্গে তৃতীয় মসিবত যুক্ত হল কি না? কিন্তু আপনি যদি অভ্যাসের দাস না হন, তাহলে তৃতীয় মসিবত আর আসবে না।

কাজেই মাঝে মাঝে এমন করুন, আজকে গোসল করব না! বা আজকে শুধু পানি ঢালব শরীরে, সাবান লাগাব না। মানুষ অনেক সময় বৈধ কাজের মধ্যে নিজেকে এমনভাবে অভ্যাসের দাস বানায় যে, সেটা না হলেই মাথাব্যথা হয়ে যায়, একটু ব্যতিক্রম হলেই আর বরদাশত হয় না, সহ্য করতে পারে না, তাহলে সে দুনিয়ারও কোনো বড় ভালো কাজ করতে পারবে না, দ্বীনেরও বড় কোনো ভালো কাজ করতে পারবে না।

এজন্য কেউ যদি নিয়ত ও ইচ্ছাশক্তি সঞ্চয় করতে চায়, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করার মতো যোগ্যতা যদি অর্জন করতে চায়, তাকে অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। নিজেকে বৈধ অভ্যাসেরও দাস বানানো যাবে না। আর বদ-অভ্যাস এমনিতেই ছাড়তে হবে। তার দাস হওয়া তো দূরের কথা, সেটা এমনিতেই ত্যাগ করতে হবে।

যে লোক বৈধ বিষয়েও নিজেকে অভ্যাসের দাস বানায় না, তার জন্য বদ-অভ্যাস পরিত্যাগ করা সহজ। কারণ তার চর্চা ও অনুশীলন আছে। সে প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়িয়েছে। ফলে তার জন্য যে কোনো বদ-অভ্যাসের মোকাবেলা করা সহজ। এজন্য আমাদের বুযুর্গগণ বলেন, যে বৈধ কাজ তোমার করতে মন চাচ্ছে, করার সুযোগও আছে, সেখানে তুমি একটু ব্রেক লাগাও!

খুব ক্ষুধা লেগেছে। দস্তরখান সামনে আসামাত্রই খাওয়া শুরু করব, এমন অবস্থা, এই সময়ও একটু সংযত হও!

এই যে এখানে পড়ার জন্য কিছু বই রাখা বা অন্য কোথাও আছে। জেনারেলদের জন্য জেনারেল বই, আমাদের জন্য দ্বীনী ইলমী বই। আমি হয়ত একটা বিষয় দীর্ঘদিন থেকে খুঁজছিলাম। হঠাৎ সেই বিষয়ের বই এখানে দেখতে পাচ্ছি। দেখেই স্বভাবগতভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ার কথা! কিন্তু আমি যদি পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধা ঘণ্টা নিজেকে স্থির রাখতে পারি, এটা একটা অনুশীলন হবে। এভাবে করতে পারলে আমার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রতিরোধ-ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ-শক্তি বাড়তে থাকবে। এই যে পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধা ঘণ্টা সবর করে থাকলাম, এর পরে ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে কিতাব হাতে নিলাম, পৃষ্ঠা উল্টালাম, আস্তে আস্তে পড়লাম। বরং হাতে নিয়েও কতক্ষণ বসে থাকলাম, তারপর খুললাম। এভাবে নিজের মধ্যে অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। মানে একদিকে মনের আকর্ষণ, অপরদিকে বিষয়টা যদি তাৎক্ষণিক পালন করার মতো কোনো বিষয় না হয়, তাহলে হুমড়ি খেয়ে না পড়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।

ঠিক এভাবে বদ-অভ্যাসও দূর করতে হবে। কারো সিগারেটের বদ-অভ্যাস। দৈনিক কয়েকটা খেতে হয়। তো এই লোক যখন নিজের চাহিদার মোকাবেলা করার কিছু অনুশীলন করবে তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। কীভাবে করবে? সেটারও উপায় আছে। যেমন, প্রতিদিন আটটা বাজে খেত, আজকে নয়টা বাজে শুধু একটা খেয়েছে। তাহলে এই লোক যে আজকে এক ঘণ্টা দেরি করল, এটা তার একটা অনুশীলন। আগামী দিন দুই ঘণ্টা দেরি করে দশটা বাজাল। এর পরের দিন তিন ঘণ্টা পরে। কিছুদিন পর অর্ধেকটা করে খেল। এভাবে কিছুদিন গেল। এরপর কোনো দিন খায় আবার কোনোদিন খায় না। তারপর একদিন পাকা নিয়ত করল, এখন থেকে আর সিগারেট খাব না ইনশা-আল্লাহ। এই পাকা নিয়তটাই শক্তি। এই শক্তি যেদিন সে প্রয়োগ

করবে সেদিন থেকে তার সিগারেটের বদ-অভ্যাস দূর হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

জায়েয কাজগুলোর মধ্যেও নিজের পছন্দের বিষয়গুলোতে সাড়া দিতে দেরি করা। ইবাদত-বন্দেগির কথা ভিন্ন। ইবাদত-বন্দেগিতে এমন অভ্যস্ত হওয়া উচিত যে, ছাড়লে মাথাব্যথা হয়। ইবাদতের এমন অভ্যাস আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন যে, একেবারে নিয়মিত করা হয়, কোনোদিন ছাড়ে না। ফরয-ওয়াজিব তো নয়ই; নফলও কম হোক আর বেশি, নিয়মিত করে যাওয়া। বিশেষ ওজর ছাড়া বাদ না দেওয়া।

এ ছাড়া জাগতিক বিষয়ে আপনার কোনো বৈধ অভ্যাস থাকলে নিজের সেই অভ্যাসকে দু'রকম বানিয়ে দেবেন। এটাও করা যায়, ওটাও করা যায়। কোনোটাতে আটকে পড়ে থাকবেন না। এতে আপনার জিন্দেগি চলা সহজ হবে। আরেকটি বড় সুবিধা হল, যে কোনো বদ-অভ্যাসের মোকাবেলা করা সহজ হবে। যেহেতু আপনি বৈধ অভ্যাসের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দটাকে গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত হন না, তাই কোনো বদ-অভ্যাসের পরিস্থিতি সামনে এলে তা থেকে আরো সহজে বেঁচে থাকতে পারবেন। কারণ এখানে বাড়তি সুবিধা হল আপনি জানেন বিষয়টা খারাপ। ফলে এই খারাপ অভ্যাস ছাড়া আপনার জন্য সহজ হবে।

ব্যস, অনেক কথা হয়ে গেল। সারকথা হল বদ-অভ্যাস ছাড়ার জন্য বৈধ অভ্যাসেরও দাস হওয়া যাবে না। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে এমন অভ্যাসে পরিণত হওয়া যাবে না, যেটা না হলে একেবারে পেরেশান হতে হয়। অভ্যাস হয়ে গেলে তার বিপরীত অনুশীলন করে করে হালকা বানাতে হবে। করলেও ক্ষতি নেই, না করলেও কষ্ট নেই।

আর পছন্দের কোনো বৈধ জিনিস পেলেই তা গ্রহণ করার জন্য হুড়োহুড়ি না করে একটু দেরি করা। একটু সবর করা ও সংযত হওয়া। এভাবে একটু দেরি করে গ্রহণ করলে আপনার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ-শক্তি বাড়বে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অন্য অনেক কাজ আপনি করতে পারবেন।

বদ-অভ্যাস একটু একটু করে কমাতে থাকুন। দেখা যাবে, কাজটা সামনের দিনগুলোতে কোনো দিন হবে, কোনো দিন হবে না। আর হলেও একবারের বেশি হবে না। এভাবে করতে করতে একপর্যায়ে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ-শক্তি যখন আরো বৃদ্ধি পাবে, একদিন আপনি একেবারে 'নাওয়াইতু...'– আল্লাহ, আমি পাকা নিয়ত করলাম, বলতে পারবেন। যেমন নামাযের নিয়ত করা হয়।

মানুষ নামাযের নিয়ত করলে নামায শেষ না করে নিয়ত ছাড়ে না। তেমনিভাবে এমন নিয়ত করা যে, জীবনভর এই কাজ আমি আর করব না। ব্যস, এটা জিন্দেগির নিয়ত। নিয়তের শক্তি আর ঈমানের শক্তির সমন্বয় যতদিন আমরা করব না, ততদিন নফসের বিরোধিতা করা, শয়তানের বিরোধিতা করা এবং বদ-অভ্যাস ত্যাগ করা সম্ভব হবে না। নিয়তের শক্তি ও ঈমানের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নফস ও শয়তানের বিরোধিতা করা, বদ-অভ্যাস ছাড়ার জন্য নিজের নফস ও শয়তানের মোকাবেলা করার নামই হল মুজাহাদা। এই মুজাহাদা যে যে পরিমাণে করবে, সেই পরিমাণে সে সুফল পাবে। মুজাহাদা যদি করতে থাকে, একসময় পুরো দ্বীনের ওপর চলা তার জন্য সহজ হবে। কারণ আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য সে পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

'যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।' –সূরা আনকাবূত (২৯) : ৬৯

নিয়তের শক্তি আল্লাহর বড় দান। শর্ত হল এটাকে জাগ্রত করে ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

[মাসিক দ্বীনী মাহফিল
মারকাযুদ দাওয়াহ জামে মসজিদ
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ
০৭-১১-১৪৪৩ হি.=০৯-০৫-২০২২ ঈ.
[অক্টোবর ২০২২ ঈসায়ী]

ঈমান শেখার মেহনত ও ঈমান হেফাজতের মেহনত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ، وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ، اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَغْبِطُهٗ بِهِ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ.

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ. تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানি, তিনি আমাদেরকে আরেকটি দ্বীনী মাহফিলে হাজির হওয়ার তাওফীক দান করেছেন, আলহামদু লিল্লাহ। সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত। কারণ তিনি আমাদেরকে নিজ পরিচয় দান করেছেন। আমরা তাঁকে চিনতে পেরেছি। তাঁর প্রতি ঈমান আনতে পেরেছি। তিনি আমাদের রব আর আমরা তাঁর আব্দ ও বান্দা।

তিনি আমাদেরকে দ্বীন ইসলাম কবুল করার তাওফীক দান করেছেন, তিনি আমাদেরকে মুসলিম ও মুমিন বানিয়েছেন, আলহামদু লিল্লাহ।

আমরা তাঁর আরো শোকর আদায় করি, তিনি আমাদেরকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন, আলহামদু লিল্লাহ।

যদি আমরা সকাল ও সন্ধ্যায় এই দুআ তিনবার করে পাঠ করতে পারি—

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا.

(আমি রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট, রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সন্তুষ্ট) তাহলে

আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।
হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এই দুআ সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সন্তুষ্ট করবেন। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৮৯৬৭
তিনটি কথা :
এক. আল্লাহ আমাদের রব, আমরা তাঁর বান্দা।
দুই. আমরা মুসলিম, ইসলাম আমাদের ধর্ম।
তিন. আমরা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত।
আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার যেসব নেয়ামত রয়েছে, এই তিনটি নেয়ামত অনেক বড়। আমাদেরকে দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়ত জানাবার ও শেখাবার জন্য আল্লাহ তাআলা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বশেষ আসমানী কিতাব আলকুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন। এই কুরআন কারীম যেভাবে তিনি অবতীর্ণ করেছেন সেভাবে সংরক্ষিত আছে, কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। এতে কেউ একটা অক্ষর পর্যন্ত বাড়াতে বা কমাতে পারে না এবং পারবে না। এই কুরআন আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। এসব নেয়ামতের জন্য তাঁর শোকর আদায় করা খুব জরুরি।

শোকর কীভাবে আদায় হবে?

জবানে বলব আলহামদু লিল্লাহ। অন্তরে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থাকবে, তিনি মেহেরবানি ও দয়া করে আমাদের এই নেয়ামত দান করেছেন। শোকর আরো আদায় হবে– এসব নেয়ামতের কদর, যত্ন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে।

কীভাবে এসব নেয়ামতের কদর ও যত্ন নেব?

কুরআন শিখতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহ শিখতে হবে, জানতে হবে। নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রেখেছেন। –সূরা আহযাব (৩৩) : ২১

নবীজীর সীরাত ও জীবন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। নির্ভুল আদর্শ; যাতে ভুল-ত্রুটির কোনো আশঙ্কা নেই এবং যে আদর্শের কোনো বিকল্প নেই। কাজেই এই সীরাত ও সুন্নাহ শিখতে হবে, শিখে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে আমাদের বিভিন্ন নাম রেখেছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে তিনি বিভিন্ন গুণবাচক নামে সম্বোধন করেছেন। যেমন তিনি আমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। বলেছেন–

هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ.

আমাদের নাম মুমিন। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ.

–সূরা তাওবা (৯) : ৭১

এভাবে আরো অনেক নাম আছে। যেমন মুত্তাকী, মুহসিন ইত্যাদি। নাম তো অনেক আছে, কিন্তু এসব নামের অধিকারী কে? যে নামের মধ্যে যে 'নুকতা' ও গুণের কথা বলা আছে, আমি যদি সেই গুণ অর্জন করতে পারি, তবেই আমি সেই নামের অধিকারী হতে পারব ইনশা-আল্লাহ।

'মুসলিম' নামের মধ্যে ইসলামের কথা বলা হয়েছে। 'মুমিন' নামের মধ্যে ঈমানের কথা বলা হয়েছে। 'মুত্তাকী' নামের মধ্যে তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে। 'মুহসিন' নামের মধ্যে ইহ্সানের কথা বলা হয়েছে।

এভাবে একেকটা নামের মধ্যে একেকটা সিফাত। আমাদেরকে এই সিফাতগুলো অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আমি যেহেতু মুসলিম, তাই আমাকে ইসলামের মধ্যে থাকতে হবে। আমি যেহেতু মুমিন, তাই আমার মধ্যে ঈমান থাকতে হবে।

কাকে বলে ঈমান? কাকে বলে ইসলাম?

আমরা ছোটবেলায় মক্তবেই ঈমানের মৌলিক কিছু শাখার কথা পড়ে এসেছি–

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ.

آمَنْتُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

আমরা **কি এগুলোর অর্থ বুঝি? এখানকার প্রতিটি** আকীদা আমাকে বিস্তারিত-

ভাবে বুঝতে হবে। আকীদা যদি আমি ভালোভাবে না জানি, না বুঝি, তাহলে অজান্তেই আমার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যে কোনো সময় যে কোনো প্রতারক এসে ধোঁকা দিয়ে আমাকে ইসলাম থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য ইসলামের আকীদাগুলো ভালোভাবে শেখা জরুরি।

আজ আমরা একটি আকীদা বিষয়ে একটু আলোচনা করি। সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করা হবে ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দেওয়ার মালিক।

সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনব

আমরা জানি, ইসলামের একটি মৌলিক আকীদা সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের হেদায়েতের জন্য যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন সকলকে সত্য বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করা। অর্থাৎ সবাই আল্লাহ তাআলার বান্দা ও তাঁর রাসূল–একথা বিশ্বাস ও স্বীকার করা। এটা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এক নবীকে মানা হল আরেক নবীকে মানা হল না অথবা এক নবীকে বিশ্বাস করা হল আরেক নবীকে বিশ্বাস করা হল না–সেটি ঈমান হতে পারে না। সকল নবীকেই বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হবে। কুরআন কারীমে অনেক নবীর নাম এসেছে। যেমন–

আদম আলাইহিস সালাম, ইদরীস আলাইহিস সালাম, নূহ আলাইহিস সালাম, হূদ আলাইহিস সালাম, সালেহ আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, লূত আলাইহিস সালাম, শুআইব আলাইহিস সালাম, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম, আইয়ূব আলাইহিস সালাম, যুলকিফ্ল আলাইহিস সালাম, ইউনুস আলাইহিস সালাম, মূসা আলাইহিস সালাম, হারূন আলাইহিস সালাম, ইলয়াস আলাইহিস সালাম, ইয়াসা' আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালাম, সুলাইমান আলাইহিস সালাম, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম ও খাতামুন নাবিয়্যীন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দ্র. সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৩, ১৪৪; সূরা আনআম (৬) : ৮৩-৮৬; সূরা হূদ (১১) : ৫০, ৬১, ৮৪

এর বাইরেও অনেক নবী আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা নেই। **আমরা এককথায় বলে দেব, আল্লাহ তাআলা** যাঁকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন **তিনি সত্য নবী।**

সর্বশেষ নবী ও রাসূল

এই নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী হলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা তাঁর উম্মত। ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকীদা– হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী ও রাসূল (অর্থাৎ সর্বশেষ নবী ও রাসূল) বিশ্বাস করা। তাঁর পরে আর কেউ নবী বা রাসূল হবে না। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, আমি নবুওত ও রিসালাতের ধারা এখানেই শেষ করে দিয়েছি। সূরা আহযাবে ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ . وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا .

(হে মুমিনগণ!) মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। –সূরা আহযাব (৩৩) : ৪০

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। নবুওতের ধারা তাঁর মাধ্যমেই সমাপ্ত। তাঁকে আল্লাহ তাআলা যে শরীয়ত দান করেছেন তা-ই সর্বশেষ শরীয়ত। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো শরীয়ত আসবে না। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমরা যে শরীয়ত পেয়েছি, ইসলামী শরীয়ত, এটাই কেয়ামত পর্যন্ত চলবে। তাঁর প্রতি আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের যে কিতাব নাযিল করেছেন, সেটাই সর্বশেষ কিতাব। কেয়ামত পর্যন্ত এই কুরআনের হেদায়েতই চলতে থাকবে। এর পরে আর কোনো হেদায়েতের কিতাব আল্লাহ তাআলা নাযিল করবেন না। এককথায় তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁকে যে শরীয়ত দেওয়া হয়েছে এটাই সর্বশেষ শরীয়ত। তাঁর প্রতি হেদায়েতের যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে সেটাই সর্বশেষ হেদায়েতের কিতাব এবং তাঁর উম্মত সর্বশেষ উম্মত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল–এই এক আকীদার মধ্যে একথাও আছে, তাঁকে আল্লাহ তাআলা যে শরীয়ত দান করেছেন তা বিশ্বাস করতে হবে এবং মানতে হবে। তাঁকে আল্লাহ তাআলা যে কুরআন দান করেছেন তা বিশ্বাস করতে হবে, শিখতে হবে, কুরআনের বিধান মেনে চলতে হবে।

তিনিই আমাদের আদর্শ

দ্বিতীয়ত, তাঁর সীরাত ও সুন্নত আমাদের জন্য জীবনাদর্শ। আল্লাহ তাআলা

কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রেখেছেন। –সূরা আহযাব (৩৩) : ২১

আয়াতের মর্মকথা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে 'উসওয়াতুন হাসানা' অর্থাৎ সুন্দর নমুনা। উত্তম ও নির্ভুল আদর্শ। আমাদের জীবন চলার ব্যবস্থা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং তাঁকে আল্লাহ তাআলা যে শরীয়ত দান করেছেন সেই শরীয়ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো সীরাত বা জীবনটাই সুন্নত। তাঁকে আল্লাহ তাআলা যে শরীয়ত দিয়েছেন বা কুরআন-হাদীসের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যত বিধান দিয়েছেন, সবকিছুই নবীজীর সীরাতের মধ্যে আছে। এজন্য আমাদেরকে নবীজীর সীরাতও পড়তে হবে।

আর ইসলামী শরীয়তকে বিশ্বাস ও গ্রহণ করা এবং ইসলামী শরীয়ত মেনে চলার বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া ঈমান ও ইসলামের মূলকথা। কখনো কোনো ভুল হয়ে গেলে তওবা করে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাওয়া। নিজেকে অপরাধী মনে করা। ঈমানে মুজমালের মধ্যে আছে–

وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ.

আল্লাহর দেওয়া পুরো শরীয়ত, রাসূলুল্লাহ্‌র সব সুন্নত আমি মেনে নিয়েছি ও গ্রহণ করেছি। এর পরও যদি কখনো শয়তানের ধোঁকায়, নফসের ওয়াসওয়াসায় কোনো গোনাহ হয়ে যায় তখন নিজেকে অপরাধী মনে করে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আগে আমাকে এই পুরো শরীয়ত গ্রহণ করা এবং মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হবে; না হয় ঈমানই হবে না। কিন্তু যেহেতু আমরা মানুষ, আমাদের অনেক দুর্বলতা। তাই কখনো কোনো ভুল হয়ে যেতে পারে। ভুল হওয়া মানেই অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়ে যাওয়া নয়। সেই ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব। অর্থাৎ তওবার মাধ্যমে ঈমানের নবায়ন করব।

হাদীস অস্বীকারের ফেতনা

আকীদার এ কথাগুলো খুব ভালোভাবে আমাদের জানা জরুরি। কেউ যদি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অস্বীকার করে, তাহলে কি তার ঈমান থাকে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত রয়েছে হাদীসের মধ্যে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করে করে আমাদের কুরআন কারীম শিখিয়েছেন আল্লাহর হুকুমে। কোন্ আয়াতের কী অর্থ, কী মর্ম, কোন্ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কী বিধান দিয়েছেন, সেই বিধান কীভাবে বাস্তবায়ন হবে, সেগুলো নবীজী আমাদেরকে সব হাতেকলমে শিখিয়েছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন। কুরআন কারীমে আছে–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

'তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবে।' –সূরা জুমুআ (৬২) : ২

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআনের যে বিধানগুলো শিখিয়েছেন সেগুলো হাদীস শরীফে সংরক্ষিত আছে। নবীজীর সকল সুন্নতই হাদীসে সংরক্ষিত। কুরআন-হাদীস সবচেয়ে বেশি বুঝেছেন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও মাযহাবের ইমামগণ। যাঁদের মধ্যে আছেন ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেঈ রহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-সহ আরো অনেকে। এখন কেউ যদি এসে হাদীস অস্বীকার করে এবং বলে, কুরআন নিজে নিজেই বুঝে ফেলবে, হাদীসের সহযোগিতা লাগবে না, তার ঈমান থাকবে?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও সীরাত, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন, সেগুলো তার দরকার নেই, সে কুরআনের অনুবাদ পড়ে পড়ে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করবে, নিজে যা বুঝবে সেটাকেই বানিয়ে দেবে আল্লাহর হুকুম– এমন চিন্তা লালনকারী ব্যক্তির কি ঈমান থাকতে পারে? কাজেই এমন কোনো লোক যদি দাওয়াত নিয়ে আসে তার কথা শোনা যাবে না। এদেশে এখন এমন অনেক লোক তৈরি হয়ে গেছে, যারা হাদীস অস্বীকার করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অস্বীকার করে। কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে। যাকে বলা হয় অপব্যাখ্যা। সত্যি কথা হল, এদের আসলে কুরআনের প্রতিও ঈমান নেই, রাসূলের প্রতিও ঈমান নেই। এরা বরং কুরআনকে নিয়ে তামাশা করে। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, কুরআন যাতে তাঁর নবীর কাছে শেখা হয়।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হল তাঁর নবী যেভাবে কুরআন শেখাবেন এবং বুঝাবেন সেভাবেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তা বাদ দিয়ে নিজের মতো করে যদি কুরআনের ব্যাখ্যা করা হয়, সেটি আল্লাহর হুকুম মানা হবে, নাকি শয়তানী হবে? এরা 'আহলে কুরআন' নামধারী, কিন্তু বাস্তবে এরা হল রাসূল অবমাননাকারী এবং হাদীস অস্বীকারকারী। এরা ইসলামের গণ্ডি থেকে বাইরে। এদের কথায় কান দেওয়া যাবে না।

কাদিয়ানী ফেতনা

ঠিক এরকম কিছু লোক আছে, যারা মানুষের কাছে দাওয়াত নিয়ে যায় যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হল মাহদী ও মাসীহ। এরা আসলে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোক। নিজেদের নাম দেয় 'আহমদিয়া মুসলিম জামাত', নাউযুবিল্লাহ! অথচ তারা মুসলিম নয়; তারা বেঈমান। প্রতারণা করে নিজেদের মুসলিম পরিচয় দেয়। এই কাদিয়ানীরা যখন মানুষকে তাদের ধর্মের দিকে দাওয়াত দিতে আসে, প্রথমেই মানুষকে 'তার' নবী দাবির বিষয়ে কিছু বলে না। বলে, মির্যা সাহেব হলেন প্রতিশ্রুত মাসীহ ও মাহদী। অথচ মাহদী আসার কথা কেয়ামতের আগমুহূর্তে। সে যদি মাহদীই হত, এতদিনে কেয়ামত এসে দুনিয়াই শেষ হয়ে যেত। কারণ তার মৃত্যুর তো একশ এগারো বছরের মতো পার হয়ে গেছে। এরা আসলে কঠিন ধোঁকাবাজ। সে নিজেকে নবী দাবি করেছে অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাহলে কি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ১২ শ বছর পরে এসে কারো জন্য নবী হওয়া সম্ভব? সে তো নবী দাবি করেছে, কিন্তু তার অনুসারীরা মানুষকে গিয়ে প্রথমেই একথা বলে না। প্রথমেই একথা বললে তো মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলবে। এজন্য ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। প্রতারণা করে প্রথমে মানুষকে একথা গেলাবার চেষ্টা করে যে তিনি মাহদী। তিনি মাসীহ। নাউযুবিল্লাহ! আবার কখনো বলে, তিনি মুজাদ্দিদ। অথচ সে একজন প্রতারক ও নবুওতের মিথ্যা দাবিদার। কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়ত অস্বীকারকারী। কুরআন বলে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। এটি শরীয়তের অকাট্য বিধান। এই **বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে কেউ যদি** নিজেকে 'নবী' দাবি করে তার মুসলমান **হওয়ার** নূন্যতম কোনো **অবকাশ** নেই। সে নিশ্চিত অমুসিলম ও বেঈমান। **তাকে যদি কেউ মানে বা গ্রহণ** করে, কেউ যদি তাকে মাহদী বা মাসীহ **মনে করে– তারও ঈমান থাকবে না।**

ঈমানের হেফাজত ফরয

ভাই ও বন্ধুগণ, ঈমান আনা যেমন ফরয, হেফাজত করাও ফরয। কিন্তু এখন ঈমানের ওপর আক্রমণ চলছে বিভিন্নভাবে। মানুষের ঈমান নষ্ট করার জন্য এবং তাদেরকে গোমরাহ করার জন্য বিভিন্ন প্রতারক বিভিন্নভাবে অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এজন্য ঈমান গ্রহণ করে এর জন্য যেমন আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে, তেমনি ঈমানের ওপর অটল অবিচল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সবসময় দুআও করতে হবে। কুরআনে বর্ণিত একটি দুআ সবসময় পাঠ করতে হবে–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

'হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে যখন হেদায়েত দান করেছেন তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করবেন না এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনিই মহা দাতা।' –সূরা আলে ইমরান (০৩) : ০৮

অর্থাৎ আল্লাহ, আপনি মেহেরবানি করে হেদায়েত দান করেছেন। ঈমানের দৌলত দান করেছেন। কাজেই আল্লাহ, আপনি মেহেরবানি করে আমাদেরকে পরিপূর্ণ মুসলিম বানিয়ে দিন। আপনি মেহেরবানি করে আমাদের ঈমান ও ইসলামকে হেফাজত করুন। ঈমানের ওপর অটল ও অবিচল রাখুন।

ইসলামী আকীদা শিখব ও জানব

এভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করব। আর ইসলামী আকীদাগুলো ভালো করে শেখার চেষ্টা করব। বারবার চর্চা করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

جَدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ.

'তোমরা ঈমান নবায়ন কর।'

একবার কালেমা পড়ে ঈমান আনলে, তারপর বেখবর বসে থাকলে, কাজ হবে না। তোমাকে ঈমানের নবায়ন করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন–

يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟

'আল্লাহর রাসূল, আমরা ঈমানের নবায়ন কীভাবে করব?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

‘বেশি বেশি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়।’

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর যিকির ও আলোচনা বেশি বেশি কর। ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর মর্ম ভালো করে অনুধাবন কর। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৭১০; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৬৫৭

‘কালেমা তাইয়েবা’র দৃষ্টান্ত

ছোট্ট এই বাক্যের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কী দিয়ে রেখেছেন, তা বেশি বেশি চর্চা কর। খুব ভালো করে বোঝার ও জানার চেষ্টা কর।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন–

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ.

‘তোমরা কি দেখনি, আল্লাহ কালেমা তাইয়েবার কেমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন? তা এক পবিত্র বৃক্ষের মতো, যার মূল (ভূমিতে) সুদৃঢ়ভাবে স্থিত, তার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত।’ –সূরা ইবরাহীম (১৪) : ২৪

এই যে আমাদের ঈমান, এ তো একটা পবিত্র গাছ। জমিনে যখন আমরা গাছ লাগাই, আমাদেরকে তার হেফাজত করতে হয়। গরু-ছাগল যাতে নষ্ট করতে না পারে সেজন্য বেড়া দিয়ে রাখি। তারপর এ গাছের গোড়ায় পানি দেওয়া হয়। আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। এভাবে যে গাছের যত্ন যেভাবে নিতে হয় আমরা সবই করি। সেভাবে যত্ন নিই। এক সময় এই গাছ বড় হয়। তার মধ্যে ফল ধরে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, পবিত্র কালেমার (ঈমানের কালেমাই তো সবচেয়ে বড় ও পবিত্র কালেমা অর্থাৎ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’, ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ ওয়া-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ’) দৃষ্টান্ত হল পবিত্র একটি বৃক্ষ। ফলের জন্য গাছ লাগানো হয় জমিনে আর ঈমানের গাছের জায়গা হল মানুষের কলব ও অন্তর। ঈমান নামক বৃক্ষের চারা মানুষের দিলের মধ্যে লাগানো হয়েছে।

اَصْلُهَا ثَابِتٌ.

যত তুমি ঈমান ও ইসলামের ইল্‌ম হাসিল করবে, এর জন্য যত ফিকির ও মেহনত করবে, যত আমল করবে এবং দাওয়াত দেবে, যত এই দ্বীনের তালীমের কাজ করবে এবং তালীম হাসিল করবে, ততই গাছের গোড়া

মজবুত হতে থাকবে।

وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ.

একদিকে গোড়া মজবুত হবে, অন্যদিকে তার শাখাপ্রশাখা বের হতে থাকবে। দুনিয়ার গাছের আমরা কত ডালপালা বের হতে দেখি। একটা থেকে আরো কতটা ছড়ায়। কত সুন্দর পাতা! কত সুন্দর ফল, ফুল! তো ঈমানের যে গাছ কলবের মধ্যে লাগালাম, গোড়া মজবুত হচ্ছে, তার ডালাপালাগুলো কোথায়? তার ডলাপালা হল নেক আমল। প্রতিটা নেক আমলই এককেটা ডাল। জমিনের গাছের ডাল ওপরের দিকেও যায় আবার ডানেবামেও ছড়ায়। কিন্তু ঈমানের গাছের ডালগুলো আল্লাহ তাআলা কবুল করে আসমানের দিকে নিয়ে যান। আল্লাহ তাআলা তাঁর দরবারে উঠিয়ে নেন। ইরশাদ হয়েছে–

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ.

–সূরা ফাতির (৩৫) : ১০

অর্থাৎ পবিত্র কালেমা তাঁরই দিকে আরোহণ করে। সৎকর্মকে আল্লাহ তাআলা উঠিয়ে নেন এবং ঈমান ও আমলের জিন্দেগি অবলম্বনকারীদের ইয্যত আল্লাহ তাআলা বুলন্দ করেন।

আসলে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত রাখা হলে তাঁর রহমত ও মেহেরবানি হতে থাকবে। ফলে এই গাছ থেকে যেমন ডাল বের হতে থাকবে, তার থেকে ফলও আসতে থাকবে। ফল মানে নেকআমল। আল্লাহর যিকির, তেলাওয়াত। আল্লাহর দরবারে দুআ-রোনাজারি। মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, আল্লাহর মাখলুকের হক আদায় ইত্যাদি। আমার ওপর যার যে হক রয়েছে, সেগুলো যথাযথ আদায় করা। লেনদেন পরিষ্কার রাখা। জুলুম, অন্যায়-অবিচার, সুদ-ঘুষসহ সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা। সকল কবীরা গোনাহ পরিহার করা। এসব হল ঈমানের গাছের ফল।

তুমি যদি এই ঈমানের কদর ও মূল্যায়ন কর; যদি এই নেয়ামতের শোকর আদায় কর যে আল্লাহ মুসলিম বানিয়েছেন, তাই ইসলামের বিধানগুলো যদি মেনে নেওয়ার চেষ্টা কর; আল্লাহ মুমিন বানিয়েছেন, তাই ঈমানের আকীদাগুলো ভালোভাবে শিখে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা কর এবং অন্তরে মজবুত কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে তাওফীক দেবেন। চেষ্টা করলে আল্লাহ অবশ্যই তাওফীক দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ তুমি চেষ্টা চালিয়ে যাও এবং আল্লাহর কাছে চাইতে থাক, তিনি তোমাকে দুনিয়া আখেরাতের সকল জায়গায় ঈমানের কালেমার ওপর মজবুত রাখবেন ইনশা-আল্লাহ। দুনিয়াতেও কেউ তোমার ঈমানের গাছ নষ্ট করতে পারবে না। তোমার কলবের মধ্যে ঈমানের গাছের যে শেকড় মজবুত হয়ে আছে, সেটি উঠিয়ে কেউ তোমার কলব থেকে ঈমান বের করতে পারবে না। তোমাকে ইসলাম থেকে কেউ বের করে নিতে পারবে না। বিচ্যুত করতে পারবে না। তুমি কবরে গেলে সেখানেও মুনকার-নাকীর তোমাকে আটকাতে পারবে না ইনশা-আল্লাহ। তোমাকে প্রশ্ন করলে তখন তুমি তাওহীদের কালেমা এবং কালেমা শাহাদত পড়ে নিতে পারবে– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

এই যে বললাম, ঈমান হেফাজত করতে হয়, ঈমান হেফাজত হয় আমলের মাধ্যমে। যত্নের সঙ্গে নেকআমল করার এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে।

ঈমান শেখার মেহনত যেভাবে করতে পারি

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈমান শেখা। ফরযে আইনের ইলম শিখতে হবে। আল্লাহ কী কী ফরয করেছেন, ইসলামী আকীদাগুলোর কোন্টার কী ব্যাখ্যা, সেগুলো ভালো করে জানতে হবে, যাতে কেউ এসে অপব্যাখ্যা করে আপনাকে গোমরাহ করতে না পারে। হালাল-হারামের মাসআলাগুলো, জায়েয-নাজায়েযের মাসআলাগুলো জানতে হবে। আমার ওপর কার কী হক রয়েছে, কীভাবে আদায় করতে হবে তা জানতে হবে। এগুলো এক-দুদিনে শেখা যায়? শুধু চল্লিশ দিনে শেখা যায়? এর জন্য আমাদেরকে ভালো করে মেহনত করতে হবে। মেহনতের সহজ রাস্তা আল্লাহ খুলে দিয়েছেন।

এক তো তিন দিন, দশ দিন, এক চিল্লা, তিন চিল্লা করে তাবলীগে সময় লাগানো। সময় বের করতে পারলে চিল্লা দিলাম। বছরে এক চিল্লা, মাসে তিন দিন। আপনার যদি প্রশ্ন হয়, 'তিন দিন'-ই কেন লাগাতে হবে, আপনি তাহলে পাঁচ দিন লাগান বা দুই দিন লাগান; এমনকি এক দিনই লাগান না! 'তিন দিন' এটা একটা নিয়ম বানানো হল আর কি। এই না যে এটা বিধান। তিন দিনের কম লাগালে আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এমন কথা নয়।

দ্বিতীয় হল, আমাদের তালীমুদ্দীনে গিয়ে দ্বীন শেখা। দ্বীন শেখার ব্যবস্থা

অনেক মসজিদেও থাকে। না থাকলে আপনি আপনার মহল্লায় শুরু করুন। আর মারকাযুদ দাওয়াহ থেকে তো এলান করে রাখা হয়েছে, আপনি ফজরের পরে আসলেও আমরা হাজির। মাগরিবের পরে আসলেও আছি। আসরের পরে আসলেও আমরা শেখানোর জন্য প্রস্তুত আছি ইনশা-আল্লাহ। এখন তো আমাদের মারকাযুদ দাওয়াহ্‌র মুদীর (পরিচালক) মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ছাহেব হুজুর পুবদিকে কাঁচা রাস্তার সঙ্গে লাগানো একটা জমিনে তালীমুদ্দীনের ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন আলহামদু লিল্লাহ। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা খায়ের ও বরকতের সঙ্গে এই কাজকে পূর্ণতায় পৌছে দিন। অতি দ্রুত বরকতের সঙ্গে কাজটা পূর্ণ করে দিন। যে জন্য এই ভবন, সেই মাকসূদ আল্লাহ তাআলা পূরণ করে দিন, আমীন।

এই তালীমুদ্দীন ভবন কী জন্য? আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা দ্বীন শেখার জন্য। এমনকি কেউ যদি রাত দুইটা-তিনটায় দ্বীন শেখার জন্য রীতিমতো আসতে চায় সেও আসতে পারবে ইনশা-আল্লাহ। এই সময় তো সাধারণত কেউ আসে না। কিন্তু কথার কথা, কেউ তাহাজ্জুদের জন্য উঠেছে, উঠে চিন্তা করল, এখন গিয়ে ঘুরে আসি, ইনশা-আল্লাহ তিনিও এসে এখান থেকে শিখতে পারবেন। এমনিতে ফজরের পর থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু কেউ যদি চায়, তাহাজ্জুদের সময় এসে পড়বে, তিনিও পারবেন ইনশা-আল্লাহ। এটা হল চব্বিশ ঘণ্টার মেহনত। যখন যে আসবে সে-ই পাবে। একজন হঠাৎ এল, তাকে একথা বলা হবে না যে, এক সপ্তাহ পর নতুন একটা ব্যাচ শুরু হবে, আপনি সেই ব্যাচের সঙ্গে শুরু করুন। না, এমন বলা হবে না।

আচ্ছা, তাহলে কি এই ঘর হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা বসে থাকব? না, বসে থাকব না। এখানে এখনো প্রতিদিন তালীমের কাজ চলে। আপনারা সবাই আসতে পারেন। আপনাদের জন্য আলাদা করে লোক রাখা নেই, কিন্তু আপনি আসলে অন্য ব্যস্ততার মাঝেও আপনাকে তাঁরা সময় দেবেন। এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। কেউ যদি দ্বীন শিখতে আসে, আপনার যত ব্যস্ততাই থাকুক, তাকে সময় দিতে হবে। একটা হল, এমনিতে কোনো কিছু জানতে এসেছে, তাৎক্ষণিক জানা জরুরি নয়, পরে জানলেও হবে, সেটা ভিন্ন কথা। তখন হয়ত বলা যেতে পারে, আচ্ছা ভাই, আমার একটু ব্যস্ততা আছে, আপনি পরে আসুন। এটা হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি 'ফরযে আইন' ইলম শিখতে আসে তাহলে আর দেরি করা যায়

না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন, ওই সময় একজন এসে বলেছেন, আমার শিখতে হবে, আমার জানার আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ খুতবা বন্ধ করে দিয়েছেন। খুতবা বন্ধ করে যেখানে সে বসা ছিল তাকে শেখানোর জন্য নবীজী সেখানে চলে গেছেন। সেটা দেখে কোনো এক সাহাবী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসার জন্য একটা কুরসি (চেয়ার) এনে দিয়েছেন। নবীজী সেখানে বসে তাকে তালীম দিয়েছেন।

ফরয ইলম কেউ শিখতে চাইলে দেরি করা যায় না। এরকম আরো অনেক ঘটনা আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যস্ততার মাঝে কেউ এসেছে, তিনি ব্যস্ততা ছেড়ে তাৎক্ষণিক তাকে সময় দিয়েছেন। ফরয পর্যায়ের তাৎক্ষণিক বিষয় জানার ক্ষেত্রে নীতি এটা। এজন্য এখানকার সবাই ব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও আপনাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। আপনি কুরআন শিখতে এসেছেন, নামায শিখতে এসেছেন, হালাল-হারাম সম্পর্কে জানতে এসেছেন, কীভাবে আপনার ব্যবসা হালাল হয়, ব্যবসাকে হারামমুক্ত কীভাবে করা যায়, আপনি জানতে এসেছেন, আপনাকে তাৎক্ষণিক সময় দেওয়া হবে। একজন বিয়ে করবে, স্ত্রীর সঙ্গে তার আচরণ কেমন হবে, তার ওপর স্ত্রীর কী হক জানতে এসেছে, তাকে সময় দেওয়া হবে। কারণ এগুলো নগদ শিখতে হয়। নগদ ইলমে দেরি করা যায় না। এজন্য ব্যস্ত হুজুররাও আপনাকে সময় দেবেন ইনশা-আল্লাহ।

তাহলে তাবলীগ আর তালীমুদ্দীন—এ দুটো থেকে আমরা ফায়েদা ওঠাব তো?

দ্বীন শেখার তৃতীয় সহজ রাস্তা হল দ্বীনী মাহফিল। যেখানেই শুনবেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অনুসারী, আহলে হক উলামায়ে কেরাম আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের অধীনে কোনো দ্বীনী মাহফিল হচ্ছে, সেখানে গিয়ে হাজির হবেন। দ্বীনী মাহফিল ও মজলিসে অংশগ্রহণ করা ঈমান তাজা করার একটা উপায়। ঈমান হেফাজতের জন্য ফরয ইলম শেখা সবচেয়ে জরুরি বিষয়। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে আমি উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে গাট্টি নিয়ে জায়গায় জায়গায় ঘুরব।

এমনিতে দেখুন, আমি কোথাও দ্বীনের কোনো কাজে যাচ্ছি, সেটা নিজের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু একসঙ্গে আট-দশজন, পনেরো-বিশজন মানুষ, সবার হাতে গাট্টি, এদিকে চুলা, ওদিকে অন্যান্য জিনিস-পত্র, সব নিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, নতুনদের অনেকের মধ্যে, প্রথমে নিজের মধ্যে একধরনের কিছুটা

খারাপ খারাপ লাগে। লজ্জা লাগে। এই যে একটু লজ্জা লাগছে, তারপরও আমি যাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই আমল পছন্দ হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কবুল করুন। তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[মাসিক দ্বীনী মাহফিল
মারকাযুদ দাওয়াহ জামে মসজিদ, হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ
৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হি. = ৩ অক্টোবর ২০২২ ঈ., সোমবার
[নভেম্বর ২০২২ ঈসায়ী]

যিয়ারতে বাইতুল্লাহ
আমরা ওখান থেকে কী নিয়ে ফিরব

হজ-ওমরায় গেলে আমরা সেখান থেকে কী নিয়ে ফিরব? কদিন আগে আমার সন্তানদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। অনেক বন্ধুও মাঝেমধ্যে এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন। তাই মনে হল, আরো কিছু প্রয়োজনীয় কথাসহ ওই আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরি।

আবদ ও আবিদ হয়ে ফিরে আসা

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এই সফরের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কোনো না কোনো ইবাদত আদায় হয়ে থাকে। চাই তা ফরয, সুন্নত কিংবা নফল ইবাদতই হোক না কেন। তাই একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে যে, সে আল্লাহর ঘর থেকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতগোযার বান্দা হয়ে ফিরে আসবে!

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

হে আল্লাহ! আপনার হামদ ও শোকর আদায় করতে করতে পুনরায় আপনার দরবারেই আমরা ফিরে আসছি।

আমি সন্তানদেরকে এবং বন্ধুদেরকেও বলেছি, হজ ও ওমরা শেষে সঙ্গে করে কী আনবেন, তা জানতে হলে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করুন, হাদীস ও সীরাতের কিতাব থেকে হজের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করুন, আকাবিরের হজের ঘটনাবলি পাঠ করুন। বাইতুল্লাহ ও হজের অন্যান্য শাআয়ের ও মাশায়ের যে সকল মহাপুরুষের ত্যাগ ও কুরবানীর সাক্ষ্য বহন করছে, কুরআন মাজীদে তাঁদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যাবলি পড়তে থাকুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজের বিবরণ পাঠ করুন, তাঁর সঙ্গে যারা হজ করেছেন তাদের ঘটনাবলি জানুন। তাহলে ইনশা-আল্লাহ সহজেই বুঝতে পারবেন, হজের শিক্ষা কী এবং সেখান থেকে কী আনতে হবে। এই নিবন্ধে শুধু মৌলিক কিছু শিক্ষার দিকে ইঙ্গিত করা হল।

১. তাওহীদ ও ঈমান-ইয়াকীন

তাওহীদের পূর্ণতা ও ঈমান-ইয়াকীনের দৃঢ়তা হজের প্রথম ও চূড়ান্ত শিক্ষা। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক... থেকে শুরু করে বিদায় তওয়াফ পর্যন্ত হজের প্রতিটি আমল এ সাক্ষ্যেরই মূর্ত রূপ যে, আমাদের তাওহীদ শুধু বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আকীদা ও বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে তা আমাদের কর্ম ও আচরণে, আমাদের চরিত্র, ব্যবহার ও চালচলনে মিশে গিয়েছে।

কাবার নির্মাতা, তাওহীদের ইমামের আচরণ-উচ্চারণ তো এই ছিল–

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

'আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে নিজের মুখ ফেরালাম, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' –সূরা আনআম (৬) : ৭৯

তদ্রূপ :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ۝ لَا شَرِيكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۝

'বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক...।' –সূরা আনআম (৬) : ১৬২-১৬৩

তাওহীদ পূর্ণ হয় মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহব্বতের পরিপূর্ণতা ও নিসবতে ইহসান অর্জনের মাধ্যমে। আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো হজ ও ওমরায় এই দুটি জিনিসেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ঈমান ও ইয়াকীন মজবুত করার জন্য হারামের সীমানায় প্রবেশ করার সময় হাজার (হাজেরা) রা.-এর ইয়াকীনপূর্ণ ওই বাক্য স্মরণ করাই যথেষ্ট, যা তাঁর পাক জবানে উচ্চারিত হয়েছিল এক কঠিন মুহূর্তে। ইবরাহীম আ. যখন তাঁকে ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈলকে তৃণলতাহীন, জনমানবশূন্য মরুপ্রান্তরে উপায়-উপকরণহীন নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাচ্ছিলেন তখন হাজার রা. একথা জানতে পেরে যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই তিনি এমনটি করছেন, অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে দৃঢ়তাপূর্ণ ঐতিহাসিক বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন–

إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا

'(আল্লাহ তাআলাই আমাদের অভিভাবক।) সুতরাং তিনি আমাদের ধ্বংস

করবেন না।' –আসসুনানুল কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৮৩২০; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৪০৬৪

২. আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ

মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হল আনুগত্য ও সমর্পণ। এজন্যই তার অপর নাম মুসলিম। হজের বিধিবিধানই এমন যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো আমলে এই সমর্পণেরই অনুশীলন চলে। উপরন্তু কোনো হজ বা ওমরাকারী যদি কাবাগৃহের নির্মাতা ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর অবস্থা স্মরণ রাখেন তাহলে তিনি হজ থেকে আনুগত্য ও সমর্পণের শিক্ষা গ্রহণ না করে ফিরতে পারেন না।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

যে ব্যক্তি নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে, সে ছাড়া আর কে ইবরাহীমের পথ পরিহার করে? বাস্তবতা তো এই যে, আমি দুনিয়ায় তাকে (নিজের জন্য) বেছে নিয়েছি আর আখেরাতে সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন, 'আনুগত্যে নতশির হও', তখন সে (সঙ্গে সঙ্গে) বলল, আমি রাব্বুল আলামীনের (প্রতিটি হুকুমের) সামনে মাথা নত করলাম। –সূরা বাকারা (২) : ১৩০-১৩২

পিতা-পুত্রের কুরবানী, আসমানী মহাপরীক্ষা এবং তাঁদের সফলতার বিবরণ–

وَقَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ. رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ. فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ. فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ. وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ. اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ. وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ. سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ. كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ. اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ.

ইবরাহীম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎ লোকদের একজন। সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। এর পর সে পুত্র যখন ইবরাহীমের সঙ্গে চলাফেরা করার উপযুক্ত হল, তখন সে বলল– বাছা, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে তোমাকে জবাই করছি। এবার চিন্তা করে বল, তোমার অভিমত কী? পুত্র বলল– আব্বাজী, আপনাকে যার

নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটাই করুন। ইনশা-আল্লাহ, আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন। সুতরাং (সেটা ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল। আর আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম– হে ইবরাহীম, তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা এবং আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে সে শিশুকে মুক্ত করলাম এবং যারা তার পরবর্তীকালে এসেছে তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্য চালু করেছি যে (তারা বলবে) সালাম হোক ইবরাহীমের প্রতি, আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। –সূরা সাফফাত (৩৭) : ৯৯-১১১

৩. ধৈর্য, অবিচলতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা

শুধু ইসমাঈল আ.-এর কুরবানী ও সম্পর্কের ঘটনা থেকেই ধৈর্য ও অবিচলতা এবং ত্যাগ ও আত্মত্যাগের শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেছিলেন–

يَٰٓأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيٓ إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

'আব্বাজী, আপনাকে যা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটাই করুন। ইনশা-আল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন।' –সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০২

৪. আল্লাহর ফয়সালায় আস্থা ও সন্তুষ্ট থাকা

আল্লাহ তাআলার যে কোনো ফয়সালার প্রতি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকা হচ্ছে তাওহীদের অনেক বড় একটি শাখা। আল্লাহ তাআলাকে যে চিনতে পেরেছে, আল্লাহর প্রতি যার ভালোবাসা আছে এবং যার মাঝে এই অনুভূতি আছে যে, আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালোবাসেন, তার মাঝে কি 'রিযা বিল-কাযা'র (আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা) গুণ না থেকে পারে?!

অথচ বাস্তবতা এই যে, আমার মতো দুর্বল ঈমানদার অসংখ্য মানুষ এই দৌলত থেকে বঞ্চিত। তারা যদি মক্কা ও মদীনায় ইবরাহীম আ., ইসমাঈল আ. ও হাজার রা. এবং সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সীরাতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি পুনরায় স্মরণ করেন, তাহলে তাদের মাঝেও 'রিযা বিল-কাযা'র গুণ উজ্জীবিত না হয়ে পারে না।

৫. বাইতুল্লাহ্র হেদায়েত ও বরকতসমূহ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ .

বাস্তবতা এই যে, মানুষের (ইবাদতের) জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর তৈরি করা হয়, নিশ্চয়ই তা সেটি, যা মক্কায় অবস্থিত (এবং) তৈরির সময় থেকেই সেটি বরকতময় এবং সমগ্র জগতের মানুষের জন্য হেদায়েতের উপায়। –সূরা আলে ইমরান (৩) : ৯৬

কেউ বাইতুল্লাহ্র হজ করল অথচ বাইতুল্লাহ যেসব হেদায়েত ও বরকতের কেন্দ্র, তা নিয়ে আসতে পারল না, তাহলে তার হজ কেমন হজ হল? বাইতুল্লাহ্র প্রধান হেদায়েত হল তাওহীদ ও একতা। আর তার প্রধান বরকত সম্ভবত শান্তি ও আমানতদারি রক্ষা।

ইসলামের ভিত্তিই হল তাওহীদ ও একতার ওপর। আর ঈমানের মৌলিক শিক্ষা হল, শান্তি বজায় রাখা ও আমানতদারি রক্ষা করা। আল্লাহ তাআলা যাকে নিজ চোখে তাওহীদ ও নিরাপত্তার মূলকেন্দ্র দেখিয়েছেন এবং হজের পূর্ণ সময় বিশেষত আরাফার দিনে ও আরাফার ময়দানে জাতি-বর্ণ, ভাষা-ভূমি, মত ও পথের সকল ভেদাভেদ ভুলে এক পোশাকে এবং এক ভাষায় সকল মুমিনকে 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...' ধ্বনিতে মুখর হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করিয়েছেন, সে যদি তাওহীদ ও ইত্তেহাদ এবং আমন ও আমানতের সবক না নিয়েই ফিরে আসে, তাহলে সে নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করল।

৬. আল্লাহর শাআয়েরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি

সূরা হজ্বে আল্লাহ তাআলা হজের আহকাম ও বিধান বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন–

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ .

এসব কথা স্মরণ রেখ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ যেসব জিনিসকে মর্যাদা দিয়েছেন তার মর্যাদা রক্ষা করবে, **তার জন্য এ কাজ অতি উত্তম তার** প্রতিপালকের কাছে। –সূরা হজ্ব (২২) : ৩০

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ .

এসব বিষয় স্মরণ রেখ। আর কেউ **আল্লাহর শাআয়েরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন**

করলে এটা তো অন্তরস্থ তাকওয়া থেকেই উৎসারিত। –সূরা হজ্ব (২২) : ৩২

শাআয়ের বলা হয় এমন সব কথা ও কাজ এবং এমন সকল স্থান ও সময়কে, যা আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য নিদর্শন বা প্রতীক নির্ধারণ করেছেন। এগুলো মূলত আল্লাহ তাআলার কুদরত ও রহমতের নিদর্শন এবং ইসলামের প্রতীক। ইসলামের অনেক প্রতীক রয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হল চারটি। যথা :

ক. কালামুল্লাহ (কুরআন মজীদ)

খ. বাইতুল্লাহ ও বাইতুল্লাহ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ (যেমন হারামের ভূমি, সাফা-মারওয়া, মীনা-মুযদালিফা, আরাফা ইত্যাদি।)

গ. রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ঘ. আল্লাহ তাআলার সকল ইবাদত-বন্দেগি। বিশেষত কালেমা, নামায, যাকাত, সওম, হজ ইত্যাদি।

শাআয়েরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হল ঈমান। আর ইসলামের কোনো শিআরের সামান্যতম অবমাননা হচ্ছে কুফর। আল্লাহ তাআলা যাকে 'শাআয়েরে মুকাদ্দাসা' যিয়ারতের তাওফীক দিয়েছেন, নিজ চোখে বাইতুল্লাহ দেখিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ ও রওযাতুল জান্নাহ যিয়ারত করিয়েছেন, তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালামের নজরানা পেশ করার তাওফীক দিয়েছেন, তার মধ্যে তো শাআয়েরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অনেক বেশি থাকা উচিত। তার ঈমান তো এত দৃঢ় ও আপোষহীন হওয়া উচিত যে, ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষা এবং ইসলামের কোনো সম্মানিত ব্যক্তি বা সম্মানিত কোনো বস্তুর সামান্য অবমাননাও তার কাছে বরদাশতযোগ্য হবে না।

কোনো দেশের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তিরা যখন হজ ও ওমরার সৌভাগ্য লাভ করেন, তখন আমরা তাদের কাছে এতটুকু ঈমানী গায়রত আশা করতে পারি যে, তারা নিজ দেশে এমন কোনো ব্যক্তিকে বরদাশত করবে না, যে ইসলামের কোনো শিআরের অবমাননা করে। তাদের কর্তব্য, এসব অবমাননাকারীর ওপর ইরতিদাদের শাস্তি কার্যকর করে নিজেদের ঈমানী গায়রতের প্রমাণ দেওয়া।

৭. পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

বাহ্যিক **পরিপাটিতা ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানু**বর্তিতা

ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাইতুল্লাহ্র হজকারীগণ যখন বাইতুল্লাহ্র নির্মাতাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা শোনেন যে–

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

'এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে গুরুত্ব দিয়ে বলি যে, তোমরা উভয়ে আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (এখানে) তওয়াফ করবে, ইতেকাফে বসবে এবং রুকু ও সেজদা আদায় করবে।' –সূরা বাকারা (২) : ১২৫

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

'এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সেই ঘর (অর্থাৎ কাবাগৃহ)-এর স্থান জানিয়ে দিয়েছিলাম। (এবং তাকে হুকুম দিয়েছিলাম) আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র রেখো, যারা (এখানে) তওয়াফ করে, ইবাদতের জন্য দাঁড়ায় এবং রুকু-সেজদা আদায় করে।' –সূরা হজ্ব (২২) : ২৬

–তখন অবশ্যই তার মাঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে মসজিদের কোনো মুসল্লি হজ করেছেন, যে মসজিদের পরিচালনা কমিটির কোনো সদস্য হজ করেছেন সে মসজিদে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি কি অবহেলিত থাকতে পারে? সে মসজিদের ওযুখানা-টয়লেট কি নোংরা থাকতে পারে?!

আর বাইতুল্লাহ তো শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতারই শিক্ষা দেয় না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার পাশাপাশি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতারও শিক্ষা দেয়। সুতরাং হজ ও ওমরার সৌভাগ্য যার হয়েছে তার অন্তঃকরণ হবে পবিত্র, আচার ও আচরণ হবে মার্জিত, ভাষা ও উচ্চারণ হবে ভদ্র ও শীলিত এবং তার পোশাক ও বেশভূষা হবে পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন।

সবচেয়ে বড় পবিত্রতা জীবিকা হালাল হওয়া

একথাও মনে রাখা জরুরি যে, ঈমানের পর সবচেয়ে বড় পবিত্রতা হল জীবিকা হালাল হওয়া। আয়-উপার্জনে হালাল-হারাম বেছে চলা। জীবিকা হালাল না হওয়ার অপবিত্রতা এমন যে, ওযু-গোসল দ্বারা যতই পবিত্র করার চেষ্টা করা হোক তা পবিত্র হয় না। এ থেকে পবিত্রতা লাভের একমাত্র উপায়

হল খাঁটি দিলে তওবা করা এবং হারাম উপার্জন ত্যাগ করে হালাল পন্থা অবলম্বন করা। পাশাপাশি যেসব মানুষের হক নষ্ট করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া। উপার্জন যতক্ষণ পবিত্র না হবে ততক্ষণ দুআ ও ইবাদত কবুল হবে না। তবে এ অবস্থায় ইবাদত-বন্দেগি ত্যাগ করবে না। কারণ এতে গোনাহ আরো বেশি হবে; বরং ইবাদতকে পরিশুদ্ধ ও কবুল করানোর সকল চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বেছে চলার মনোভাব সৃষ্টি বাইতুল্লাহ্‌র সফরের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা মক্কার মুশরিকরাও তো কাফের-মুশরিক হয়েও বাইতুল্লাহ নির্মাণের সময় এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এর নির্মাণে কোনো হারাম অর্থ মিলিত করবে না। এ কারণেই অর্থের অভাবে হাতীমের অংশটুকু তাদের পক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। –সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ২/১৭০

মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে–

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

'আল্লাহ তাআলা পবিত্র। শুধু পবিত্র বস্তুই তিনি কবুল করেন।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৫

৮. পিতা-মাতার আনুগত্য

হজের সৌভাগ্য যেসব সন্তানের হয়েছে তারা যদি হযরত ইসমাঈল আ.-এর দৃষ্টান্ত থেকে পিতামাতার আনুগত্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে, তবে আর কোথা থেকে গ্রহণ করবে?

৯. স্বামীর আনুগত্য

প্রত্যেক স্ত্রীকেই বিবি হাজার রা.-এর দৃষ্টান্ত থেকে অন্তত এই শিক্ষাটুকু তো লাভ করা উচিত, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

أُنْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ أَوْ نَارُكِ.

'তুমি ভেবে দেখ, তার কাছে তোমার স্থান কোথায়? কারণ সে-ই তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।' –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৭৩৫২

আর স্বামীদেরও উচিত, তারা যেন নিজেদেরকে এই হাদীসের নমুনা বানায়–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ.

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম। আমি তোমাদের সবার চেয়ে আমার স্ত্রীদের জন্য উত্তম।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৮৯৫

১০. সন্তানদের ঈমানী তরবিয়ত

ইবরাহীম আ. ও হাজার রা.-এর জীবন থেকে সকল পিতামাতার এই শিক্ষা লাভ করা উচিত। যেসব পিতামাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, তাদের জানা থাকা দরকার, আসল ভবিষ্যৎ হল আখেরাত। যে ব্যক্তি তার সন্তানের আখেরাত ধ্বংস করল কিংবা তাদের আখেরাত সাজানোর বিষয়ে কোনো চিন্তাই করল না, সে সন্তানের কোনো অধিকার ও দায়িত্ব পালন করল না। সে হল জালেম আর সন্তান হল মজলুম। যে পিতামাতাকে আল্লাহ তাআলা হজের তাওফীক দিয়েছেন সে এই জুলুম কীভাবে করতে পারে?!

এই সংকল্পগুলোও নিয়ে আসুন

ক. যে চোখ দিয়ে আল্লাহ তাআলা কাবা দর্শনের তাওফীক দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেরেম দেখিয়েছেন সে চোখের হেফাজত করব, এর অপব্যবহার করব না ইনশা-আল্লাহ।

খ. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটি নয়, দুটি হরম দান করেছেন (হরমে মক্কী ও হরমে মাদানী) এবং উভয় হেরেমে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমাকে দান করেছেন। আমি অধমকে হরমের মাধ্যমে মুহতারাম (সম্মানিত) করেছেন। তাই ভবিষ্যতে আমার এই সত্তাকে মন্দ কাজ ও গোনাহ দ্বারা কলুষিত করব না ইনশা-আল্লাহ।

গ. হাদীস শরীফে আছে–

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

'যে হজ করল এবং সকল অশ্লীলতা ও গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকল, সে সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৫২১

তাই আল্লাহ তাআলার কাছে আশা, তিনি আমার হজ কবুল করেছেন এবং এর বদৌলতে আমাকে নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ করেছেন। ইনশা-আল্লাহ আমি এই **নিষ্পাপ অবস্থার** হেফাজত করব। আল্লাহ না করুন, কোনো

গোনাহ্ হয়ে গেলেও তাৎক্ষণিক তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে পুনরায় পবিত্র হয়ে যাব।

ঘ. ইনশা-আল্লাহ সর্বদা নিজেকে কাবার মানুষদের সঙ্গে সংযুক্ত রাখব। কাবার হেদায়েত ও বরকত এবং কাবার মানুষগুলোর জীবন ও আদর্শকে হাতছাড়া করব না।

ঙ. এই সংকল্প করে আসুন যে, বিদায় হজের বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঐতিহাসিক খুতবায় যে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন, তার সবকিছু মনেপ্রাণে মেনে এর ওপর দৃঢ় ও অটল থাকব এবং মনে করব, এটা তো আমার নবীর বিদায়ী উপদেশ, যা তিনি করেছিলেন হজের সফরে, যে হজের তাওফীক আল্লাহ তাআলা আমাকেও দান করেছেন।

চ. আমাকে মনে করতে হবে, হজের যত ফযীলত ও ফায়েদা আছে, সবগুলোই মাবরূর হজের সঙ্গে সংযুক্ত। মাবরূর হজের অর্থ নেক ও পবিত্র হজ। আমার হজটি মাবরূর হল কি না–এটা তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে এর একটি বাহ্যিক নিদর্শনও রয়েছে। তা এই যে, হজের পর দ্বীনদারী ও ঈমানী অবস্থার উন্নতি হবে। এর অর্থ শুধু নামায-রোযার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, নফল ইবাদতের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়া, বাহ্যিক বেশভূষা ঠিক হয়ে যাওয়া নয়। এসব তো আছেই; এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিজের জীবনে হালাল-হারাম বেছে চলা। হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা। সততা ও বিশ্বস্ততাকে নিজের প্রতীক হিসেবে ধারণ করা। সকল প্রকার খেয়ানত, ধোঁকা ও প্রতারণা এবং জুয়া, সুদ-ঘুষের মতো সব ধরনের নাজায়েয কাজ, নাজায়েয লেনদেন এবং সকল অন্যায়-অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করা। সব ধরনের অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা। কেননা, ঈমানের প্রকৃত উন্নতি তো হারাম, অশ্লীলতা, অবৈধ উপার্জন ও মানুষের অধিকার হরণ করা এবং তাদের সঙ্গে অসদাচরণ করা থেকে বিরত থাকার মধ্যেই।

ছ. আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর ঘর দেখা ও যিয়ারত করার তাওফীক দিয়েছেন তখন ইনশা-আল্লাহ আমি এই নেয়ামতের মর্যাদা রক্ষা করব। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে জান্নাতে দাখিল হওয়া পর্যন্ত তাঁর শোকর আদায় করতে থাকব। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন, আমীন।

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য কী আনবেন?

শুধু এবং শুধু যে জিনিসগুলো আনবেন তা হচ্ছে :

ক. উন্নত ও পবিত্র জীবন। যেন আপনার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনও আপনাকে দেখে হজের তামান্না করে এবং নিজেদের জীবনে আপনাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

খ. যমযম, যা ভূ-পৃষ্ঠে 'কাওসার'-এর দৃষ্টান্ত। এর ইতিহাস ঈমান ও জিহাদের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। এর বৈশিষ্ট্য, ফায়েদা ও ফযীলত প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত।

গ. মদীনার খেজুর।

এর চেয়ে বেশি কিছু আনতে চাইলে কোনো দ্বীনী কিতাব কিংবা হেজাযের তৈরি এমন জায়নামায, যার মধ্যে কোনো ছবি, চিত্র বা কারুকাজ নেই।

এসব ছাড়া অন্য কোনো কিছু হারামাইন শরীফাইনের হাদিয়া হতে পারে না। কেননা, সৌদি বাজারের জিনিসপত্র সৌদি আরবের নয়। তাহলে তা হারামাইনের হাদিয়া কীভাবে হতে পারে? তা ছাড়া সৌদি আরবের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, বিশেষত হজ-ওমরার মৌসুমে ওই সব লোকের হাতে থাকে, যারা আমাদের আপন নয়, পর। যাদের উদ্দেশ্যই হল, আগন্তুকদের লুটেপুটে খাওয়া। অতএব এদের প্রতারণার শিকার না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

যে জিনিসগুলো আনবেন না

মনে রাখবেন, হেজাযে যেসব জিনিস ইসলাম ও মুসলিম এবং হেজাযের শত্রুদের মাধ্যমে প্রবেশ করেছে তা হেজাযেরও নয়, হারামাইনেরও নয়। এসব জিনিস আপনি কখনো গ্রহণ করবেন না। এমনকি চোখ তুলেও এসবের দিকে তাকাবেন না। নিজের সঙ্গে এসব বস্তু আনার তো প্রশ্নই আসে না। কারণ–

১. ইহুদি-খ্রিষ্টান ও কাফের-মুশরিকদের সংস্কৃতি ও রেওয়াজ-প্রচলনের কোনো কিছু সঙ্গে করে আনবেন না। আপনার বা আপনার দেশের কোনো ত্রুটি ও দুর্বলতা যদি সেখানেও দেখতে পান, তাহলে একে ওই ত্রুটির পক্ষে বৈধতার দলিল বানাবেন না। বে-পর্দা, নির্লজ্জতা ও পশ্চিমা বেশভূষা সবকিছুই সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। এগুলো হারামাইনের শিক্ষা নয়। তেমনিভাবে অন্য সকল গোনাহের কাজ– যেখানেই হোক তা গোনাহ। আর হারামের এলাকায়

তো এর ভয়াবহতা আরো বেশি।

বর্তমান সময়ের টেলিভিশন হল সাপের বাক্স– যেখানেই তা রাখা হোক না কেন। দাড়ি মুণ্ডানো গোনাহ, যে দেশের মানুষই তা করুক না কেন। মোটকথা, ছোট-বড় সকল গোনাহ গোনাহই, তা যেখানেই হোক এবং যার দ্বারাই হোক।

আফসোস, খাদেমুল হারামাইন ও তাদের সহযোগীরা পশ্চিমাদের গোলামি করে নিজেদের ঈমানী গায়রত হারিয়ে ফেলার দরুন হারামের সীমানায় অশ্লীল ও গর্হিত কাজের জোয়ার বরদাশত করতে তাদের সম্ভবত কোনো কষ্টই হয় না।

২. তেমনিভাবে যেমনটি আমি আগেও আলকাউসারের পাতায় লিখেছি যে, গায়রে মুকাল্লিদিয়ত ও ফিকহী মাযহাবকে অস্বীকার করা, দ্বীনী বিষয়ে বেপরোয়াভাবে মতামত দেওয়াও হারামাইনের বস্তু হতে পারে না। এসব জিনিস হিন্দুস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে হেজাযে প্রবেশ করেছে। ফিকহের অনুসরণই তো সালাফের মিরাস। এটিই হচ্ছে হাদীস অনুসারে আমলের মাসনূন তরিকা। সেটি ত্যাগ করে গায়রে মুকাল্লিদিয়তের ফেতনাকে আরবের তোহফা-উপঢৌকন মনে করে সঙ্গে নিয়ে আসবেন না।

৩. বর্তমান কোনো কোনো আরবের দুর্বলতা দেখে আরবদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সঙ্গে করে আনবেন না, আরবের সৎ ও আলেমদের সম্পর্কে তো নয়ই।

৪. সেখানে নামাযের পদ্ধতিগত যে দু-চারটি ভিন্নতা চোখে পড়ে তাও সুন্নাহসম্মত এবং তারও মূল ভিত্তি সুন্নাহ। আর আমাদের দেশে যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করা হয় তারও ভিত্তি সুন্নাহ। উভয় পদ্ধতিই সুন্নাহ ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য সেখানে কোনো ভিন্ন পদ্ধতি দেখে নিজ দেশের আলেমের প্রতি অনাস্থা নিয়ে আসবেন না যে, তারা আপনাকে নামাযের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেননি। বিষয়টি এমন নয়; বরং তারা আপনাকে যা শিখিয়েছেন তাও সঠিক এবং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পুরোপুরি সুন্নাহসম্মত। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্তে সে অনুযায়ী আমল করতে থাকুন।

দলিল-প্রমাণ জানার প্রয়োজন মনে হলে মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব সংকলিত 'দলীলসহ নামাযের মাসায়েল' (প্রকাশক : মাকতাবাতুল আযহার বাড্ডা) ও শায়েখ ইলিয়াস ফয়সালের 'নামাযে পয়াম্বর' (বাংলা অনুবাদ : নবীজীর নামায, প্রকাশক : মাকতাবাতুল আশরাফ বাংলাবাজার) কিতাব দুটি

মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের হারামাইনকে হেফাজত করুন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাওহীদপন্থীদের হাতে ফিরিয়ে দিন আর হারামাইন ও বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্রতা দ্বারা আমাদেরকে পূতঃপবিত্র করে দিন, আমীন।

[লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল (সংক্ষিপ্তাকারে) যিলকদ ১৪৩২ হি. = অক্টোবর ২০১১ ঈ., পুনর্মুদ্রিত হয় (বর্ধিত ও সমৃদ্ধ) : জুন ২০২৩ ঈসায়ী]

কীভাবে দ্বীনের পথে অগ্রসর হব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، أَمَّا بَعْدُ...

আজ আমি শুধু দু-একটা কথা আরয করতে চাই। এমনিতে জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের সঙ্গে যখনই আমার খুসূসী মজলিসের সুযোগ হয়, যেমন আজ হল, তখন দু-একটা কথা বলে থাকি। আজও দুটি কথা বলতে চাই।

এক. নিজের ইলমের বিষয়ে করণীয়।

দুই. নিজের ঘর ও পরিবারের বিষয়ে করণীয়।

ইলমের বিষয়ে কথা হল, আমাদের যে ইলম অর্জন করা প্রয়োজন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মাশা-আল্লাহ, জেনারেল শিক্ষিতদের অনেকের মধ্যেই দ্বীনী বইপত্র পড়ার একটা আগ্রহ থাকে। কিন্তু অনেকের মধ্যে দেখা যায়, পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণারও একটা মানসিকতা ও প্রবণতা তৈরি হয়। এটা আসলে কোনো হিসাবেই আসে না। কেন যে মানুষ এমন চিন্তা করে, বুঝে আসে না। গবেষণা তো এমন জিনিস, যার জন্য অনেক শর্ত-শারায়েত রয়েছে। আজ থেকে অনেক বছর আগে ২০০৫ সালে মাসিক আলকাউসারে 'গবেষণা : অধিকার ও নীতিমালা' শিরোনামে একটা প্রবন্ধ ছেপেছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সংখ্যা ছিল মাসিক আলকাউসারের প্রথম সংখ্যা। সেই সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল এই লেখা।

ভাই! গবেষণার একটা নিয়ম-নীতি আছে। আছে তার জন্য শর্ত-শারায়েতও। আমাদের পাশে উপবিষ্ট আমাদের এই ভাই যেই বিষয়ে পিএইচডি করেছেন, আমি যদি কোনো রকম ইংরেজি শিখেই তাঁর বিষয়ে গবেষণা শুরু করি, তাঁর বিষয়ে তাঁর অংশীদার হয়ে যাই– ব্যাপারটা কেমন হবে?!

মানুষ মনে করে, দ্বীনী বিষয়ে গবেষণার অধিকারটা ব্যাপক। কেবল অন্যান্য জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যার যে সাবজেক্ট তিনি সেই সাবজেক্টে গবেষণা করবেন; কিন্তু দ্বীনের বিষয়ে যোগ্যতা থাকুক আর না থাকুক, শর্ত-শারায়েত পূর্ণ করুক আর না করুক, নীতিমালার আওতায় আসুক না আসুক, গবেষণা এখানে সবাই করতে পারবে।

আসলে দ্বীনী বিষয়ে জানা, মানা এবং আমল করার বিষয়টা সবার জন্য। কিন্তু

যেই অংশটা গবেষণার, সেটা সবার জন্য নয়। অন্যান্য সাবজেক্টে যেমন গবেষণা বিশেষ গুণাবলি ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য, এখানেও তেমনি; বরং আরো বেশি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।

মনে রাখবেন, এখানের গবেষণা জাগতিক অন্যান্য গবেষণার তুলনায় কোনোভাবেই সহজ নয়। এই বিষয়ে আজ আর কথা লম্বা করছি না। মাসিক আলকাউসারের ওই লেখাটা পড়ে নিলে আশা করি ভালো হবে।[১]

দ্বিতীয় কথা হল, দ্বীনদারি নিজের মধ্যে আনা এবং পরিবারের মধ্যে আনা। দ্বীনদারির ক্ষেত্রে কারো হয়ত কোনো আল্লাহওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে। কারো হজের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। কারো চিল্লার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। কারো ছেলেকে মাদরাসায় দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। যার দ্বীনদারি যেভাবেই শুরু হয়েছে, সেজন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা চাই। দ্বীনদারি শুরু হওয়ার পর কিছু বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মনোযোগ দিতে হয়।

এক. পেছনের জিন্দেগির কাফফারা

অনেকে দ্বীনদারি শুরু হওয়ার পর শুধু সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, পেছনের দিকে তাকায় না। নিয়ম হল, পেছনে যা যা আমি সমস্যা করেছি, তার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ের ক্ষতিপূরণ আছে খুঁজে বের করা। যেগুলোর ক্ষতিপূরণ নেই, সেগুলোর জন্য শুধু তওবা ও ইস্তেগফার করা। কিন্তু যেগুলোর ক্ষতিপূরণ আছে অর্থাৎ তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব, সেগুলোর ক্ষতিপূরণের চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। কাফফারা থাকলে কাফফারা। কাযা থাকলে কাযা। ক্ষমা চাওয়ার হলে ক্ষমা চাওয়া। কারো হক নষ্ট করে থাকলে সেটা আদায় করে দেওয়া। গোনাহ্ তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে ক্ষমা হবে, কিন্তু অন্যের হক যে নষ্ট করা হয়েছে, সেটা কীভাবে ক্ষমা হবে? 'হক' তো গোনাহ নয়; 'হক' নষ্ট করাই না গোনাহ। কাজেই হক নষ্ট করার জন্য আলাদা তওবা-ইস্তেগফার করব। কিন্তু যার হক নষ্ট করেছি বা নষ্ট করা হয়েছে, সেটা তো তাকে আদায় করে দিতে হবে।

আবারো বলছি, হক নষ্ট করা গোনাহ। এই 'নষ্ট করা'র কারণে যে গোনাহ হয়েছে সেটা তওবা-ইস্তেগফারের কারণে ক্ষমা হবে; কিন্তু 'হক' মাফ হবে কীভাবে? সেটা তো যার হক তাকে পৌঁছে দিতে হবে। পাওনা থাকলে আদায় করে দিতে হবে। জুলুম করে থাকলে মজলুমের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে;

---

১. দ্র. নির্বাচিত প্রবন্ধ ১/২৪১-২৪৯

দ্বীনদারি শুরু হওয়ার পর এভাবে পেছনের দিকে তাকানো আমার প্রথম দায়িত্ব।

দুই. পরিবারের দ্বীনদারি শুরুর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো বাড়াবাড়ি বা জোরাজুরি নয়

দ্বিতীয় দায়িত্ব হল, নিজের মধ্যে দ্বীনদারি শুরু হওয়ার পর প্রথমে সবার মধ্যেই একটা জযবা, স্পৃহা ও আগ্রহ আসে। তখন সে চায়, ঘরের সকল সদস্য এখনই তার মতো হয়ে যাক। সবাই তার সঙ্গে জুড়তে থাকুক। নিজে যেমন জুড়েছি, সবাই আমার সঙ্গে জুড়ুক, এই আশা করা ভালো; কিন্তু এ জন্য জবরদস্তি করা ভালো নয়। এটা খুব জরুরি।

মাঝেমধ্যেই কয়েকজন মুরুব্বী প্রফেসরের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা হয়। তাদেরকে যে কীভাবে বুঝাই! তার পরও ইকরাম ও মহব্বতের সঙ্গে যদ্দুর পারি বলি, 'চাচা, আপনি কবে শুরু করেছেন? আপনি তো এই কয়দিন আগেই শুরু করলেন। এত বছর তো আপনারও খেয়াল ছিল না। আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাওফীক দিয়েছেন, আপনি এখন শুরু করেছেন, কিন্তু এটা কেন চান যে, পরিবারের সবাই এখনই শুরু করুক, এখনই হয়ে যাক এবং সেটা আমার মাত্রায় হোক? কেন, সবর করতে পারেন না? আপনি আপনার পেছনের কাফফারা তাদের মাধ্যমে ওঠাতে চাচ্ছেন নাকি? আপনি বরং নিজেকে দিয়ে ওঠান! আপনি যত ভালো থেকে ভালো হওয়া সম্ভব, হতে থাকুন। অন্যদের বলতে থাকুন, বুঝাতে থাকুন এবং সুযোগ দিন। নিজের মধ্যে সহনশীলতা থাকতে হবে।'

এটা তো আপনার হাতে না যে, আপনি হুকুম দেবেন আর হয়ে যাবে। বরং এর জন্য সবার চেষ্টা যেমন থাকতে হবে, আল্লাহ তাআলার রহমতও থাকতে হবে। কাজেই এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও তাড়াহুড়ো করা কখনোই কাম্য নয়। আমি আমার সন্তানের ঈমান-আমল ও দ্বীনদারির ক্ষেত্রে তারাক্কি চাইব, কিন্তু তাড়াহুড়ো, বাড়াবাড়ি ও জোরাজুরি করব না।

তারাক্কির দুটি দিক। করণীয়গুলো করা আর বর্জনীয়গুলো বর্জন করা। ভালো কাজগুলো করতে হবে, মন্দকাজ ও বদ-অভ্যাসগুলো ছাড়তে হবে। করণীয়গুলো করা এবং বর্জনীয়গুলো বর্জন করা, উভয়টার জন্যই সবরের প্রয়োজন। সবর যদি আমি না করি তাহলে আমার দ্বারা পরিবারের মধ্যে শুধু ভেজালই বাঁধবে। দ্বীন-ঈমানের মধ্যে তারাক্কির কথা শরীয়ত বলে, কিন্তু পরিবারে ভেজাল লাগানোর কথা শরীয়ত বলে না। আমার আচরণের কারণে

যদি পরিবারে মনোমালিন্য ও দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে, বোঝা গেল আমি ঈমানী তারাক্কির জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করছি, আমার এই প্রক্রিয়া সহীহ নয়। এর জন্য প্রয়োজনে আলেমদের শরণাপন্ন হই। তাঁদের কাছে যাই। বোঝার চেষ্টা করি। জানা ও মানার চেষ্টা করি। অবশ্যই আমার প্রক্রিয়ায় কোথাও ভুল আছে। কারণ আমাকে যেমন দ্বীন-ঈমানী তারাক্কির জন্য নির্দেশ করা হয়, উৎসাহ দেওয়া হয়, সঙ্গে একথাও বলা হয় যে, ইকরাম ও মহব্বতের চর্চা করা। মনগুলো যাতে মিলে থাকে, সবার বোঝাপড়াটা যাতে সুন্দর হয়, সেই চেষ্টাটাও করা। কিন্তু আমার দ্বারা তো সেটা হচ্ছে না। আমি ঈমানী তারাক্কির জন্য কেন সবার মন খারাপ করে দিচ্ছি? বোঝা গেল, আমার প্রক্রিয়াতে কোনো ত্রুটি আছে।

এই ধরনের মজলিস পেলে আমি এ কথাটা বলি যে, আমাকে সবর করতে হবে। সময় দিতে হবে। সহনশীল হতে হবে। আমার যে জযবা এসেছে, সেটা তার মধ্যে এলে সেও এমন হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

অনেক ঘরে উল্টোও তো হয়। স্ত্রী ও বাচ্চা-কাচ্চাদের মধ্যে ঈমানী জযবা এসে গিয়েছে, কিন্তু স্বামীর মধ্যে এখনো আসেনি। স্ত্রী যদি আমার মতো লড়াই শুরু করে, অবস্থা কোন্ দিকে যাবে? করেও অনেকে। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। তখন লাগে ঝগড়া। আমাদের কাছে মাসআলা আসে তো।

এজন্য বিষয়টার প্রতি আমরা লক্ষ করি। আমি দুআর মাধ্যমে চেষ্টা করব। ইকরামের মাধ্যমে চেষ্টা করব এবং সবর করব। দৈনিকই যদি বারবার বলতে থাকি, আল্লাহ না করুন, তাহলে হিতে বিপরীতও হয়ে যেতে পারে।

তিন. জাসূসী ও গোয়েন্দাগিরি নয়

আরেক বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্ত্রীর সঙ্গে জাসূসী ও গোয়েন্দাগিরি করতে নেই কখনো। 'আমি যখন অফিসে চলে যাই, সে তো তখন ঘরে একা থাকে, তখন সে কী করে? কথার কথা তার কাছে মোবাইল আছে (যদিও সব ধরনের মোবাইল সবার বাসায় থাকা উচিত নয়; কিন্তু স্বাভাবিক কথা বলার জন্য ঘরে একটা মোবাইল থাকা ভালো। যেটাতে নেট সংযোগ দেওয়া যায় না বা স্মার্টফোন নয়। হালকা একটা মোবাইল ঘরে থাকা ভালো।) এখন আপনার সন্দেহ হচ্ছে, আমি যখন অফিসে চলে যাই সে মোবাইলে কী করে! লুকিয়ে লুকিয়ে আপনি তার মোবাইলটা দেখলেন, কার সঙ্গে আজ কথা বলেছে? কতক্ষণ বলেছে, যাচাই করলেন, এসব উচিত নয়। এগুলো খুবই ঘৃণিত

কাজ। সে আপনার মোবাইল চেক করা, আপনি তার মোবাইল চেক করা যে, আমার অগোচরে কী করে, কার সঙ্গে কথা বলে, এমন জাসূসী করা একেবারে নিষিদ্ধ।

কেন এত বুযুর্গি দেখান আপনি? এই বুযুর্গির কথা শরীয়ত বলে না। হাঁ, সবাই তাকওয়া অবলম্বন করি এবং একে অপরের প্রতি সুধারণা রাখি। কিন্তু খামোখা বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া সন্দেহ করবেন কেন? এখান থেকেও অনেক পরিবারে ঝামেলা শুরু হয়। কাজেই এগুলোর প্রয়োজন নেই। বরং সবাই তাকওয়া অবলম্বন করব এবং পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণ করব।

চার. সব বিষয়ে জোর-জবরদস্তি করতে নেই

এরকম খুঁটিনাটি অনেক বিষয়াদি থাকে। যেমন কোনো একটা নফল বা মুস্তাহাব আমলের জন্য খুব বাড়াবাড়ি করা হয়। কেন আপনি বাড়াবাড়ি করছেন? আপনি তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করেছেন, এখন তাকেও তাহাজ্জুদের জন্য জোর করে ওঠাবেন? কেন এমন করছেন? বরং সে শুয়ে থাকুক। হাঁ, তাকে ফজরের জন্য ওঠান। আর তাহাজ্জুদের জন্য তাকে শুধু বলতে পারেন। সে যদি নিজে থেকে বলে, আমাকেও তাহাজ্জুদের সময় উঠিয়ে দিয়ো, তাহলে আপনি ওঠাবেন। কিন্তু জোর-জবরদস্তি করে উঠিয়ে দেবেন, এটা হয় না।

তেমনি কোনো একটা খারাপ অভ্যাস ছাড়তে হবে, যেটা হয়ত হারাম পর্যায়ের কিছু নয়। হারাম পর্যায়ের কোনো অভ্যাস তার থেকে দূর করতে হলেও তো আপনাকে সবর করতে হবে। কিন্তু যেটা হারাম পর্যায়ের নয়, বরং এমনিতে আপনার কাছে এটা পছন্দ নয় বা আপনার শায়েখ এটা পছন্দ করেন না। এখন এই 'অপছন্দ'-এর জন্য আপনি তার ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন, তা হয় না।

মোটকথা, আমাদের ভারসাম্য শিখতে হবে। আর সেজন্যই আমাদের আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, তাঁদের সঙ্গে মশওয়ারা ও মুযাকারা করা অত্যন্ত জরুরি। যেসব কিতাব অধ্যয়নে এসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের বুঝ সৃষ্টি হয়, যেখানে এই ধরনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় থাকে, যেমন মুফতী তাকী উসমানী দা. বা.-এর কিতাবগুলো, সেগুলোও বারবার পড়া।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঈসায়ী]

মসজিদে আকসা আমাদের

হামদ ও সালাতের পর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বরকত, হেদায়েত ও ইবাদতের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ঘর বানিয়েছেন বাইতুল্লাহকে। যার চারপাশ ঘিরে আছে আলমাসজিদুল হারাম। ইবাদত ও হেদায়েতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই জমিনে সর্বপ্রথম যে ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছেন সেটি মসজিদে হারাম। এরপর মসজিদে আকসা, যার আরেক নাম বাইতুল মাকদিস। তার অনেক পরে এসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে নির্মিত হয় মসজিদে নববী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বানানো সর্বপ্রথম মসজিদ মসজিদে কুবা, তারপর মসজিদে নববী।

মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী–এই তিনটি মসজিদ অন্য সকল মসজিদের চেয়ে বরকতপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ। হেদায়েত, ঈমান ও আমন (নিরাপত্তার)-এর ক্ষেত্রে এই তিন মসজিদের অবদান সবচেয়ে বেশি। যার বা যাদের এই তিন মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক বেশি এবং মজবুত হবে, সে তত বড় ঈমানদার হবে। তার আমানতও তত মজবুত হবে। আর সে তত বেশি নিরাপদ থাকবে। তিনটি বিষয়– ঈমান, আমানত ও আমন বা নিরাপত্তা–এই বিষয়গুলোর ফায়েদা হাসিল করতে হলে এই তিন মসজিদ তথা বাইতুল্লাহ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববীর সঙ্গে গভীর ও মজবুত সম্পর্ক রাখতে হবে।

তিন মসজিদের একই বার্তা

তিন মসজিদেরই বার্তা এক–'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকালাহ্'। তিন মসজিদের একই বার্তা–তাওহীদ। দুনিয়ার সকল মসজিদেরও একই বার্তা। কারণ ছোট হোক আর বড়, অন্য সকল মসজিদ ওই তিন মসজিদেরই অধীন।

তাওহীদের সবক মানুষ কোত্থেকে নেবে? সেজন্য তাওহীদ যেমন এই তিন মসজিদের প্রথম বার্তা, একইসঙ্গে পরবর্তী বার্তাটি হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাওহীদের যে দাওয়াত নিয়ে আদম আ. থেকে শুরু করে যত নবী-

রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি ঈমান এনে তাঁদের শেখানো পথে চলা এবং আল্লাহর ইবাদত করা। পাশাপাশি তিন মসজিদেরই বার্তার মধ্যে একথাও আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বশেষ নবী ও আখেরী রাসূল। তাঁর আবির্ভাব বা তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওত দান করার পর থেকে ইবাদত ও হেদায়েতের একমাত্র রাহবার তিনি। তাঁকে আল্লাহ যে শরীয়ত দান করেছেন, তাঁর প্রতি হেদায়েতের যে কিতাব কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন, তাঁর জিন্দেগিকে যে আমাদের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন–ব্যস, এই কুরআন, শরীয়ত, সুন্নত ও উসওয়ায়ে হাসানাহ–এর মাধ্যমেই শুধু তুমি আল্লাহকে পেতে পার, জান্নাত পেতে পার। এটা বাইতুল্লাহ্রও বার্তা, মসজিদে আকসারও বার্তা, মসজিদে নববীরও বার্তা।

বাইতুল্লাহ্র নবনির্মাণের সময় ইবরাহীম আ. যে রাসূল প্রেরণের জন্য দুআ করেছিলেন তিনি কে?

নূহ আ.-এর তুফানের সময় থেকে বা অন্য যে কোনো সময় থেকে মানুষ বাইতুল্লাহ শরীফের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিল না। ইবরাহীম আ.-কে আল্লাহ তাআলা এর চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছেন। ইবরাহীম আ.-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই ঘরের নবনির্মাণের কাজ করিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ইবরাহীম আ. নিজের ছেলে ইসমাঈল আ.-কে সঙ্গে নিয়ে বাইতুল্লাহ্র নবনির্মাণ করেছিলেন। কুরআন কারীমের সূরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সেকথাও বলেছেন–

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

'এবং (সেই সময়ের কথা চিন্তা কর) যখন ইবরাহীম বাইতুল্লাহ্র ভিত উঁচু করছিল এবং ইসমাঈলও (তার সঙ্গে শরিক ছিল এবং তারা বলছিল) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পক্ষ থেকে (এ সেবা) কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি এবং শুধু আপনিই সব কিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।' –সূরা বাকারা (০২) : ১২৭

বাইতুল্লাহর নবনির্মাণের সময় ইবরাহীম আ. আল্লাহর কাছে যেসব দুআ করেছেন, তার মধ্যে একটি দুআ ছিল এই–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ.

'হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূলও প্রেরণ করুন, যে তাদেরই মধ্য হতে হবে এবং যে তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে।' –সূরা বাকারা (০২) : ১২৯

ইবরাহীম আ. আল্লাহ তাআলার কাছে যে রাসূলের দুআ করেছিলেন সেই রাসূল কে? শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাইতুল্লাহ্‌র বার্তা আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ.-এর জবানে জানিয়ে দিয়েছেন। সেখানে রয়েছে আখেরী নবীর আগমনের বার্তাও। আখেরী নবীর জন্য আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ.-এর দুআ কবুল করেছেন এবং ইবরাহীম আ.-এর সন্তান হযরত ইসমাঈল আ.-এর খান্দানের মধ্যেই হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী ও রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি কেয়ামত পর্যন্ত সকলের হেদায়েত ও ইবাদতের রাহবার।

মেরাজ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজীর প্রতি সর্বোচ্চ ইকরাম

ইবরাহীম আ. দুআ করেছেন; কিন্তু তার অনেক আগেই অর্থাৎ ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী বানানোর ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। মানবজাতির বাবা হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টিরও আগে। সুতরাং বাইতুল্লাহ বা মসজিদে হারামের বার্তার মধ্যে যেমন তাওহীদের কথা আছে, তেমনি খতমে নবুওতের কথাও আছে। মসজিদে আকসার বার্তার মধ্যেও তাই আছে।

ইবরাহীম আ.-এর ছেলে ইসহাক আ.। তাঁর ছেলে ইয়াকুব আ.। তাঁর থেকে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত নবুওতের যে ধারা, বেশিরভাগ নবীই হযরত ইসহাক আ.-এর খান্দানে এসেছেন। তাঁদের সবার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ছিল, আখেরী নবী আসার পরে সবাইকে তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। হাদীসে তো একথাও এসেছে–

وَلَوْ كَانَ مُوسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِيْ.

'মূসা বেঁচে থাকলে আমার অনুসরণই করতেন।' –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫১৫৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ২৬৯৪৯; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস ১৭৪

মূসা আ.-এর শরীয়তে অনেক নবী তো এসেছেন। সবাই তাওরাতের বার্তা পৌছে দিয়েছেন। তাওরাত-ইঞ্জিলের বার্তার মধ্যেই আছে শেষ নবী হযরত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের বার্তা।

ঈসা আ. তো সরাসরিই বলতেন–

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗ أَحْمَدُ.

'(আর আমি তোমাদের কাছে এসেছি) সেই রাসূলের সুসংবাদদাতারূপে, যিনি আমার পরে আসবেন এবং যার নাম হবে 'আহমাদ'।' –সূরা সাফ্ (৬১) : ০৬

আগের নবীগণও আখেরী নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। সেই হিসেবে মসজিদে আকসার মেহরাবে কতবার যে উচ্চারিত হয়েছে আখেরী নবীর কথা, সে তো আল্লাহ তাআলাই জানেন! আর বিষয়টিকে আল্লাহ তাআলা চূড়ান্ত করে দিয়েছেন মেরাজের রাতে। ইরশাদ হয়েছে–

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰي بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতের বেলায় মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন।' –সূরা বনী ইসরাইল (১৭) : ০১

মদীনা শরীফে হিজরত করার আগের কথা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওত লাভের আট-নয় বছর পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এই বিশাল বড় মুজিযা দান করলেন। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বোচ্চ ইকরাম। এত বড় ইকরাম, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর আর কোনো বান্দাকে করেননি।

ওই মেরাজ কীভাবে হয়েছে? মেরাজ বাইতুল্লাহ থেকে শুরু হয়েছে। রাতের সামান্য অংশের মধ্যে সবকিছু আল্লাহ তাআলা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন। এটি ছিল আল্লাহ তাআলার অনেক বড় কুদরত ও মেহেরবানি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা খাতামুন নাবিয়্যীন বানাবেন, সেজন্য মেরাজের মাধ্যমেই তাঁর প্রিয় হাবীবকে ঊর্ধ্বজগতের সবকিছু দেখিয়ে দিয়েছেন। একেক আসমান করে করে সেই 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত নিলেন, যে 'সিদরাতুল মুনতাহা'র ওপরের দিকের কেউ কখনো 'সিদরাতুল মুনতাহা'র নিচের দিকে নেমে আসেনি। আসমান-জমিনের এখন পর্যন্ত কতটুকু জানতে পেরেছে মানুষ, কী-ইবা জানে তারা! বিজ্ঞান কী

জানে? বিজ্ঞান এখনো প্রথম আসমানেও পৌছাতে পারেনি। প্রথম আসমানের নিচে যে মহাকাশ, তাকে কেন্দ্র করেই বিজ্ঞানের যত গবেষণা।

সাইয়েদুল মুরসালীন হওয়ার প্রকাশ ঘটেছে বাইতুল মাকদিসে ইমামতির মধ্য দিয়ে

তো এই মেরাজের জন্য আল্লাহ তাআলা চাইলে সরাসরি বাইতুল্লাহ থেকেই নবীজীকে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তাঁকে প্রথমে নিয়ে গেলেন বাইতুল মাকদিসে। সেটা কেন? কেন আল্লাহ এমন করলেন? সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হিসেবে তো জিবরীল আ. ছিলেনই; সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্র আগের যত নবী ছিলেন সবাইকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুদরতিভাবে হাজির করলেন। এরপর আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার ইমামতি করলেন। সবাই খাতামুন নাবিয়্যীন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়লেন।

একমাত্র ঈসা আ. ছাড়া অন্য সকল নবীই তো রাসূলুল্লাহ্র আগে ইন্তেকাল করেছেন। অন্য কেউ জীবিত আছেন বলে নির্ভরযোগ্য কোনো দলিল নেই। যদিও আরো দু-একজনের কথা ইতিহাসের কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলোর মজবুত কোনো ভিত্তি নেই। একমাত্র ঈসা আ. সম্পর্কেই কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আমরা জানতে পারি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জীবিত রেখেছেন।

ঈসা আ. তো হায়াতে আছেন, আর আগের যত নবী ইন্তেকাল করে গেছেন, তাঁদের সবাইকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতে জমা করেছেন। এখন কি যে শরীর নিয়ে তাঁরা কবরে গিয়েছেন, হুবহু সেই শরীরেই আল্লাহ বাইতুল মাকদিসে তাঁদের হাজির করেছেন, নাকি সূরতে মেছালী বা হুবহু এই দেহ নয়; অন্য কোনো সূরতে আল্লাহ তাআলা হাজির করেছেন, সেটা আল্লাহ্ই জানেন; কিন্তু তাঁদেরকে যে বাইতুল মাকদিসে হাজির করেছেন–একথা সহীহ হাদীসে আছে। কীভাবে হাজির করেছেন–তার বিস্তারিত বিবরণ নেই।

যাহোক, সবাই হাজির হয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায় করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে যেমন খাতামুন নাবিয়্যীন ও ইমামুল আম্বিয়াও বানিয়েছেন, তেমনি তাঁকে সাইয়েদুল মুরসালীনও বানিয়েছেন। তার একবার প্রকাশ

ঘটিয়েছেন এই দুনিয়াতে–মেরাজের রাতে বাইতুল মাকদিসে তাঁর ইমামতির মাধ্যমে। তিনি সবার ইমামতি করেছেন। আরেকবার প্রকাশ ঘটাবেন হাশরের ময়দানে মাকামে মাহমুদে ও শাফাআতে কুবরার মাধ্যমে।

বাইতুল মাকদিসে ইমামতির মাধ্যমে এই বার্তা দেওয়া হল যে, তিনি সাইয়েদুল মুরসালীন, তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন। এই মসজিদে যত নবী ইমামতি করেছেন, মসজিদে আকসাতে দ্বীন-শরীয়তের যত তালীম হয়েছে, সব এখন ফিরে এসেছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে। সবাইকে এখন তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। তাঁকে যে কিতাব আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, তা শিখতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তাঁর জিন্দেগিকে আমি তোমাদের জন্য 'উসওয়া হাসানা' তথা উত্তম ও নিখুঁত-নির্ভুল আদর্শ বানিয়েছি। মেরাজে সকল নবীকে আল্লাহ তাআলা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তাদী বানিয়ে এই বার্তা দিয়ে দিয়েছেন। এখন আগের সকল নবীর অনুসারীদের এই আখেরী নবীরই অনুসরণ করতে হবে। মসজিদে হারাম আর বাইতুল মাকদিসের যে বার্তা, সেই বার্তাই উচ্চারিত হয়েছে মসজিদে নববীতে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

'(হে মুমিনগণ) মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।' –সূরা আহযাব (৩৩) : ৪০

বাইতুল মাকদিসের প্রকৃত হকদার কে?

বাইতুল মাকদিসের প্রকৃত হকদার কে? কারা মসজিদে আকসার হকদার? কারা এই মসজিদের মেহরাবে ইমামতি করার অধিকার রাখে? এই মসজিদের মেহরাব-মিম্বার তো নবীদের হাতেই ছিল। সকল নবী তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং সকল নবী আখেরী জমানার জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। কাজেই যারা তাওহীদে বিশ্বাসী এবং এই আখেরী নবী খাতামুন নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী, তাঁর নবুওত ও খতমে নবুওতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে, একমাত্র তারাই মসজিদে আকসার হক রাখে। যারা তাওরাতকে বিকৃত করেছে, মূসা আ.-এর শরীয়তকে বিকৃত করেছে, যারা ঈসা আ.-কে হত্যা করতে চেয়েছে এবং তাদের দাবি, তারা নাকি হত্যা

করেও ফেলেছে, অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন– না, বরং–

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ.

'অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিল।' –সূরা নিসা (০৪) : ১৫৭

কখনো পারেনি তারা নবী ঈসা আ.-কে হত্যা করতে। শূলে চড়ানো তো দূরের কথা; আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ হেফাজতে আসমানে নিয়ে গেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

'বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ মহা ক্ষমতার অধিকারী, অতি প্রজ্ঞাবান।' –সূরা নিসা (০৪) : ১৫৮

তো যে মসজিদের মিম্বারে তাওহীদ এবং ঈমানের দাওয়াত উচ্চারিত হয়েছে, খাতামুন নাবিয়্যীনের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছে, সে মসজিদের মিম্বার আর মেহরাবের অধিকার কি এই ইহুদি-খ্রিষ্টানরা রাখে, যারা তাওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত করেছে, মূসা আ. ও ঈসা আ.-এর শরীয়ত বিকৃত করেছে, আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছে, তাঁদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ঈসা আ.-এর ব্যাপারে কুফুরি ও শিরকি আকীদা পোষণ করছে? কখনোই না। তারা যখনই তাদের নবীদের শরীয়ত বিকৃত করে ফেলেছে এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার পর তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেনি, মানেনি, তাদের আর অধিকার থাকেনি। কীসের অধিকার তাদের? নিজেদের নবীদের কিতাব ও শরীয়ত বিকৃত করার পরই তারা বাইতুল মাকদিসের অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। এরপর আখেরী নবীকে পাওয়ার পরও যখন তারা তাঁকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেনি তখন আবার তাদের অধিকার থাকে কীভাবে?

হাঁ, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করেছেন তারা সৌভাগ্যবান। তারা 'খায়রে উম্মত'-এর মধ্যে শামিল আছেন।

বাস্তবতা হল, হেদায়েত সবার কিসমতে জোটে না। মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন। তাদেরকে মদীনা, যা এমন দারুল ইসলাম, দুনিয়া এরচেয়ে পবিত্র দারুল ইসলাম আর কখনো দেখেনি, সেই দারুল ইসলামে তাদের থাকতে

দিয়েছেন। তাদেরকে এই দারুল ইসলামের নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেছেন। শর্ত-শারায়েত লিখিত হয়েছে যে, তোমরা এভাবে এভাবে এখানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাক। তোমরা তোমাদের ধর্ম মেনেই থাক।

আহা! এই আখেরী নবী, যাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে, মূসা আ. জীবিত থাকলে এই নবীরই অনুসরণ করতেন, ঈসা আ. আসমানে জীবিত আছেন, কেয়ামতের আগে আবার দুনিয়াতে আসবেন এবং এই নবীর শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী হয়েই আসবেন, এই নবীর ওপর যে কিতাব ও শরীয়ত নাযিল হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করার জন্যই আসবেন, এমন নবীকে এই ইহুদিরা গ্রহণ করতে পারেনি। (বরং তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এমনকি তাঁকে হত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছে।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মদীনায় থাকতে দিয়েছেন, কিন্তু নিজেরা গাদ্দারি করে করে, নিমকহারামি করে করে সেই অধিকারও শেষ করেছে। তাদের বড় বড় তিনটা গোষ্ঠী– বনু কাইনুকা, বনু কুরাইযা ও বনু নযীর। আল্লাহ তাআলা তাদের কত সম্মান দিয়েছিলেন! আখেরী নবী তাদের কত সম্মানিত করেছিলেন! মদীনার নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত চুক্তি লঙ্ঘন করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে করে নিজেদেরকে তারা শেষ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেই দিয়েছেন–

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ.

'তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাক, তাদের ওপর লাঞ্ছনার ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে, অবশ্য আল্লাহর তরফ থেকে যদি কোনো উপায় সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা মানুষের পক্ষ থেকে কোনো অবলম্বন বের হয়ে আসে (যা তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করবে) তবে ভিন্ন কথা এবং তারা আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরেছে, আর তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অভাব। এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। (তা ছাড়া) এর কারণ এই যে, তারা অবাধ্যতা করত ও সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত থাকত।' –সূরা আলে ইমরান (০৩) : ১১২

এভাবেই তাদের জিন্দেগি কেটেছে। কিন্তু তারপরও তারা নিজেদের

বদখাসলতগুলো ছাড়েনি। কুরআন কারীমের সূরা বাকারায় আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের একেক বদখাসলত ধরে ধরে আলোচনা করেছেন। দুইটা উদ্দেশ্য– এক তো তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা আল্লাহ তাআলা এবং নবীদের সঙ্গে কী কী আচরণ করেছে? কী কী ষড়যন্ত্র করেছে? কী কী বেয়াদবি করেছে?

আরেক হল উম্মতে মুসলিমাকে সতর্ক করা। দেখ, তোমরা কিন্তু এমন হয়ো না! এই হল মুসলিম আর ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মাঝে পার্থক্য।

বাইতুল মাকদিস বিজয়

বাইতুল মাকদিস ১৬ হিজরীতে অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পাঁচ বছর পর হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে মুসলমানদের হাতে এসেছে। কীভাবে এসেছে, ওই ইতিহাস শুনলেই ঈমান তাজা হয়ে যায়। ঈমান জিন্দা হয়ে যায়। আবু উবাইদা রা.সহ সাহাবীগণ যখন বাইতুল মাকদিসের ফিলিস্তিন-এলাকা ঘেরাও করেন, তাঁরা চেয়েছেন, যাতে কোনো রক্তপাত না হয়। খ্রিষ্টানরা কত ধরনের জুলুম-অত্যাচার করেছে, সব তাঁরা ভুলে গিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থাপনায় তাদের নিরাপত্তা দিয়ে সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানরা বাইতুল মাকদিস গ্রহণ করেছেন। এভাবে বাইতুল মাকদিসের যারা প্রকৃত হকদার, তাদের হাতে এসেছে এই মসজিদ।

১৬ হিজরীতে হযরত উমর রা. নিজে বাইতুল মাকদিসে গিয়ে মসজিদ পরিষ্কার করেছেন। ওরা শুধু কুফর-শিরকের নাপাকি নয়, বরং গান্ধা-আবর্জনা দিয়ে ভরে রেখেছিল মসজিদের একটা অংশ। উমর রা. নিজহাতেও অনেকগুলো সাফ করেছেন, লোক দিয়েও সাফ করিয়েছেন। মুসলমানেরা মসজিদ সাফ করেছেন এবং সন্ধি করেছেন, এই এই শর্তে তোমরা এখানে থাকতে পারবে। কোনো সমস্যা নেই।

এভাবে বাইতুল মাকদিস এসেছে মুসলমানদের হাতে। মারা যাওয়া তো দূর, একটা লোকেরও কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। প্রায় পাঁচশ বছর মুসলমানদের হাতে ছিল বাইতুল মাকদিস। এরপর খ্রিষ্টানরা এসে আবার এটা দখল করল। দখল করার সময় মুসলমানদের ব্যাপকহারে হত্যা করল। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানি, মাত্র নব্বই বছরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আবার সালাউদ্দীন আইয়ুবীর মাধ্যমে বাইতুল মাকদিস দান করেছেন মুসলমানদের হাতে। এর পর হাজার বছরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ছিল মুসলমানদের হাতে।

১৯৪৮ সালে এসে ইহুদিদেরকে এনে বসানো হল। ব্রিটিশরা বসিয়েছে এদেরকে।

প্রথমে জবরদস্তি একটু জায়গা নিল, এরপর শুরু হল একটার পর একটা দখল করা। দখল করে যাচ্ছে, একের পর এক জুলুম করে যাচ্ছে। বাইতুল মাকদিসের সম্মান নষ্ট করছে, মুসলমানদের হত্যা করছে, মেয়েদের হত্যা করছে, শিশুবাচ্চাদের পর্যন্ত হত্যা করছে। আর সবাই বসে বসে তামাশা দেখছে!

কেন? কারণ আমরাও তো আসলে এমনই। আমাদের আখেরী নবীর আদর্শের ওপর আমরা কতটুকু আছি? এক আফগানিস্তানের ইমারতে ইসলামিয়া ছাড়া কোনো একটি মুসলিম দেশ কি আছে, যেখানে ইসলামী হুকুমত আছে? আল্লাহ তাআলা তো দেখছেন সব! ১৯৪৮ থেকে ২০২৩-এই পর্যন্ত কত ধরনের যে জুলুম তারা করেছে, করে যাচ্ছে। চুক্তি লঙ্ঘন তো ওদের একেবারে স্বভাবের মধ্যেই আছে। তা ছাড়াও আরো যত ন্যক্কারজনক কাজ আছে, সবই তারা করছে।

এবার সম্ভবত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর একটু কুদরত দেখাচ্ছেন। ফিলিস্তিনের মুজাহিদ ভাইদের হাতে কী আছে? কিন্তু ওদের সঙ্গে তো দুনিয়ার সব সুপার পাওয়ার। এরপরও মোটামুটি এবার কিছুটা হলেও ইহুদিরা ভয় পাচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুদরতিভাবে হিম্মত দিয়েছেন মুজাহিদদেরকে।

এখন আমাদের সবার দায়িত্ব হল সালাতুল হাজত পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা। বেশি বেশি তওবা ও ইস্তেগফার করা। আমাদের গোনাহ্‌র কারণেই এই মুজাহিদ এবং নারী-শিশুরা কষ্ট পাচ্ছে। এই জালেমরা মসজিদে আকসার মতো পবিত্র জায়গা, যেখান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ হল, সেই জায়গা তারা অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে।

খুব দুআ করি, এবারই যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাইতুল মাকদিস ফাতাহ করে দেন! ফিলিস্তিনকে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করেন! ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দেন!

এদের জমিনের ওপরে থাকার অধিকার নেই। নিজেরাই নিজেদের অধিকার নষ্ট করে ফেলেছে। সবাই খুব দুআ করি! ইস্তেগফার করি! বেশি বেশি সালাতুল হাজত পড়ি। 'কুনূতে নাযেলা'-এর দুআ যাদের মুখস্থ আছে,

মুনাজাতে পড়ব। নফল নামাযে পড়ব। সেজদার মধ্যে পড়ব। বিতরের নামাযে দুআয়ে কুনূত যেটা পারি সেটা তো পড়ব, কুনূতে নাযেলাও পড়ব। যাদের মুখস্থ নেই, মুখস্থ করে ফেলতে পারি। আমরা এই দুআগুলো পড়তে পারি–

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

* * *

اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ، وَأَلْقِ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَثَبِّتْهُمْ عَلٰى مِلَّةِ نَبِيِّكَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوَفُّوا بِالْعَهْدِ الَّذِيْ عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلٰهَ الْحَقِّ، وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

সেই সঙ্গে আমরা বেশি বেশি দুআ ইউনুস পড়ব।

আল্লাহ তাআলা ভরপুর তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

২৭-০৩-১৪৪৫হি.=১৩-১০-২০২৩ঈ.

[নভেম্বর ২০২৩ ঈসায়ী]

অপচয়, অথচ আমরা একে অপচয়ই মনে করছি না

আলহামদু লিল্লাহ, একথা তো সকল মুসলিমেরই জানা আছে, ইসলামে 'ইসরাফ' ও 'তাবযীর' হারাম। ইসরাফ অর্থ 'অপচয়' আর তাবযীর অর্থ 'অপব্যয়'। যে কোনো 'ইসরাফ' ও 'তাবযীর' হারাম। যে এমন করবে, কুরআনের ভাষায়– সে শয়তানের ভাই। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا.

'আর অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান আপন রবের চরম অকৃতজ্ঞ।' –সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ২৬-২৭

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

'আর তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।' –সূরা আ'রাফ (০৭) : ৩১

ইসরাফ শুধু অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রেই হয় বিষয়টি এমন নয়। শুধু অর্থ-সম্পদের ইসরাফ তথা অপচয় করা নাজায়েয তা নয়; বরং এর পরিধি অনেক বিস্তৃত। আল্লাহ তাআলার দেওয়া যেকোনো নেয়ামত অপাত্রে ব্যবহার, অপব্যবহার, অনর্থক ব্যবহার, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার দেওয়া সীমারেখা লক্ষ না রাখা, আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত হকসমূহ আদায় না করা, এক হক আদায়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে অন্য হক আদায়ের সুযোগই না থাকা, একজনের হক আদায়ে খুব বেশি জোর দিয়ে অন্যদের হকের প্রতি ভ্রুক্ষেপই না করা, এমনিভাবে নিজের মূল দায়িত্বের ব্যাপারে গাফেল থেকে নফল বিষয়ে খরচ করা–এসবই 'ইসরাফ'। আসলে উল্লিখিত আয়াতের পূর্বপ্রসঙ্গ থেকে বুঝা যায়, ইসরাফ তথা অপচয়ের সূরতগুলোও স্তরভেদে তাবযীর তথা অপব্যয়ের মধ্যে দাখিল। কাজেই তাবযীরকারীদের ব্যাপারে যে সতর্কবাণী আয়াতে এসেছে, তাতে ইসরাফকারীরাও শামিল।

যাহোক, ইসরাফ যেমনিভাবে পানাহারের ক্ষেত্রে হয় তেমনি পোশাক-

আশাকের মধ্যেও হয়। এমনকি ওযু-গোসলের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করার মধ্যেও ইসরাফ হয়। এ কারণে ইসরাফ-সংশ্লিষ্ট সমস্ত জরুরি মাসআলা জানা খুব প্রয়োজন। এমনিভাবে কোন্ ইসরাফ একেবারেই নাজায়েয, কোন্ ইসরাফ মাকরূহ আর কোন্টা এমন, যেখানে ক্ষেত্রবিশেষে ওজরওয়ালাদের জন্য কিছু ছাড় আছে–এগুলোও জানা থাকা জরুরি।

একথা ঠিক যে, ইসরাফের কিছু সূরত আপেক্ষিক। মানে সেগুলো কারো জন্য ইসরাফ হলেও অন্য কারো জন্য রুখসতের অন্তর্ভুক্ত।

ইসরাফের মাসায়েল এবং এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা এখন আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং কিছু ঘটনা বয়ান করা উদ্দেশ্য, যেন তার আলোকে ইসরাফের এমন কিছু রূপের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, যেগুলোকে আমরা ইসরাফই মনে করি না। অথচ সেগুলো এবং সেগুলোর মতো আরো অনেক রূপ ইসরাফের মধ্যে দাখিল; কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কোনো অনুভূতিই নেই।

থাকল তাবযীর ও ইসরাফের ওই সব রূপ– পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমরা যেগুলোতে জড়িত। এর মধ্যে কিছু তো এত স্পষ্ট যে, সবাই বোঝে এটা অপচয় তথা ইসরাফ বা তাবযীর। আর কিছু অপচয় খানিকটা অস্পষ্ট, কিন্তু খুবই ভয়ানক; যেগুলোর ব্যাপারে সচেতন বুযুর্গ আলেমগণ সতর্ক করতে পারেন। বান্দা এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি মাত্র–

১. শৈশবকালে আমাদেরকে খুব তাকিদের সঙ্গে বলা হয়েছে– খাওয়ার সময় পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে না খাওয়া এবং নষ্ট করা 'ইসরাফ'।

২. যখন বান্দা জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউনে তালেবে ইলম ছিলাম তখন দেখতাম, ফরয নামাযগুলোর পরে বিশেষভাবে ফজর নামাযের পরে অনেকে তেলাওয়াত, যিকির-আযকার, দুআ-আওরাদ ও নফল আমলে মশগুল থাকতেন। অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ মুসল্লি বের হয়ে যেতেন। অনেকে থাকতেন। কিন্তু এত বড় মসজিদে তারা যার যার জায়গায় বসে থেকে আমল করতে চাইতেন। বান্দা একাধিকবার মসজিদের ইমাম ও খতীব কারী রশীদুল হাসান রহ.-কে দেখেছি, তিনি তাদেরকে খোশামোদ করে বলছেন, ভাই আপনারা তেলাওয়াত-যিকির-দুআই তো করছেন, আমলগুলো কাছাকাছি বসে করুন। যাতে প্রত্যেকের জন্য বা দুই দুইজনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাখা ও বাতি জ্বালানোর প্রয়োজন না হয়।

মসজিদগুলোতে এই দৃশ্য অনেক দেখা যায়, নামাযের আগে এক-দুই কাতার মুসল্লি আছে, কিন্তু তখন থেকেই মসজিদের সবগুলো পাখা কিংবা অধিকাংশ পাখা ছেড়ে রাখা হয়। এমনিভাবে নামাযের পরে এখানে এক-দুজন বসে থাকেন, খানিক দূরে এক-দুজন, এজন্য বিনা দরকারে কয়েকটি পাখা ছেড়ে রাখতে হয়। অথচ একটু খেয়াল করলে এবং মুসল্লিগণ একটু কষ্ট করে উঠে এসে কাছাকাছি বসলে এই ইসরাফ থেকে বাঁচা সহজ হয়।

৩. বানূরী টাউন মাদরাসায় পড়াকালীন দেখেছি, জামে মসজিদের দক্ষিণ পাশে একদিকে যদিও ট্যাপে ওযু করার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অন্য পাশে হাউযে ওযু করারও ব্যবস্থা আছে। অনেককে দেখেছি, তারা শুধু একারণে হাউযে ওযু করা পছন্দ করতেন যে, তাতে পানির অপচয় থেকে বাঁচা বেশি সহজ।

৪. যখন জামিয়া দারুল উলূম করাচিতে পড়াশোনার জন্য যাওয়া হল, দেখলাম উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রউফ সাখখারবী দামাত বারাকাতুহুম কখনো মৌখিকভাবে সতর্ক করতেন আবার কখনো ওযুখানায় দাঁড়িয়ে আমলীভাবে তাম্বীহ করতেন। কখনো নির্দিষ্ট করে কোনো ভাইকে মহব্বতের সঙ্গে বলতেন– ভাই, পানির ট্যাপ হালকা করে ছাড়। শুধু ওযুর (অঙ্গ ধোয়ার) সময় চালু রাখ, এ ছাড়া বন্ধ রাখ। চালু অবস্থায় রেখে দিও না। কতক ভাই হযরতের এই তাম্বীহ বুঝতে পারত না। তারা বলত, হযরত আমি তো ওযুই করছি! অথচ হযরতের উদ্দেশ্য থাকত, মেসওয়াক করা, 'দালক' তথা ওযুর অঙ্গগুলো ডলে ধোয়া ও মাথা মাসেহ করার সময় ট্যাপ বন্ধ রাখা। এ সময়গুলোতে ট্যাপ চালু রাখার কী দরকার!

৫. ১৪১৯ হিজরীর রমযানের শেষে মাদরাসা দাওয়াতুল হক হারদুঈ, ইউপিতে হাজিরী হয়েছিল। সেখানে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে দুটি বিষয় ছিল–

ক. সেখানে ওযুর জন্য লোটা রাখা হয়েছে। লোটা দিয়ে ওযু করা হলে পানির অপচয় কম হয়। কেননা সত্যি কথা হল একটু খেয়াল করে পানি খরচ করা হলে পরিপূর্ণরূপে মাসনূন ওযুর জন্য প্রচলিত সাইজের এক লোটা পানিরও প্রয়োজন হয় না। ওযুর মধ্যে 'দালক' তথা ওযুর অঙ্গগুলো ডলে ধোয়া সুন্নত এবং 'তাসলীস' তথা অঙ্গগুলো তিনবার ধোয়া সুন্নত। কিন্তু 'দালক' করার সময় পানির কল এভাবে ছেড়ে রাখে যে, তাসলীসের কোনো নাম-গন্ধও থাকে না। একবারের ধোয়া এত লম্বা হয় যে, তা যদি কয়েকবারে ভাগ করা

হয়, তাহলে তা দ্বারা হয়ত কয়েক 'তাসলীস' হয়ে যাবে।

আলহামদু লিল্লাহ, আমাদের দেশে কয়েক জায়গায় দেখেছি, লোটা দ্বারা ওযু করার ব্যবস্থা আছে। এটি অনুসরণীয় বিষয়। তবে কোনো হাম্মামে বা ওযুখানায় যদি আরএফএল কোম্পানির লোটা বা অন্য কোনো সামান কিংবা অন্য কোনো নামে এই কোম্পানির কোনো সামান দেখি, তাহলে দিলে অনেক ব্যথা লাগে। কারণ উদাহরণস্বরূপ, তাদের একটা লোটা কেনার অর্থ হল কাদিয়ানী ফেতনার মতো ইলহাদ ও যিন্দীকওয়ালা ভয়াবহ কুফুরির প্রসারে নিশ্চিতভাবে আর্থিক সহযোগিতা করা। এই কোম্পানির আয়ের অনেক বড় অংশ কাদিয়ানী ধর্মের প্রসারে ব্যয় করা হয়। আল্লাহ তাআলার ইবাদত ওযু-নামায তো করছি খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী; কিন্তু এর জন্য উপকরণ ব্যবহার করছি এমন, যা দ্বারা আল্লাহ ও খাতামুন নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুল্লমখোলা বিদ্রোহকারীদের সরাসরি সাহায্য করছি! আশা রাখি, আমরা এ বিষয়ে ঈমানী গায়রতের পরিচয় দেব।

খ. হারদুঈতে দ্বিতীয় বিষয় দেখেছি, ঈদুল ফিতর ঘনিয়ে এলে যখন মেহমানের সংখ্যা কমে আসে তখন প্রথম অবস্থায় মেহমানগণকে বিভিন্ন কামরা থেকে বড় এক কামরায় নিয়ে আসা হয়। মেহমানের সংখ্যা আরো কমে গেলে তাদেরকে কাছে কাছে থাকার জন্য বলা হয়, যাতে এমন না হয় যে, চারজন মেহমানের জন্য কামরার চার কোণে চারটি পাখা চালু রাখতে হয়!

এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা আছে, ইনশা-আল্লাহ অন্য কোনো সুযোগে পাঠকের খেদমতে পেশ করার ইচ্ছা আছে। আল্লাহ তাআলা এসব শিক্ষণীয় ঘটনা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

২৫ রবিউল আখির ১৪৪৫ হি.
[ডিসেম্বর ২০২৩ ঈসায়ী]

সমাপ্ত